প্রথম প্রকাশ :

বৈশাখ—১৩৫৮

অন্নপূর্ণা প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস কর্তৃক ৩।১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও তারারাণী রায় কর্তৃক তারকেশ্বর প্রেস, ৬, শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।



উৎসর্গ

বাংলার শিক্ষালোকপ্রাপ্ত জমিদার কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণী

এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠাবলীর পুরস্কারদাতা

বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে

শ্রদ্ধা-ও প্রীতি-সহকারে প্রণেতা এই ক্ষুদ্র পুস্তক উৎসর্গ করিলেন।



গ্রাম বাংলার উপকথা

লেখকের ভূমিকা

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে উত্তরপাড়ার জমিদার বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। বাংলার কৃষিজীবী আর শ্রমিকদের সামাজিক এবং সংসারিক জীবন সম্বন্ধে, ইংরিজিতে কিম্বা বাংলায় লেখা সব চাইতে ভালো উপন্যাসকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হবে। ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে পাণ্ডুলিপিগুলিকে বিচারকদের সমীপে উপস্থিত করার কথা ছিল। কিন্তু দুইজন বিচারক বিলেতে থাকায় এবং অন্য কয়েকটি কারণে পুরস্কার দিতে ১৮৭৪-এর মাঝামাঝি হয়ে গেছিল।

এই বই সেই পুরস্কারের প্রাপক। মূল গ্রন্থে এর-শেষ তিনটি অধ্যায় ছিল না। কাহিনীটিকে বর্তমান কাল পর্যন্ত টেনে আনার উদ্দেশ্যে ওগুলি সংযোজিত হয়েছে।

বই প্রকাশনার কাজে যে কয়জন ইংরেজ শুভার্থীদের সাহায্য পেয়েছিলাম, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারলাম না। সবার আগে কলকাতার জি সি হে কোম্পানির মিঃ গর্ভনরব্‌কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমার কাজে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন।

পাণ্ডুলিপি পড়ে অনুমোদন করার জন্য, 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র প্রাক্তন সম্পাদক, অধুনা 'এডিনবরা ডেলি রিভিউ'-এর সম্পাদক ডঃ জর্জ স্মিথকে-ও ধন্যবাদ জানাই। কলকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি মহামান্য মিঃ জে বি ফিয়ারকেও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি যে শুধু পাণ্ডুলিপিটি পড়েছিলেন তাই নয়, কোনো কোনো জায়গায় ভাষা

সংশোধনের ও কিছু পরিবর্তনের পরামর্শও দিয়েছিলেন। পরিশেষে কেম্ব্রিজের অধ্যাপক ই বি কাওয়েল্‌কে প্রুফ্‌ দেখে দেবার জন্য এবং তার অগাধ পাণ্ডিত্য, ব্যাপক বিচার বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম রুচি-বোধ দিয়ে বইখানির সামগ্রিক উন্নতি সাধনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ইতি।

লালবিহারী দে

অনুবাদকের নিবেদন

এই বইখানি হল 'বাংলার উপকথার উল্টো দিকটি। সে-বই ছিল সুখের বই, শখের বই, মন-গড়া গল্পের বই। সে-বই ছোটদের জন্য, এ-বই তা নয়। এ-বই হল চাষীর ছেলে গোবিন্দের জন্ম থেকে মরা পর্যন্ত, সমস্ত জীবনের কথা। এতে যেমন হাসি আছে, মজা আছে; তেমনি গায়ের ঘামে নোনা, চোখের জলে ভেজা, চাষীদের বাস্তব জীবনের দুঃখের কথাও আছে।

তবে এ গল্প এখনকার কথা নয়। এ বইয়ের চরিত্ররা দেড়শো বছর আগে বর্ধমানের কাছে কাঞ্চনপুরে থাকত। ট্যাঁকে তাদের একটি পয়সা থাকত না, মাথায় ক-অক্ষর ছিল না। দুঃখে দুঃখে জীবন কাটত। জমিদারের অত্যাচার, নীলকরের উৎপীড়ন, রোগ-ভোগ, কুসংস্কার। দুধের দাঁত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শৈশব ফুরিয়ে যেত।

চারদিকে প্রকৃতির অজস্র দান ছড়িয়ে থাকত। তারা তার সামান্য একটুখানি ভাগ পেত। তবু তাদের জীবনেও সুখের মুহূর্ত আসত। এ হল সেই সব দুঃখ-সুখের গল্প।

এ-বই পড়ার এই হল সময়। দেড়শো বছরের পুরনো হতশা-গুলোকে দূর না করলে চলবে কেন। জমিদারি উঠে গেছে; নীলকররা নেই; তবু গ্রাম-বাংলার দুঃখের শেষ নেই। ঋণ; রোগ, কুসংস্কার, অশিক্ষা। দেড়শো বছরের পুরনো দুঃখের শেকড় অনেক নিচে অবধি নেমে গেছে। এবার সব সুদ্ধ উপড়ে আনতে হবে। তাই এ বইয়ের কাজ এখনো ফুরোয়নি। এ কাহিনী পড়ে কারো মনে যদি এতটুকু নাড়া লাগে, তাহলেই আধখানা কাজ সম্পন্ন হল। আমাদের দেশে মঙ্গল হক। ইতি।

লীলা মজুমদার

লেখকের দুটি কথা

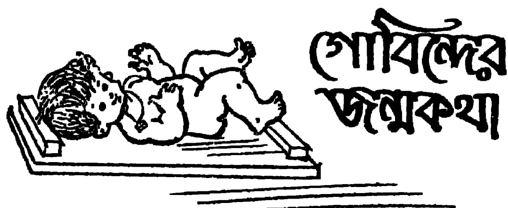
যারা অনেক কিছু আশা করে এই সামান্য বইখানি পড়তে আরম্ভ করবে, তাদের গোড়া থেকেই সাবধান করে দেওয়া ভালো ; নইলে শেষটা বই পড়ে হতাশ হয়ে আমাকে না কেউ জোচ্চোর ঠাওরায়, ঐ যেমন কোনো কোনো দোকানদার দরজার ওপর মিথ্যা নোটিস্ ঝুলিয়ে খোদ্দের বাগাবার চেষ্টা করে। আমি বরং সাধু ব্যবসাদারের মতো মনে মনে লাভের আশা রাখলেও অকপটভাবে বলেই ফেলি আমার হোটেলে কি পাওয়া যাবে না যাবে। খাবারের তালিকা দেখলেই খোদ্দেররা বুঝতে পারবে এখানে পছন্দসই জিনিস আছে কি নেই। তাহলে আর কষ্ট করে তাদেরও অরুচিকর খাবার আর আমাকেও তাদের ভোগা দেবার জন্য গাল খেতে হবে না। অতএব গোড়াতেই বলে রাখি এ বইতে কি কি নেই। প্রথম কথা হল এই খুদে বইতে অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত কিছু পাবে না। বাল্মীকি, ব্যাস, কিম্বা যাঁরা পুরাণ লিখেছিলেন—তাঁদের পায়ের কাছে দাঁড়াবার-ও আমার যোগ্যতা নেই—তাঁরা দশমুণ্ড, কুড়ি হাত-ওয়ালা রাজাদের কথা লিখেছেন ; সূর্যকে বগল-দাবাই করে রাখে এমন বাঁদরের কথা লিখেছেন ; দেবতা-দৈত্য মিলে পাহাড় লাগিয়ে কেমন সমুদ্র-মন্থন করেছিলেন, সে-কথা লিখেছেন ; মানুষের মাথা মাছের গা, মানুষের গা হাতির মাথা এমন সব জীবের কথা লিখেছেন। এক মুনি এক চুমুকে সাত সাগরের জল শেষ করলেন। বীররা এল, তারা সব সোনার লঙ্কার চূড়োর সমান উঁচু। সাপদের দেশে সাপদের মানুষের মতো বুদ্ধি ; তারাই রাজা তারাই মন্ত্রী, কোটাল, সৈনিক ; গর্জাতে গর্জাতে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সাহেবরাও কিছু কম যান না। তাঁদের বইতেও প্রকাণ্ড সব মানুষের কথা আছে, তাদের মস্ত মস্ত পকেটে লক্ষ লক্ষ খুদে মানুষ ধরে। এই

বিশাল বিশাল দৈত্যের কথা আছে, তাদের জিবের তলায় গোটা গোটা সৈন্যদল, গোলাগুলি, বন্দুক, কামান, সাঁকো-সেতু, রসদ-বিভাগ, বস্তি, হাসপাতাল ইত্যাদি নিয়ে ঝড়-বৃষ্টির সময় নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে।

সোজা কথা বলে রাখি এ-সব আশ্চর্য জিনিস এ বইতে পাবে না। আশ্চর্য জিনিসের দিন-ও গেছে। দৈত্যরা আজকাল কড়ি পায় না। কেউ কিচ্ছু বিশ্বাস করে না। ছোট ছোট খোকারা, যাদের গাল টিপলে দুধ বেরোয়, তারাও গল্প শুনে বলে, "বাবা, এ-সব কি সত্যি?"

এই তো গেল আশ্চর্য জিনিসের কথা। এ বইতে কোনা রোমাঞ্চকর ব্যাপার-ও নেই। সত্যি কথা বলতে কি একশোজন লোকের মধ্যে নিরানব্বুই-জনের জীবনে কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেই না আর বাঙ্গালী চাষীদের ঘরে তো কোনো কালেই ঘটে না। বিকট-বীভৎসব ব্যাপার-ও এ বইতে নেই।

প্রেমের ব্যাপার-ও নেই। লম্বা চওড়া কথাও নেই। তাহলে আছেটা কি; আছে এক সাদা-সিধে বাঙ্গালী চাষীর সাধারণ জীবনের সহজ কথা। তাই যদি কেউ চায়, তাহলে সে এ-বই পড়ুক। নইলে, থাক।



১

দেড়শো বছর আগের কথা। বর্ধমান শহরের উত্তর-পূবে, তিন ক্রোশ দূরে এক গ্রাম। গ্রামের নাম কাঞ্চনপুর। বোশেখ মাস, ভারি গুমোট। রাত বারোটা বেজে গেছে, এমন সময় পথে একজন লোককে দেখা গেল। আকাশে চাঁদ ছিল না, গাঁয়ের পশ্চিম দিকের গাছের সারির পিছনে চাঁদ ডুবে গেছিল। আকাশ তারার আলোয় আলো। পথ দিয়ে যে মানুষটি চলেছিল তার মনে হচ্ছিল এ বড় ভালো লক্ষণ। যাঁরা পৃথিবীর কাজ শেষ করে ইন্দ্রলোকে চলে গেছেন, ঐ তারা তাঁদেরি উজ্জ্বল চোখ। চারদিক নিঃশব্দ নিঝুম। মাঝে মাঝে কুকুর ডেকে উঠছিল। মাঝে মাঝে গাঁয়ের চৌকিদাররা এক সঙ্গে মিলে বিকট সুরে চিৎকার করছিল। নিরীহ গাঁয়ের লোক চমকে উঠছিল।

ঐ মানুষটি কিন্তু বড় বড় পা ফেলে এগিয়েই চলেছিল। গায়ে শুধু একখানি হাঁটু অবধি খাটো ধুতি, কোমরে জড়িয়ে পরা। হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি।

একটা মোড় ঘুরেই, আধো-অন্ধকারে সে দেখতে পেল কার

মাটির ঘরের দোরগোড়ায় একটি লোক বসে। লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "কে-ও ?"

পথিক বলল, "আমি একজন রায়ত।"

অন্য লোকটা হল চৌকিদার। সে বলল, "কে রায়ত ?"

"আমি মানিক স'মন্ত।"

"এত রাতে বাইরে কেন ?"

"আমি রূপার মাকে ডাকতে যাচ্ছি।"

"ওঃ, বুঝেছি। এসো, বস, এক ছিলিম তামুক খাও।"

"তুমি খাও ভাই, আমার তাড়া আছে।"

এই বলে মানিক সামন্ত আরো পা চালিয়ে এগিয়ে গেল। এখানে পথের দুধারে বাড়ি। তার পরেই গ্রামের সীমানা। তারপরে চারদিকে শুধু আম-বাগান আর তারি মধ্যে মধ্যে কয়েকটি মাটির ঘর।

একটা ছোট মাটির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মানিক ডাকতে লাগল, "ও রূপার মা! রূপার মা!" ঘরের মধ্যে মানুষের গলা শুনে মানিক বুঝল রূপার মা ঘরেই আছে। কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। মানিক আবার ডাক দিল, তবু কোনো উত্তর পেল না। তিন বার ডেকেও সাড়া পেল না। চার বার ডাকতে তবে উত্তর এল। লোকে ভাবতে পারে রূপার মা কানে খাটো, কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রথম তিন বার ডাকে সে ইচ্ছা করেই সাড়া দেয়নি। সেকালে পাড়াগাঁয়ে সবাই জানত যে তিন বার ডাকলে সাড়া দিতে হয় না, চার বারের বার নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। বিশেষ করে রাত ১১টার পর। কে না জানে যে রাত বিরেতে নিশিতে ডাকে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চেনা মানুষের মতো গলা করে সে ডাকে। গিয়েছ কি মরেছ! ভুলিয়ে ভালিয়ে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে পুকুরে ডোবাবে। এই রক্ষে যে নিশি ঐ তিন বারের বেশি কখনো ডাকে না। চার বার ডাকলে নিশ্চিন্ত।

অনেকে বলে যে যাদের ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়ানো রোগ, তাদের সাবধান করে দেবার জন্য ঐ চার বার ডাকের পর সাড়া দেবার নিয়ম হয়েছিল।

সে যাই হোক গে, এতক্ষণে দরজা খুলল। মানিক বলল, "রূপার মা, এক্ষুণি চল।" রূপার মা তার মেয়েকে বলল, "আলো জ্বাল্।" রূপা ঘরের কোণ থেকে একটা চটের থলি এনে, ভেতরকার জিনিস সব ঢেলে ফেলল। চকমকি, এক টুকরো লোহা, এক টুকরো সোলা। লোহা দিয়ে চকমকি ঠুকতেই আলোর ফুলকি দেখা গেল, সোলা ধরলে গন্ধকের দেশলাই কাঠি জ্বেলে মাটির পিদিমের সলতেতে আগুন দেওয়া হল।

সেই আলোতে রূপার মায়ের ঘরখানি দেখা গেল। মাটির দেয়াল, খড়ের চাল; মেঝেতে তালপাতার পাটি পাতা, তার ওপর মা-মেয়ে শোয়। ঘরের চার কোণায় মাটির হাঁড়ি, তাতে ওদের ভাঁড়ার থাকে; চাল, ডাল, নুন, হলুদ, সরষের তেল, কয়েকটা শাক-সবজি। আসবাব বলতে কিছু ছিল না। রূপার মা বাগ্‌দীর মেয়ে, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বয়স, বাঙালী মেয়ের পক্ষে একটু বেঁটেই বলতে হবে। পাতলা শরীর, পদ্মফুলের শুকনো বোঁটার মতো চিমড়ে হাত পা। যে কারণেই হোক, দাঁতগুলো প্রায় সব গেছে। যে কটা আছে তার মাঝে-মাঝে মস্ত মস্ত ফাঁক; ফোকলা মুখে কথা বলত যেন আশী বছরের বুড়ি। সবাই তাকে রূপার মা ডাকত; তার আসল নামটা যে কি তা কেউ বলতে পারত না। অনেক খোঁজ করেও বুড়ির নাম জানা গেল না। রূপাকে দেখে মনে হত বছর কুড়ি বয়স; হাতে লোহা ছিল না, সিঁথিতে সিঁদুর ছিল না; তার মানে রূপা বিধবা।

মানিকের সঙ্গে রওনা হবার আগে রূপার মাকে বেশি কিছু তোড়জোড় করতে হল না। পরনের শাড়িখানি আর চাদরটা ছাড়া আর দ্বিতীয় কাপড় তো ছিল না যে পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাবে। স্নানের সময় চাদরটি পরে কাপড়টি কেচে শুকিয়ে নিত। মাসে

একটিবার ছাই দিয়ে চোণা দিয়ে সেদ্ধ করে শাড়ি চাদর সাদা করে নিত। চাষীদের বাড়িতে সবাই তাই করত, তাছাড়া আর সাবান কোথায় পাবে ?

একটা হাঁড়ির মুখ খুলে কয়েকটা ওষুধপত্র বের করে নিয়ে, ফুঁ দিয়ে আলো নিবিয়ে রূপার মা মেয়েকে বলল, "দোরে তালা দিয়ে আমার সঙ্গে আয়।" ঠিক সেই সময়ে খড়ের চালে একটা টিকটিকি বলল, "ঠিক ঠিক ঠিক।" যাত্রার সময় টিকটিকি ডাকলে যে অমঙ্গল হয় এ-কথা সব বাঙালী জানত। তাই আবার দরজা খোলা হল, পিদিম জ্বালা হল, আধঘণ্টা চুপ করে বসে বসে চিন্তা করা হল। বেয়াড়া টিকটিকিটার ওপর মানিকের রাগ দেখে কে! সে যাই হোক. অগত্যা তারা বেরল।

যে-পথে মানিক ওদের ডাকতে এসেছিল, সেই পথ ধরেই গাঁয়ের প্রায় মধ্যিখানে পৌঁছে, ওরা একটা বাড়ির ভিতর ঢুকল। ততক্ষণে আকাশের তারা নিবে গেছিল। খালি পূব আকাশে একা শুকতারা রাজার মতো শোভা পাচ্ছিল। যেন সবে ঘুম-ভাঙা পৃথিবীকে জানান দিচ্ছে, "ওঠ, ওঠ, কি সুন্দর দিন করেছে চেয়ে দেখ!"



এর-ই মধ্যে পথে লোক দেখা যাচ্ছিল ; হুঁকো হাতে যে যার চলেছে, থেকে থেকে খক্-খক্ করে কাশছে। মানিক, রূপার মা-আর রূপার সঙ্গে ঘরে ঢুকে কাজ নেই। তার চাইতে গ্রামটা একটু ঘুরে দেখা যাক।

বর্ধমান শহরের তিন কোশ উত্তর-পূবে সাহাবাদ পরগণায় কাঞ্চনপুর যেমন-তেমন গ্রাম ছিল না। বাংলার হিন্দু সমাজের ছত্রিশ জাতের হাজার দেড়েক লোকের বাস, অবিশ্যি তার মধ্যে সদ্গোপ-ই বেশি। সদ্গোপরা চাষবাস করে।

গ্রামের নাম কেন যে কাঞ্চনপুর হল, সেটা ঠিক জানা যায়নি। সব চাইতে বুড়ো গ্রামবাসীরা বলেন নাকি এখানকার চাষীদের অবস্থা অন্য জায়গার চেয়ে ঢের ভালো, তারা অনেক বেশি আরামে থাকে, তাই ও নাম। আবার কেউ কেউ বলে এখানে অনেক সোনার-বেনের বাস, তাই কাঞ্চনপুর নাম। কাঞ্চন মানেই তো সোনা।

সে যাই হোক, গ্রামটি বেশ বড় আর বর্ধিষ্ণু। অনেক ঘর বামুন আছে। তারা রাঢ়া শ্রেণীর শ্রোত্রীয়। ভাগিরথী নদীর পশ্চিম দিকটাকে রাঢ় দেশ বলে। কায়স্থ বরং কম ছিল, তারা লেখাপড়া করত। অনেক উগ্রক্ষত্রিয় বা আগুরীও ছিল। সংখ্যায় সদ্গোপদের চেয়ে কম হলেও, তারা গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে ছিল। এ ছাড়াও যেমন সব গ্রামেই থাকে, বদ্যি, কামার, নাপিত, তাঁতী, গন্ধবেণে, তেলী, হাড়ি, বাগ্দী, ডোম ইত্যাদিও ছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল যে গ্রামে এক ঘর-ও মুসলমান ছিল না। পূর্ব বাংলার চাইতে পশ্চিম বাংলায় মুসলমান অনেক কম।

বাংলার বেশির ভাগ গ্রামের মতো, কাঞ্চনপুরে চারদিকে চারটি পাড়া, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম। গ্রামটা উত্তর থেকে দক্ষিণে ছড়ানো ; পূবের পশ্চিমের পাড়ার চাইতে উত্তরের আর দক্ষিণের পাড়া অনেকটা বড়। উত্তর থেকে দক্ষিণে, কাগ ওড়ার মতো সোজা এক রাস্তা। তার থেকে পূবে পশ্চিমে অনেকগুলো ছোট রাস্তা বেরিয়েছে।

বেশির ভাগ বাড়িই মাটির তৈরি, খড়ের চাল। তবে কায়স্থদের আর বেনেদের বেশ কিছু ইঁটের বাড়িও ছিল। বড় রাস্তাটার দু ধারেই সারি সারি বাড়ি, কোনোটা মাটির, কোনোটা ইঁটের।

বাড়ির চারদিকে বাগান; সেখানে অন্ততঃ দু'তিনটি করে গাছ: কুল, আম, পেয়ারা, লেবু, পেঁপে। আর সব জায়গায় কলাগাছ।

গ্রামের বাইরেও দুদিকেই সিকি মাইল দূর পর্যন্ত পথটি চলে গেছে। দু ধারে দু সারি সুন্দর অশ্বত্থ গাছ। গ্রামের ঠিক মধ্যিখানে মুখোমুখি দুটি শিবমন্দির। একটি মন্দিরের সামনে চার সারি বড় বড় থাম। দুই মন্দিরের মাঝখানে অনেক অশ্বত্থ গাছ। এ ছাড়াও গ্রামে আরো শিবমন্দির ছিল, তবে দেখবার মতো কিছু নয়।

গ্রামের যে চারটি ভাগ, তার প্রত্যেকটির মধ্যিখানে একটি করে বড় বকুল গাছ। গাছের পায়ের কাছটি মাটি থেকে প্রায় দু হাত উঁচু করে গোল বেদীর মতো বাঁধানো। তার মাঝখানে গাছটির কি শোভা। বেদীর এধার থেকে ওধার প্রায় আট হাতের কাছাকাছি হবে। অনেকগুলি লোক সেখানে বসতে পারত। যে কোনো দিন বিকেলে ওদিকে গেলে দেখা যেত যে যার আসন কিম্বা মাদুর পেতে গাঁয়ের ভদ্রলোকরা গাঁয়ের রাজনীতি নিয়ে গল্প করছেন; তাস, পাশা, দাবা খেলা হচ্ছে। দাবাকে বলত রাজার খেলা।

গাঁয়ে বড় জোর গোটা ছয় দোকান ছিল। সে-সব দোকানে চাল, ডাল, নুন, তেল, তামাক ইত্যাদি বাঙালীদের নিত্য প্রয়োজনের জিনিস কিনতে পাওয়া যেত। তাছাড়া গাঁয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের খোলা জমিতে শনি মঙ্গলবার হাট বসত। হাটে তরি-তরকারি, কাপড়-চোপড়, কাঁচি-বঁটি, মশলাপাতি আর হাজার রকম খুঁটিনাটি জিনিস পাওয়া যেত।

যে-ধার থেকেই গাঁয়ের দিকে আসা যাক না কেন, কাঞ্চনপুর একটা দেখবার মতো জায়গা বটে। এ-রাজ্যের প্রায় সব গ্রামের-ই বাইরে যেমন আম-বন আর বাঁশ-ঝাড় থাকে, কাঞ্চনপুরেও তেমনি ছিল। তার ওপর অনেকগুলো বিশাল সুন্দর দীঘি গ্রামটিকে ঘিরে রেখেছিল। একেকটি দীঘির মাপ প্রায় পনেরো-কুড়ি বিঘা। তার চারদিকে মাটির উঁচু বাঁধ। বাঁধের ওপর শত শত জমকালো

তালগাছ বাতাসে পাতা দোলাত। দূর থেকে মনে হত যেন কোনো কেল্লার গড়ের ওপর দীর্ঘদেহী সান্ত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে।



দুটি দীঘির বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলতে হয়। গাঁয়ের দক্ষিণ-পুব কোণে 'হিমসাগর'; বরফের মতো ঠাণ্ডা তার জল। দীঘিতে দুটি ঘাট; একটি পুরুষদের জন্য, একটি মেয়েদের; মাঝখানে অনেকটা তফাৎ। ঘাটের সিঁড়ি শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো। ঘাটের ওপর দুধারে দুটি উঁচু ইঁটের মঞ্চের ওপর তুলসী গাছ। আরেকটু ওপরে দুধারে দুটি শ্রীফলের গাছ। শ্রীফল মানে বেল। ঘাটের সামনে মন্দির; মন্দিরে প্রমাণ মাপের চৈতন্যদেবের মূর্তি।

অন্য দীঘির নাম 'কৃষ্ণসাগর', কালো-দীঘি। দূর থেকে দেখলে তার জলকে মনে হয় মিশ-কালো। লোকে বলে কাকের চোখের মতো কালো জল। এখানকার ঘাটে হিমসাগরের ঘাটের মতো বাহার নেই; কিন্তু সবাই বলত এ গাঁয়ে এত গভীর পুষ্করিণীও আর নেই। এমন কি কেউ কেউ এতদূর-ও বলত যে দীঘির জল পাতাল অবধি নেমেছে। তাছাড়া অনেকের বিশ্বাস ছিল দীঘির তলায় অঢেল ধনরত্ন, সোনার মোহর। এক যক্ষ নাকি সে-সব পাহারা দিচ্ছে। এই সব কারণে গ্রামবাসীরা কৃষ্ণসাগরকে ভয়-ভক্তির চোখে দেখত।

গ্রামের মধ্যে সব চাইতে বেশি যার বয়স, সে পর্যন্ত বলত এ দীঘিতে জাল ফেলে কখনো সব মাছ তোলা হয়নি। জাল ফেললেই

দেখা যেত মাঝ-পুকুরে পৌঁছলে জাল কেটে যায়। এখানে কেউ স্নান করত না, যদিও সকালে বিকেলে দলে দলে মেয়েরা এসে এখান থেকে পানীয় জল তুলে নিয়ে যেত। খোঁড়া হয়ে অবধি এ পুকুর কেউ পরিষ্কার করেনি; একশো রকম দামেতে পানাতে ভরতি; অথচ কি পরিষ্কার টলটলে জল। এ-জল খেলে কারো যে অনিষ্ট হতে পারে না, তাই নিয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

গ্রামের অন্য সব পুকুর এতটা বড় না হলেও, তাদের জলও বড় ভালো। তাদের চারদিকেও উঁচু বাঁধ; তার ওপর সারি সারি তালগাছ লম্বা শরীর আর পাতার মুকুট পরা মাথা আকাশের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁধের নিচে যে দিকে চোখ যায়, আম তেঁতুল কৎবেলের বন।

এই সব গাছ-গাছালির মেলা শুধু গাঁয়ের বাইরেই দেখা যায় না। গ্রামের সীমানার মধ্যেও লোকের বাড়ির চারদিকে অজস্র বাঁশ-ঝাড় আর নানা জাতের গাছ। অনেকের বাগানে ফল-গাছের ফুল-গাছের কত যত্ন। সে বাগানে মাঝে মাঝে নারকেলগাছও দেখা যায়। তবে সাহাবাদ পরগণার মাটিতে নারকেল সহজে ফলে না।

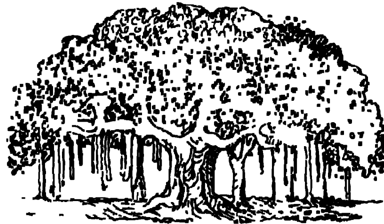
কাঞ্চনপুরের গাছপালার মধ্যে দেখবার মতো তিনটি জিনিস ছিল। গাঁয়ের দক্ষিণ ভাগে এক সারি পলাশগাছ ছিল, সব নিয়ে চব্বিশ-পঁচিশটি হবে। সে গাছে ফুল ফুটলে তার যে বাহার খুলত! সমস্ত গাছটি, ডাল-পালা গুঁড়ির সব জায়গা, ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত। আর সে কি অপরূপ ফুল! দূর থেকে তাই দেখে আগন্তুকরা মুগ্ধ হয়ে যেত।

আর ছিল বিশাল এক বকুলগাছ। ডাল-পালা মেলে সে-গাছ বেশ কয়েক শো হাত জায়গাতে ছায়া দিত। রাতে সেখানে হাজার হাজার পাখি এসে আশ্রয় নিত। বাংলার লোকে বকুলগাছ বড় ভালোবাসে। এমন নিটোল গড়ন কম গাছের-ই হয় আর ছোট ছোট ফুলগুলির কি কোমল মিষ্টি গন্ধ। বকুল-গাছের ওপরটা এমন সুন্দর

মোলায়েম আর গোল যে বিদেশের লোকে দেখে মনে করতে পারে কেউ বুঝি কাঁচি দিয়ে ছেঁটে রেখেছে।

তবে এই বকুলগাছটির বিশেষত্ব হল যে এমন বিশাল বকুল সচরাচর দেখা যায় না। সমস্ত বর্ধমান জেলায় এমন আরেকটি আছে বলে মনে হয় না।

কাঞ্চনপুরের তৃতীয় দর্শনধারী গাছ হল গাঁয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে, হাটের কাছে চমৎকার একটি বটগাছ। অনেক বিঘে জমি জুড়ে রয়েছে সেই গাছ। শত শত ঝুরি নেমে, মাটিতে শিকড় গেড়ে, আলাদা গাছ হয়ে গেছে। রাতে হাজার হাজার পাখি এই গাছে আশ্রয় তো নেয়-ই, দিনের বেলাতেও মেলা রাখাল-ছেলে পাশের মাঠে গোরু ছেড়ে দিয়ে, এই গাছের ছায়ায় বসে আরাম করে আর গাছটাকে আশীর্বাদ করে।



ইংরেজ কবি মিল্টন তাঁর কাব্যে এই রকম আশ্চর্য গাছের বর্ণনা দিয়েছেন। সেকালের কোনো কোনো ইংরেজ লেখক-ও এদেশের গ্রাম্য জীবনের কথা লিখে গেছেন। স্যার হেনরি মেনের একটি ভারি তথ্যপূর্ণ আর চিন্তাশীল বই আছে। তার নাম 'পূর্বের ও পশ্চিমের পল্লী সমাজ'। তিনি লিখেছেন ভারতের একেকটি গ্রামের তিনটি ভাগ থাকে। প্রথম হল মূল গ্রামটি, যেখানে সমাজের লোকরা থাকে। দ্বিতীয় হল গ্রামটিকে ঘিরে চাষের জমি। সবার শেষে জনসাধারণের গোরু চরাবার জন্য পতিত জমি। কাঞ্চনপুরের বাস্তু জমির কথা তো বলাই হয়েছে। গ্রামটাকে ঘিরে ছিল হাজার হাজার বিঘা চাষের

জমি। মনে হয় মধ্যিখানে গ্রামটাকে রেখে, চারদিকে আধ মাইল ব্যাসার্ধ রেখে একটা চাষ-জমির বৃত্ত টানা যেত।

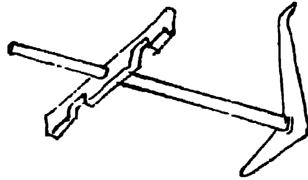
এদিকের প্রধান ফসল হল নানা জাতের ধান। ধান ছাড়াও যথেষ্ট ভাল জাতের সরষে, যব, তুলো, তামাক, শণ, পাট, আখ হয়। গ্রামের চারিদিকের জমির প্রায় প্রত্যেকটি ইঞ্চিতে চাষ হবার দরুণ পতিত জমি বলে কিছু ছিল না। ঘাস জমির সে রকম দরকারও ছিল না, কারণ গাঁয়ে কেউ ভেড়ার পাল রাখত না। গাই বলদ অবিশ্যি অনেক ছিল। তারা দীঘি পুকুরের চারধারের উঁচু বাঁধের গায়ে যে ঘন ঘাস হত, তাই খেত। তাছাড়া ধানক্ষেতের আলে, আমবাগানের তেঁতুল বাগানের ভিতরে আর দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেতের মধ্যে মধ্যে যে সব পুকুর দেখে চোখের ক্লান্তি দূর হত, সেগুলির ধারে ধারে প্রচুর ঘাস জন্মাত। সেখানেও গোরু চরত।

যে রাতের কথা দিয়ে এ গল্প শুরু হয়েছিল, তার পরদিন বেলা বারোটায় মনে হচ্ছিল সূর্যটার দয়ামায়া নেই, যেন একটা প্রকাণ্ড উনুন চারদিকে আগুনের হল্‌কা ছিটোচ্ছে। বাতাস নেই বললেই হয়; তালগাছের প্রকাণ্ড পাতাগুলো পর্যন্ত ঝুলে রয়েছে, এতটুকু নড়ছে না। গাছের তলায় গোরুগুলো জাবর কাটছে; পাখিগুলো পর্যন্ত দিবানিদ্রায় ডুবে আছে।

ঠিক সেই সময়, যখন সমস্ত প্রকৃতি নেতিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছিল, কাঞ্চনপুরের পূবদিকে একজন চাষীকে একা একা জমিতে লাঙল দিতে দেখা গেল। আগের সন্ধ্যায় ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছিল, মাটি এখন নরম, এই সুযোগে মানিক সামন্ত আউশ ধানের জন্য জমি তৈরি করতে লেগে গেছিল। শীতের ধান হল আমন। আমনের চাইতে আউশ তাড়াতাড়ি পাকে, তাই তাকে বলে আউশ, অর্থাৎ আশু।

মানিক সামন্ত লাঙল চালাচ্ছিল। সে-রকম লাঙল সাহেবরা তো দেখেই নি, এমন কি কলকাতার বাবুরা একদিকে তাঁদের মারাঠা খাল নিয়ে এত দেমাক করেন, ওদিকে নিজের দেশের

পাড়া-গাঁকে ঘেন্না করেন আর ধান-গাছ দেখেন নি বলে জাঁক করেন। অথচ সেকালের স্বনামধন্য দুই কবি হেসিয়ড্ আর ভার্জিল পর্যন্ত লাঙলের কথা লিখে গেছেন। বাঙ্গালী চাষীদের এই লাঙল অনেকটা সেকালের গ্রীক রোমান চাষীদের লাঙলের-ই মতো। তবে এগুলি ওক্ কাঠের কিম্বা এল্‌ম্ কাঠের না হয়ে বাবুল কাঠের তৈরি। বর্ধমানের লোক বলে বাবলা কাঠ। কাঠের ফালের আগায় লোহা লাগানো থাকে। বাঙালী পাঠককে বাংলার লাঙলের বর্ণনা দেওয়ার মানে হয় না।



মানিক সামন্ত কিন্তু লাঙল নিয়ে খুব সুবিধে করতে পারছিল না। দু হাত লাগিয়েও পেরে উঠছিল না; রোদে পোড়া গাল বেয়ে ঘামের বন্যা নামছিল; চিৎকার করে গাল দিয়ে মানিক বলদ দুটোর ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছিল। মোট কথা বোধ হয় বলদ দুটোর কাজ করবার ইচ্ছাই ছিল না। একটু দূরে গিয়েই তারা ঠায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। মানিক তাদের ল্যাজ মুচ্‌ড়িয়ে, বেচারাদের চোদ্দর বাড়া গাল দিচ্ছিল।

"নড়িস্‌নে কেনরে শ্যালারা? দেখছিস্‌নে বেলা হয়ে গেছে? কপালে বাঁশ লাগালে তবে কি বুদ্ধি হবে রে শ্যালারা?" ধমকানিতে কিছু হচ্ছে না দেখে মানিক খোশামোদ শুরু করল।

"নে, চল্ রে ধন, চল্ বাপ্, আরেকটু এগো বাছা! আরেকটুখানি গেলেই তো হয়ে যায়?" কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভোর থেকে বলদ দুটো লাঙল টানছে; খিদেয় তেষ্টায় ক্লান্তিতে হতভাগাদের পা আর চলে না! মাঠের মধ্যে পালা করে এই রকম

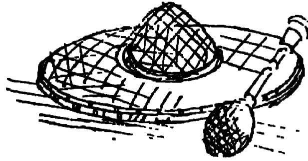
ধমক-ধামক খোশামোদ চলেছিল ; ওদিকে মাঠের ধারেই ডোবার পাশে অশ্বত্থগাছ, তার তলায় দুজন লোককে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। যার বয়স কম, সে ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়েছিল। যাকে দেখে বয়সে বড় মনে হচ্ছিল, সে হুঁকো খাচ্ছিল।

হুঁকো নইলে বাংলার চাষীদের একদিন-ও চলে না। আশাকরি এতে কারো আপত্তি নেই। উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনির মধ্যে হুঁকো ছাড়া তাদের আর আছে কি ? তাদের তো আর বিলেতের চাষীদের মতো 'বীয়ার' খেয়ে শরীর মন চাঙা করার উপায় ছিল না। যাঁরা দেশের আইন তৈরি করতেন, তাঁদের যদি এমন-ই দুর্বুদ্ধি হত যে তামাকের ওপরেও কর চাপাতেন, তাহলে গরীব চাষীর জীবনের অর্ধেক সুখ উবে যেত, প্রাণ ধরাই একটা অসহ্য বোঝার মতো মনে হত।

ধুতির খুঁটে কিছু তামাক-পাতা বেঁধে আর হাতে হুঁকো না নিয়ে কোনো বাঙালী চাষী মাঠে যেত না। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন দেশলাইয়ের চলন হয়নি, নারকেল দড়িতে করে আগুন নিয়ে চাষীরা মাঠে যেত। বাঙালী চাষীদের তামাক-পাতা চিবোবার অভ্যাস ছিল না, তারা হুঁকো কলকে দিয়ে তামাক খেত। অনেকেই নিজেদের বাড়িতে তামাক চাষ করত, নয়তো গাঁয়ের দোকান থেকে শুকনো তামাক-পাতা কিনত। ঘরেই পাতাটাকে তৈরি করে নিত। প্রথমে পাতা কুচিয়ে, তাতে একটু গুড় আর জল দিয়ে ময়দা মাখার মত ডলে নিয়ে, নরম একটা তাল বানিয়ে ফেলত। এবার কল্‌কে ধরালেই হলো।

চাষীর হাতের হুঁকোটিও অতি সাধারণ সহজ ব্যাপার। একটা গোটা নারকেলের খোলার ওপরকার গর্তে একটা নল বসানো থাকে। নারকেল মালার দুই চোখের মধ্যিখানে একটা ছোট ছ্যাদা করে নিতে হয়। নারকেল মালার অর্ধেকটা জল দিয়ে ভরতে হয়। তারপর ছোট্ট মাটির কল্‌কেটিতে টিকে আর তামাকের দলা রেখে

আগুন দিতে হয়। এবার কল্কেটিকে নলটির মাথায় বসিয়ে দিয়ে, মালার দুই চোখের মধ্যিখানের ছ্যাঁদায় মুখ লাগিয়ে আস্তে আস্তে টান দিতে হয়। তামাকের ধোঁয়া নল দিয়ে নেমে হুঁকোর জলের ওপর দিয়ে এসে, ছ্যাঁদা দিয়ে মুখে পৌঁছায়। মধুর একটা গুড়ুক গুড়ুক শব্দ বেরোয়। ক্লান্ত চাষীর কানে সে শব্দটি তানপুরো কিম্বা বীণার সুরের চেয়েও মিষ্টি লাগে।



একেকটা হুঁকো বহু বছর কাজ দিত, মাটির কল্কে থেকে থেকে কিনতে হত। সব নিয়ে হয়তো একটা পয়সা খরচ হত। পাঁড় তামাক-খোরেরও চব্বিশ ঘণ্টার তামাকের দাম পড়ত এক পাই। এই সামান্য খরচে গরীব চাষী কতগুণ আনন্দ পেত। কত শান্তি পেত। ঘাম শুকিয়ে যেত, গায়ে জোর আসত, সব ক্লান্তি দূর হয়ে যেত, কোটরে ঢোকা চোখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠত, মনের উৎসাহ শরীরের শক্তি ফিরে আসত, হাড়-ভাঙা খাটুনির জীবনের কষ্ট কমে যেত।

একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লিখেছিলেন, "যে মানুষ প্রথম তামাকের ব্যবহার আবিষ্কার করেছিল, সে ধন্য। এর জন্য ব্যবসায়ী ব্যবসা ছাড়ে, ভোগাসক্ত বিলাস ছাড়ে, প্রেমিক তার হৃদয়হীনা প্রণয়িনীকে ছাড়ে, স্বামী তার দজ্জাল স্ত্রীকে ছাড়ে, এবং আমিও সমস্ত সংসার ত্যাগ করে তামুক সেবন করি।" সরকার যত খুসি কর চাপাতে পারেন, আয়-কর, লাইসেন্স-কর, উত্তরাধিকার-কর, নুন-কর, ভোজ-কর, উপবাস-কর, কিন্তু সাবধান! এই মহামূল্য পাতাটির ওপর যেন কর না বসান। কারণ তামাক হল গরীব বাঙালী

চাষীর ধন্বন্তরীর প্রলেপ, তার একমাত্র সর্ব-দুঃখ-তাপ-হারী শান্তির ওষুধ।

সেই যাই হোক, ঐ যে দুটি লোক গাছতলায় বসেছিল, তাদের মধ্যে বড়জন মানিকের আর তার বলদের দুর্গতি দেখে হাঁক পাড়ল, "হেই, মানিক! বলদ দুটোকে ছাড়ান দে, ওরা আর নড়তে পারছে না। আর তুই নিজেও এখানে আয়, একটু জিরিয়ে নে।"

বলদ দুটোকে ছাড়বামাত্র তারা ডোবার ধারে ছুটে গিয়ে এক নিশ্বাসে অনেকখানি করে জল খেল। মানিক নিজেও লাঙল কাঁধে নিয়ে, গাছতলায় এসে ওদের সঙ্গে তামাক খেতে বসে গেল।

যে ছিল সবার বড়, সে তখন বলল, "চল ভাই, স্নান সেরে ভাত খাবার জন্য তৈরি হওয়া যাক। মালতী এই এল বলে।"

মানিক বলল, "বেশ। এই গয়ারাম, গায়ে তেল মাখ্।" সবার ছোট গয়ারাম। সে বলল, "বড়দা আগে মাখুক।"

বলা বাহুল্য এরা তিন ভাই। সবার বড় বদন, তার ত্রিশ বছর বয়স। বদন হল বাড়ির কর্তা। তারপর মানিক, তার বয়স পঁচিশ। সবার ছোট গয়ারামের কুড়ি বছর বয়স। গয়ারামের কাজ গোরুর রাখালি করা। বড় ভাইরা লাঙল দিতে এসেছিল। তাদের পরনের কাপড়ের মধ্যে একখানি করে আট হাতি খাটো ধুতি, কোমরে জড়িয়ে পরা, হাঁটু অবধি বহর। খালি গা, খালি মাথা, জুতো বলে কোনো জিনিস ওরা বাপের কালেও দেখেনি।

এ ছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল দেড় হাত চওড়া তিন হাত লম্বা একটা করে গামছা। বাঙালী চাষীরা রোজ স্নান করে, গামছা নইলে তাদের একদিন-ও চলে না। স্নানের সময় ছাড়াও গামছা অনেক কাজে লাগে। রোদের সময় ভিজে গামছা মাথায় জড়িয়ে কিঞ্চিৎ আরাম পাওয়া যায়; কখনো বা চাদরের মতো গায়ে জড়ানো যায়, কিংবা কোমরবন্ধের মতো কোমরে বাঁধা যায়।

তাছাড়া গামছায় বেঁধে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ভারি সুবিধা, বাঙালী চাষীদের তো আর পকেটের বালাই নেই।

মাথায় বদন সাধারণ বাঙালীদের-ই মতো; বলিষ্ঠ গড়ন, উঁচু কপাল; বড় বড় উজ্জ্বল চোখ আর সারা গায়ে, বিশেষতঃ বুকে, বেজায় লোম। বদনের সঙ্গে গয়ারামের চেহারার অনেক সাদৃশ্য, তবে এখনো সে খেটে খেটে অতটা শক্ত হয়ে ওঠেনি।

মানিকের চেহারা একেবারে অন্যরকম। ওদের না চিনলে শুধু ওকে দেখে কেউ বিশ্বাস করতে পারত না যে ও বদনের আর গয়ারামের নিজের ভাই। মানিকের গায়ের রঙ ওদের চেয়ে কালো, চকচকে আবলুস কাঠের মতো। অত কালো ও গাঁয়ে আর কেউ ছিল না; তাই ওর নাম শুধু মানিক হলেও সবাই ডাকত কালামানিক। সাধারণ বাঙালীদের চাইতে মানিক মাথায় অনেকখানি উঁচু ছিল, ছয় ফুট মতো হবে। প্রকাণ্ড বড় মাথা ভরা চুলের সঙ্গে চিরুণীর কোনো সম্পর্ক ছিল না; সিঁথিটিঁথিও কাটত না; সজারুর কাঁটার মতো চুলগুলো খাড়া হয়ে থাকত। প্রকাণ্ড বড় মুখটা হাঁ করলেই দু সারি ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ত। দাঁতগুলো এত বড় যে লোকে বলত মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে, মানিকের দাঁতগুলোও কোদালের মতো হয়ে গেছে। তার ওপর মানিকের হাত দুটো ছিল এমনি লম্বা যে সোজা হয়ে দাঁড়ালে আঙুলের ডগা গিয়ে হাঁটুতে ঠেকত।

দুই কাঁধের মধ্যিখানটা একটু উঁচু, অনেকটা ষাঁড়ের ঘাড়ের মতো। যারা পাল্কি কিম্বা অন্য ভারি জিনিস কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যায়, তাদের কাঁধে ঐ রকম একটা মাংসপিণ্ড উঁচু হয়ে থাকে। মানিকের পা-দুটো সোজা ছিল না, বরং ধনুকের মতো বাঁকা দেখাত। পায়ের আঙুলগুলো কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি, বুড়ো আঙুলের দিকে বেঁকে থাকত। দু পা হাঁটতে গেলেই, আঙুলের হাড়গুলো মট্ মট্ করে মট্কাত, যেন অদ্ভুত রকমের বাদ্যি বাজছে।

বোঝাই যাচ্ছে এই ছয় ফুটের ওপর লম্বা, আবলুস কাঠের মতো

কালো, এত বড় হাঁ-ওয়ালা, কোদাল-দেঁতো, উঁচু কাঁধ, লম্বা হাত, বাঁকা-ঠ্যাং লোকটার রূপটুপের বালাই ছিল না, দেখেও কেউ মুগ্ধ হত না। সত্যি কথা বলতে কি, গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওকে বেজায় ভয় করত। বেশি জ্বালাতন করলে বড়রা যেই বলত, 'ঐ যে কাল মানিক আসছে!' অমনি সব একেবারে চুপ! গাঁয়ের বিয়ে-না-হওয়া মেয়েদের-ও প্রায় সেই অবস্থা। এদিকে বদনের বড় শখ মানিকের একটা বিয়ে হোক। ছোট ভাই গয়ারামের জন্য বৌ পেতে কোন অসুবিধেই হয় নি; কিন্তু গোটা কাঞ্চনপুর আর তার বাইরে কুড়ি মাইল চুঁড়েও এমন বাপ-মা পাওয়া গেল না যে কালামানিকের হাতে মেয়ে দিতে রাজি।

কালামানিক তার সব সঙ্গী-সাথীদের চাইতে সরল ছিল। এমন কি প্রায় সবাই বলত ওর বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ কম। তা বুদ্ধির অভাবটা যে তার আশ্চর্য শারীরিক শক্তি আর মনের সাহস দিয়ে পুষিয়ে নিয়েছিল সে বিষয়-ও কোনো সন্দেহ ছিল না। ওর মতো কেউ দৌড়তে পারত না, সাঁতার কাটতে পারত না, গাঁয়ের মধ্যে ও-ই ছিল সেরা কুস্তিগীর। খ্যাপা ষাঁড়ের শিং চেপে ধরে ও থামাতে পারত; এক গাদা খড়ের আঁটি মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে পারত; আর গাঁয়ে যদি কখনো মারপিট হত, ওকেই সবার সামনে এগিয়ে দাঁড়াতে দেখা যেত আর মুগুর যা চালাত, একেবারে অব্যর্থ, যেন সাক্ষাৎ যম। এইরকম মানুষ ছিল কাঞ্চনপুরের কালামানিক, আমাদের গল্পের নায়কের কাকা।

আগে যেমন বলা হয়েছে, দু-চার কথার পর মাটি থেকে বাঁশের চোঙাটি তুলে, বদন তার হাতের তেলোয় খানিকটা সরষের তেল ঢেলে, সারা গায়ে মাখতে লাগল। চুলে তো দিলই, কানের ফুটোতে নাকের ফুটোতেও একটু করে দিতে ভুলল না। তারপর কালামানিক আর গয়ারাম-ও তেল মেখে পাশের পুকুরে স্নান করতে নামল। কালামানিক খানিকটা সাঁতার-ও কেটে নিল।

গামছা দিয়ে গা রগড়ে, গামছাটা বেশ করে ধুয়ে নিংড়ে, সেটি পরে, ওরা ধুতি কেচে, ঘাসের ওপর রোদে মেলে দিল। তারপর গাছতলায় বসে আর একটা গামছায় বাঁধা খানিকটা মুড়ি পুকুরের জলে ভিজিয়ে নিয়ে, সেইটে খানিক চিবিয়ে তিন ভাই পুকুরে গিয়ে জল খেল। গেলাসটেলাস কোথায় পাবে, আঁজলা ভরে জল খেল তারা, যেমন বাঙালী চাষীরা বাসনের অভাবে সর্বদা খেয়ে থাকে।

এবার শরীর ঠাণ্ডা হলে, বদন আর কালামানিক আবার লাঙ্গল দিতে গেল: গয়ারাম বসে বসে গোরু দেখতে লাগল। দু-এক ঘণ্টা বাদে দেখা গেল হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে একজন ছোট মেয়ে গয়ারাম যে গাছতলায় বসেছিল, সেদিকে আসছে। তাকে দেখতে পেয়েই বদন আর কালামানিক হালের গোরু খুলে দিয়ে গাছতলায় এসে জুটল।

বদন বলল, "কি রে মালতী, ভাত আনলি তাহলে। বাড়ির সব খবর ভালো তো?"

মালতী বলল, "হ্যাঁ, বাবা। জান, আমাদের বাড়িতে একটা খোকা এসেছে!"

তাই শুনে তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল, "খোকা? বাঃ খুব ভালো। কখন হল?"

আরো দুটো একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মালতী পুঁটলি খুলে তিনটে বড় কলাপাতায় ওদের ভাত বেড়ে দিল। অনেকগুলি ভাত, তরকারি, মাছ। একটা পেতলের ঘটিতে জল দিল। তিনজনে তৃপ্তি করে খেয়ে, ঐ একটা ঘটি থেকে গলায় জল ঢেলে নিল। জল ফুরোলে মালতী পুকুর থেকে আবার ঘটি ভরে আনল। তারপর আঁচিয়ে উঠে, ওরা তামাক খেতে খেতে ঠিক করল এমন সুখবরের পর আর কাজকর্ম নয়, এবার বাড়ি যাওয়া যাক। শুধু গয়ারাম থেকে গেল, কারণ সন্ধ্যের আগে গোরু ঘরে আনা যায় না।



২

লাঙ্গল কাঁধে কালামানিক আর বলদ-জোড়া নিয়ে বদন বাড়ি পৌঁছে দেখল, তাদের বাড়ির উঠোনে মেয়েছেলের ভিড়। সবাই বদনের ছেলে দেখতে এসেছিল। এক বুড়ি বামনী বদনকে বলল, "হ্যাগো বদন, দেবতারা তোমাকে পুত্তুর দিয়েছে। আহা সে চিরকাল বেঁচে থাক!" আরেক বুড়ি বলল, "কি সুন্দর ছেলে গো! লক্ষ বছর পরমাই হোক; খেয়ে পরে সুখে থাকুক। ধানের গোলা সদাই ভরে থাকুক।"

বদনের নিজের আনন্দ আর তার মায়ের মনে সুখ উপচে পড়ছিল, মুখে কারো কথা সরছিল না। রূপার মায়ের সেদিন ভারি খাতির, গ্রামের দাই বলতে সে-ই ছিল। আঁতুড়-ঘরে কারো যাবার যো ছিল না, খোকার বাপের-ও না, কারণ আঁতুড় হল অশুচি। ঘরের দোর থেকে রূপার মা ছেলে তুলে ধরে সবাইকে দেখাচ্ছিল। কি তার গর্ব আর মনের খুসি; খোকাটা যেন তারি ছেলে, কিম্বা নাতি। বুড়িরা আর ছুঁড়িরা সবাই মিলে খোকার সুখ্যাতি করতে থাকুক, সেই অবসরে বদনের ঘর-দোর ঘুরে দেখা যাক।

পুব দিকে মুখ করে, আম-কাঠের একটা ছোট দরজা দিয়ে বদনের বাড়িতে ঢুকতে হত। ঢুকেই উঠোন; পাড়াগাঁর সব গেরস্থ বাড়িতে

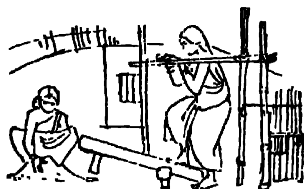
এই রকম একটা করে উঠোন থাকে। উঠোনের পশ্চিম দিকে ঢুকবার দোর বরাবর একটা বড় ঘর। বদনের বাড়ির সব ঘরের মধ্যে এটাই সবচেয়ে মস্ত, পরিপাটি আর যত্ন করে তৈরি। মাটির দেয়ালগুলো খুব পুরু। খড়ের চাল এক হাত মোটা। যে বাঁশের বাতার ওপর ছাদটি বসানো, তার কঞ্চিগুলো কাছাকাছি লাগানো। যেখানে এতটুকু ফাঁক, সে ফাঁকটি সর-গাছের সঙ্গে আরেক রকম লাল নল-খাগড়া দিয়ে বেশ করে এঁটে দেওয়া। মধ্যিখানের কড়িকাঠটি, যার ওপর ছাদের ভার পড়ে, সেটি দামী শাল সেগুনের না হলেও, তাল-গাছের মাজা দিয়ে তৈরি। ঘরের মেঝে মাটি থেকে অন্ততঃ পাঁচ ফুট উঁচুতে।

ঘরটি ষোল হাত লম্বা আর দাওয়া শুদ্ধ ধরলে বারো হাত চওড়া। দাওয়ার সামনে উঠোন। দাওয়ার ঠেকোগুলো শক্ত তালগাছের। বড় ঘরটি দুটি অসমান ভাগে ভাগ করা। বড় ভাগটা বদনের শোবার ঘর, ছোটটি ওদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর। সে ঘরে অনেকগুলো হাঁড়ি, জালা; তাতে খাবার জিনিস ভরা থাকত।

দাওয়াটাকে বাড়ির বসবার ঘর বা বৈঠকখানা বলা চলে। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন এলে সেখানে মাদুর পেতে বসত। বদনের শোবার ঘরে বাড়ির কাঁসার বাসনপত্র ও যা কিছু দামী জিনিস রাখা হত। তাই বলে খাট-পালঙ্ক ছিল না। মাটিতে মাদুর পেতে, তার ওপর সুতির তোষকে বদনের বিছানা হত। ঘরে খুব আলোও যেত না। উঠোনের দিকে দাওয়ার খড়ের চাল ঝুলে আলো আটকাত আর বাইরের দিকে অনেক উঁচুতে একটিমাত্র ছোট জানালা ছিল।

বলা বাহুল্য বদনের ঘরে আসবাব বলে কিছু ছিল না; টেবিল না, চেয়ার না, টুল আলমারি সিন্দুক বেঞ্চি, কিছু না। ঘরের এক পাশে দুটি আস্ত বাঁশ দেয়ালে গুঁজে দেওয়া হয়েছিল। তাতে ওদের কাপড়-চোপড় টাঙ্গিয়ে রাখা হত আর দিনের বেলায় বিছানা তুলে রাখা হত। এই হল বদনের বাড়ির বড় ঘর।

উঠোনের দক্ষিণে, বদনের ঘরের সঙ্গে কোণাকুণিভাবে আরেকটি ঘর। সেটি অনেক ছোট আর অত ভালো করে তৈরিও নয়। এ-ঘরে অনেক রকম কাজ হত। বাড়ির মেয়েদের ছেলেপিলে হলে, তারা এ-ঘরে থাকত। অন্য সময় এই ঘরটাকে গুদোমঘর বানানো হত। এখানে যত হাতিয়ার, চাষবাসের যন্ত্রপাতি রাখা হত। আপাততঃ এই ঘরেই ছোট খোকাকে নিয়ে বদনের স্ত্রী আর রূপার মা ছিল। এই ঘরের দাওয়ায় ওদের ঢেঁকি পাতা ছিল। তাই ঘরটাকে ঢেঁকিশাল বলা হত, কথায় বলতে সবাই বলত চ্যাঁসকল।



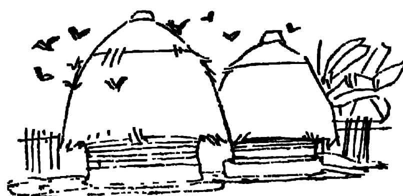
ঢেঁকিঘরের কোণাকুণি উঠোনের দক্ষিণ-পুব দিকে আরেকটি ঘর ছিল। এ-ঘরটি অনেকটা ভালো। এখানে গয়ারাম শুত। এর সামনের দাওয়াতে রান্নাবান্না হত। ঘরটাকে তাই পাকশালাও বলা হত, অবিশ্যি বদন আর তার বাড়ির লোকেরা বলত 'রান্নাঘর'। এ ছাড়া আর একটিমাত্র ঘর ছিল ; সেটি হল গোশালা বা গোয়াল-ঘর। গোয়াল ঘরটা ছিল উঠোনের উত্তরে, বদনের ঘরের সামনা-সামনি। অন্য ঘরের চাইতে গোয়াল ঘরটা ঢের বড় ছিল।

গোয়ালঘরের মাটিতে অনেকগুলো বড় বড় গামলা সাজানো ছিল। তাদের নিচের অর্ধেকটা ছোট ছোট মাটির ঢিপিতে গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গামলাগুলোর পাশে পাশে গোরু বাঁধবার খুঁটি পোঁতা ছিল। এই গামলায় গোরুদের জন্য জাব কেটে দেওয়া হত। তাছাড়া গোয়ালের এক কোণে একটা

উনুনের মতো ছিল। রোজ রাতে ঐ উনুনে ঘুঁটে পুড়িয়ে ধোঁয়া করা হত, যাতে মশাতে আর পিশুতে গোরুগুলোকে বেশি জ্বালাতন না করে।

বদনের বাড়ির পূব দিকে একটা পুকুর ছিল। সেই পুকুরের জল দিয়ে বদনের আর তার পাড়া-পড়শীদের সংসারের কাজ চলত। তবে সে-জল পান করা হত না। আগে যে দুটি দীঘির কথা বলা হয়েছে, খাবার জল আসত সেখানে থেকে। সেগুলি ছিল গ্রামের সীমানার কাছে। বদনের পুকুরের ধারে ওর নিজস্ব কয়েকটা গাছ ছিল। ঘাটের কাছে একটা মস্ত তালগাছ। তার চারদিকে ঝোপ-ঝাপ ছিল, যাতে মেয়েরা জল নিতে এলে একটু আড়াল হয়। কাছেই একটা জাম গাছ আর একটা খেজুর গাছ। সেটা আবার এমনি জায়গায় যে তার ফল পাকলেই জলে পড়ত।

গোয়ালের কাছে, উঠোনের মধ্যিখানে বদনের ধানের গোলা ছিল। বর্ধমানের লোকে গোলাকে বলে মরাই। খড়ের দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে মরাই তৈরি করা হয়; দেখতে চোঙা মতো, ওপরে একটা খড়ের তৈরি গোল ছাদ। এই গোলায় এত ধান ধরত যে একেবারে এক ফসল কাটা থেকে পরের বছরের ফসল কাটা



পর্যন্ত বদনের পরিবারের খাওয়া চলে যেত। গোলার কাছেই পালুই অর্থাৎ প্রকাণ্ড এক খড়ের গাদা। এক বছর ধরে বদনের গাই বলদ ঐ খড় খেত। রান্নাঘরের পেছনে পুকুরের কাছেই ওদের ছাই-গাদা। অর্থাৎ একটা মস্ত গর্ত, যদিও বেশি গভীর নয়। তাতে

উঠোনের আবর্জনা, উনুনের ছাই, গোয়ালের ময়লা, তরকারির খোসা ইত্যাদি ফেলা হত। স্বাস্থ্যের দিক থেকে খুব একটা বাঞ্ছনীয় না হলেও, ছাই-গাদাগুলো চাষীদের বড় কাজে লাগত। ক্ষেতের জন্য ওর মধ্যে থেকেই সার পাওয়া যেত।

সাহেবদের ধারণা আমাদের পাড়া-গাঁয়ে বুঝি ময়লা আর দূষিত জল দূরীকরণের কোন ব্যবস্থাই নেই। এ ধারণা একেবারে ভুল। পাড়া-গাঁয়ের আবর্জনা দূরীকরণের প্রধান পদাধিকারী হল বুনো শূওর। গ্রামের ও তার চারধারে যেখানে যত ময়লা হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে তারা বিনা পয়সায় এবং অতি দক্ষভাবে সেগুলো দূর করে দেয়।

বদনের বাড়ির ঘরগুলো কিন্তু বদনের তৈরি নয়, ওর বাপ-ঠাকুরদাদের কেউ করে গেছিলেন। তবে প্রত্যেক বছরই ঘরের চাল মেরামত করতে হত আর পাঁচ ছয় বছর অন্তর নতুন ছাদ তৈরি করতে হত। ঘরগুলি বদনের নিজের সম্পত্তি, তার জন্য কোন খরচ লাগত না। তবে বছরে এক টাকা করে জমির খাজনা দিতে হত।

বাড়ির কথা তো অনেক হল; এবার বাড়ির বাসিন্দাদের বিষয়ও কিছু বলতে হয়। বদন, কালামানিক আর গয়ারামের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। তবে ওদের পুরো নামগুলি জানা উচিত। নাম হল বদনচন্দ্র সামন্ত, মানিকচন্দ্র সামন্ত আর গয়ারাম সামন্ত। ওরা কাঞ্চনপুরের বেশির ভাগ চাষীর মতো সদ্গোপ ছিল না, জাতে ওরা আগুরী। বর্ধমানেই বেশি আগুরী দেখা যায়। সকলেই তাদের মনের সাহস, গায়ের জোর আর স্বাধীন চলাফেরার প্রশংসা করে। এছাড়া বদনের বাড়িতে থাকত বদনের মা আলঙ্গা, বদনের স্ত্রী সুন্দরী, মেয়ে মালতী আর গয়ারামের স্ত্রী আদুরী।

আলঙ্গার ভালো নাম হয়তো আলঙ্গ, সবাই ডাকত আলঙ্গা। তার বয়স ছেচল্লিশ, সে-ই ছিল বাড়ির গিন্নি। বদন মাকে ভারি

ভক্তি করত আর ঘর সংসারের যে ব্যবস্থাই মা করত, বদন তাই মেনে নিত। আলঙ্গার অন্য ছেলেরা এবং বৌরাও কিছু কম বাধ্য ছিল না। এ যদি বিলেত হত, তাহলে বদনের স্ত্রীর মনে হতে পারত যে বিধবা শাশুড়ির বদলে, তার-ই বাড়ির গিন্নি হওয়া উচিত। কিন্তু সুন্দরীর এমন কথা কখনই মনে হয়নি। শাশুড়ি বেঁচে থাকতে বৌ আবার বাড়ির গিন্নি হয় নাকি! এমন শাশুড়ির হেপাজতে থাকতে পারাই তো সৌভাগ্যের কথা, বৌদের তো তাই থাকাই উচিত। ওর চাইতে বয়সে অনেক বড়, বুদ্ধিতে অনেক বেশি, অনেক বেশি অভিজ্ঞ কারো হাতে সংসারের ভার ছিল বলে সুন্দরী খুব খুসি। বাড়ির বড় বৌ, কাজেই রান্নাবান্নার ভার ছিল তার হাতে; গয়ারামের বৌ আহুরী তাকে যথেষ্ট সাহায্য করত। অবিশ্যি সুন্দরী এখন, আঁতুড়-ঘরে, কাজেই রাঁধাবাড়ার কাজের বেশির ভাগটাই বদনের মায়ের ঘাড়ে পড়েছিল। আহুরার বয়স কম, তার হাতে রান্নার মতো শক্ত কাজের সবটা ছেড়ে দেওয়া যায় না।

আহুরী কিন্তু সুন্দরীর মতো ছিল না। তার স্বভাবটা কিঞ্চিৎ খিটখিটে। যে কোনো সময়ে, যেমন এখন, তার ঘাড়ে বেশি কাজ পড়লেই মেজাজ বিগড়ে যেত। এমনিতেই তার খানিকটা দম্ভ ছিল, কাজেই এ বাড়িতে দ্বিতীয় স্থান—আর দ্বিতীয় কেন বরং তৃতীয় স্থান নিতে হত বলে তার গা জ্বলে যেত। বদনের বাড়িতে সকলে মিলেমিশে সুখে থাকত, এক ঐ আহুরীই যা অশান্তির সৃষ্টি করত। অবিশ্যি বদনের আর কালামানিকের সঙ্গে ও জীবনে একটিও কথা বলেনি। এ দেশের ভাদ্দর-বৌরা ভাসুরের মুখের দিকেও কখনো তাকায় না, কথা বলা দূরে থাকুক; কিন্তু দেওরদের সঙ্গে গালগল্প করতে দোষ নেই। কাজেই আহুরী ভাসুরদের সঙ্গে কখনো কথা তো বলেইনি, ওরা ওর মুখ পর্যন্ত দেখেনি, কারণ ওরা বাড়ি থাকলে ও নাক অবধি ঘোমটা টেনে বেড়াত। তবে মাঝে মাঝে আহুরী শাশুড়ির মুখের ওপর চোপা করত; তার জন্য রাতে গয়ারামের

কাছে বকুনিও খেত কম না। এমন কি তার চাইতে শাঁসালো জিনিসও পেত, যেমন চড়-চাপড়টা, কিম্বা কানমলা। তার ফলে পরদিন আহ্লাদী হাঁড়িমুখ করে বেড়াত, সব কথার গরম গরম উত্তর দিত।

বদনের মেয়ে মালতীর তখন সাত বছর বয়স। রঙ শামলা হলেও, মুখখানিতে ভারি একটা শ্রী ছিল। স্বভাবটিও মায়ের মতোই নরম। এ বাড়ির প্রথম এবং অনেক দিন ধরে একমাত্র শিশু হওয়াতে আদর যথেষ্টই পেত, তবু তার মাথাটি ঘুরে যায়নি। কারো সঙ্গে মালতী বেয়াড়া ব্যবহার করত না, বা রাগত ভাবে কথা বলত না। মেয়ে ছিল বদনের চোখের মণি। সারা দিনের খাটুনির পর, সন্ধ্যে-বেলায় বাড়ির খোলা উঠোনে আসন-পিঁড়ি হয়ে, হুঁকো হাতে বসে, বদন মেয়ের মুখের মিষ্টি কথা শুনত; সারা দিন বাড়িতে কি হয়েছে সব বলত মালতী।

তার ওপর মেয়ে ভারি কাজের ছিল। সংসারের ছোটখাটো পঞ্চাশটা ফাই-ফরমায়েস খেটে দিয়ে মা ঠাকুমাকে খুব সাহায্য করত। বাইরের ছোট কাজ ও-ই করে দিত। গাঁয়ের দোকান থেকে তেল নুন আর নিত্য সামগ্রী মালতী ছাড়া আর কে আনবে! এ-সব কাজ ছাড়া রোজ সে বাপ-কাকাদের ভাত নিয়ে মাঠে যেত।

চাষীর বাড়ির বাসিন্দাদের কথা বলতে গেলে, গাই-বলদদের কথা বাদ দেওয়া যায় না। এদের অক্লান্ত আর নিঃস্বার্থ পরিশ্রম ছাড়া কোনো চাষীই তাদের ক্ষেতের ফসল ঘরে তুলতে পারত না। বদনের ছিল ছত্রিশ বিঘে জমি, একটি মাত্র লাঙল আর দুটি বলদ। একটি বলদের রঙ কালো, কাজেই তার নাম কেলে। অন্যটি লালচে, তার নাম শামলা। তাদের বয়স ছিল সাত-আট বছর। অনেক দিনের খাটুনি তাদের ওপর দিয়ে গেলেও, তারা কিছু রুগ্ন হয়ে পড়েনি; আরো অনেক বছর স্বচ্ছন্দে খাটতে পারবে। এক রকম বলতে গেলে ওরাই বাড়িটাকে মাথায় করে রেখেছিল, তাই ওরা যত্নও পেত

যথেষ্ট। সকাল সন্ধ্যে গয়ারাম খড় কুচিয়ে, তাতে জল আর খোল মিশিয়ে ওদের গামলা ভরে দিত। তবে গোয়ালে কেলে শামলা ছাড়াও আরো বাসিন্দা ছিল। তিনটে দুধেলা গাই ছিল, তাদের তিনটে বাছুর ছিল: একটি বক্‌না আর দুটি এঁড়ে। সে দুটিকে লাঙ্গল টানার জন্য তৈরি করা হচ্ছিল।

সব চাইতে বুড়ি গাইয়ের নাম ভগবতী। সে সকালে মোটে তিন পোয়া দুধ দিত আর বিকেলে দিত আধ সের। তার পর হল ঝুমরি। সে সকালে দেড় সের, বিকেলে এক সের দুধ দিত। শেষের গোরুর দাম কিন্তু সবার বেশি। তার নাম কামধেনু। সে সকালে তিন সের আর বিকেলে দু সের দুধ দিত। এঁড়ে বাছুর দুটোর কেউ নাম-ই দেয়নি। বক্‌নাটির তখন বছর দুই বয়স, তার নাম ছিল লক্ষ্মী। মালতী তাকে বড় ভালোবাসত।

সব গোরুগুলির দেখাশুনো করত গয়ারাম, সে-ই ছিল বাড়ির রাখাল। গোরুগুলো সারাদিন মাঠে চরত: তার ওপর রোজ সন্ধ্যায় তাদের গামলা ভরে খড়ের কুচি দিয়ে খোল দিয়ে জল দিয়ে খেতে দেওয়া হত। সকালে তারা শুকনো খড় চিবুত। কামধেনু ছিল বাড়ির সেরা গোরু; তাকে ঐ-সব খাবার ছাড়াও মাঝে মাঝে ভূষি, কিম্বা খুদের সঙ্গে লাউ সেদ্ধ করে দেওয়া হত।

রোজ সকালে গোয়াল-ঘর পরিষ্কার হলে পর, মালতী লক্ষ্মীকে দেখতে যেত। লক্ষ্মী তখন শুকনো খড় খেত আর মালতী তার গায়ে হাত বুলোত, তার ছোট ছোট শিং ধরে খেলা করত। লক্ষ্মীরও বড় নরম স্বভাব ছিল, মনে হত মালতীকে সে-ও খুব ভালোবাসে। এখন প্রশ্ন হল এত দুধ দিয়ে বদন করত কি? এর উত্তর হল যে সব কটি গোরু তো আর এক সময়ই দুধ দিত না। কিছু দুধ মেয়েরা, বিশেষতঃ মালতী খেত। কিছু দুধ পাশেই এক বামুন বাড়িতে বিক্রি করা হত। কিছু দুধের মাখন তুলে গাওয়া ঘি করা হত।

আলঙ্গা যেদিন ঘিয়ের জন্য মাখন তুলত, বাড়িসুদ্ধ সবাই বেজায় খুসি হত, কারণ ঘোলটা খেতে সকলেই ভালোবাসত।

গাই বলদ ছাড়া বদনের আর কোনো পোষা জানোয়ার ছিল না। হিন্দু বাড়িতে সেকালে কেউ হাঁস-মুরগি রাখত না। ও-সব ছুঁলে হিন্দুদের, বিশেষতঃ আগুরীদের জাত যেত। তবে বদনের আরেকটা জানোয়ার-ও ছিল। সেটি হল একটা কুকুর।

বাংলায় কিন্তু কুকুরের আদর ছিল না। কুকুরদের মালিকরা পর্যন্ত তাদের ছুঁত না। কুকুর নাকি অশুচি। বদনের কুকুরের নাম ছিল বাঘা, তার ভীষণ হিংস্র স্বভাবের জন্যেই হোক, কিম্বা বাঘের সঙ্গে তার কল্পিত সাদৃশ্যের জন্যেই হোক। সে সর্বদা দোরগোড়ায় কিম্বা খোলা উঠোনে শুয়ে বসে থাকত, ভিতরে আসত না। তার খাওয়ার ভাবনা ছিল না। বাড়ির পুরুষদের খাওয়া-দাওয়া হলে, যার পাতে যা পড়ে থাকত, পুকুরে আঁচাতে যাবার সময় সেটুকু সে বাঘাকে দিয়ে যেত। তাছাড়া এর বাড়ি ওর বাড়ি থেকে, কিম্বা রাস্তা থেকেও বাঘা খাবার জোগাড় করত।

আঁতুড়-ঘরের ষষ্ঠ দিনটি একটা বিশেষ দিন। সেদিন ষষ্ঠী পূজো হয়। মা ষষ্ঠী হলেন ছোট ছেলে-মেয়েদের দেবতা, তিনি তাদের রক্ষা করেন। তাছাড়া সেদিন রাতে বিধাতা পুরুষ এসে শিশুর কপালে তার ভাগ্য লিখে যান। একবার লেখা হলে, তাকে আর মুছে ফেলা যায় না। বিধাতা তো আর বগলে করে কালি কলম নিয়ে আসেন না, তাই আঁতুড়-ঘরের দরজার বাইরে একটা দোয়াত আর একটা খাগের কলম রেখে দিতে হত। বদন কিম্বা তার ভাইরা পড়তে জানত না, কাজেই বাড়িতে দোয়াত-কলম ছিল না। এ-সব ব্যাপারে বাড়ির আর সবার চাইতে আলঙ্গার উৎসাহ সব থেকে বেশি ছিল। পাড়ার একজনের বাড়ি থেকে দোয়াত-কলম চেয়ে এনে সে আঁতুড়-ঘরের চৌকাঠের ওপর রেখে দিল।

এদিকে বিধাতা আসবার কোনো ধরা বাঁধা সময় থাকে না;

রাতের যে-কোনো সময় তাঁর আগমন হতে পারে। অথচ সে-সময়ে একজন কারো জেগে থাকার কথা, কাজেই আঁতুড়-ঘরের দাইয়ের পরেই দায়িত্বটা পড়ে। রূপার মা সে-রাতে চোখের দু-পাতা এক করেনি। বাড়িসুদ্ধ সবাই তখন ঘুমিয়ে কাদা—যদিও উত্তেজনার চোখে আলঙ্গার ঘুম বারে বারে ভেঙে যাচ্ছিল—কাজেই সে-রাতের ঘটনার কথা রূপার মা ছাড়া কেউ জানল না। পরদিন সকালে খোলাও করে সে ব্যাপারটার বর্ণনা দিল।

রূপার মা বলল,

"রাতের দু পহর কাটলে পর দোরগোড়ায় পায়ের শব্দ শুনলাম। সেখানটায় দোয়াত-কলম ছিল ঠিক তারি কাছে। তারপর দোর থেকে আরম্ভ করে মায়ের পাশে শোয়া ঘুমন্ত খোকার কাছে অবধি পায়ের শব্দ শুনলাম। তারপর খচ্ খচ্ আওয়াজ হল, যেন কেউ কিছু লিখছে, কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু আংটার আগুনে দেখলাম খোকার ঠোঁটে হাসি। একটু বাদেই আবার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। এবার কেউ চলে যাচ্ছে। দরজা অবধি ছুটে গিয়ে বললাম, 'ঠাকুর! ভালো কথা লিখেছ তো?' ও-দেবতা আমার খুব চেনা, কতবার দেখা হয়েছে তার ঠিক নেই! শেষ পর্যন্ত আমি কাউকে বলব না এই সর্তে, খোকার কপালে কি লিখেছেন বিধাতা আমাকে বলে দিলেন! সে-সব কথা তো আর আমি পরকাশ করতে পারব না, বিধাতা তাহলে চটে গিয়ে আমার ঘাড়টাই মট্‌কে দেবেন। তবে এটুকু বলে রাখি, আলঙ্গা মা, তোমার নাতির কপাল ভালো। আনন্দ কর।"

বদন আর তার ভাইরা হয়তো এ-সব বিশ্বাস করেনি, কিন্তু আমি হলপ করে বলতে পারি বাড়ির মেয়েরা সকলে বিশ্বাস করেছিল যে ছেলের কপালে কি লিখেছেন, বিধাতা সে-কথা রূপার মাকে বলে গেছেন।

দু দিন পরে, ছেলের যখন আট দিন বয়স হল, আটকৌড়িয়া

বলে একটা ব্যাপার হল। আলঙ্গা আর আতুরী সারা দিন বড় ব্যস্ত। ধান ভেজে খৈ করা হল ; আট রকম ডাল ভাজা হল ; বদন গিয়ে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ভাঙিয়ে এক গাদা কড়ি নিয়ে এল। সূর্য ডোবার সময় একপাল ছেলে-মেয়ে বদনের বাড়িতে এল। বেশির ভাগই চাষীর ঘরের ছেলে-মেয়ে। তারা উঠোনে দাঁড়িয়ে খুব জোরে কুলো পিটিয়ে, আঁতুড়-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, 'আটকৌড়ে, বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভালো ?' তারপর আলঙ্গা আর রূপার মার উদ্দেশ্যে নানা রকম হাসি-ঠাট্টা করে, নেচে-কুঁদে, কুলো পিটিয়ে একাকার করল। ঝুড়ি হাতে আলঙ্গা বেরিয়ে এসে ছেলে-মেয়েগুলোর মাথার ওপর দিয়ে কড়ি আর খৈ মুড়ি কড়াই ছড়িয়ে দিতে লাগল। তারাও ঠেলাঠেলি করে সে-সব কুড়োতে লাগল ; এ-ওর পা মাড়িয়ে, একে ফেলে ওকে ফেলে কি মজাই না করল। বদনের ছেলের আটকৌড়ে ভালোভাবেই হয়ে গেল। আলঙ্গা আহ্লাদে আটখানা।

খোকা হবার একুশ দিন পরে সুন্দরী প্রথম স্নান করে, আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়ে, বাড়ির সকলের সঙ্গে ষষ্ঠী পুজোয় যোগ দিল। তাই বলে সঙ্গে সঙ্গে আগের মতো রান্নাবান্নার সব কাজ ঘাড়ে নিল না, কারণ ছেলেটার দেখাশুনো করতেই অনেক সময় যেত। অবিশ্যি ছেলের দেখাশুনো খুব একটা ভারি কাজ ছিল না ; ছেলের ঠাকুমা, কাকিমা তার খুব যত্ন করত আর মালতী সারাক্ষণ পাশে বসে খুসি-মনে ওর কচি কচি হাত পা নাড়া দেখত।

খোকার কাপড় চোপড়ের বালাই ছিল না। এ তো আর বিলেত নয় যে কথায় কথায় ছেলের ঠাণ্ডা লেগে যাবে, তাই এখানকার সব খোকা-খুকুরাই উদোম গায়ে মজা করে। রোজ সকালে সুন্দরী ছেলের গায়ে আচ্ছা করে সরষের তেল মাখানো হত, বিশেষ করে বুকের মধ্যিখানের গর্তপানা জায়গাটাতে। তারপর একটা পিঁড়ি উল্টে পেতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলের গায়ে রোদ লাগানো হত।

এ-সব শুনলে সায়েব ডাক্তাররা আঁৎকে উঠে বলবেন, "এঁ্যা! খালি গায়ে রোদে হাওয়ায় অমন করে ফেলে রাখলে তাতেই তো ছেলের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে!" কিন্তু বাংলার চাষী-বৌদের বুদ্ধি বেশি। তাদের বিশ্বাস ছোটবেলায় এমনি করে তেল মাখিয়ে রোদ লাগালে, পরে ছেলে কাজকর্মে পোক্ত হয়ে উঠবে।

সে যাই হোক গে, শৈশবে এই রোদে ভাজা হওয়ার ফলে বাঙালী চাষীদের মধ্যে সর্দিগর্মির প্রকোপ খুব কম, অথচ পৃথিবীর সব চাইতে গরম দেশের একটাতে তারা থাকে আর দিনমান খালি গায়ে, খালি মাথায়, চড়চড়ে রোদে কাজ করে। রোদ লেগে লেগে মাথা এমনি মজবুৎ হয়ে ওঠে যে সূর্যদেবের প্রচণ্ড প্রকোপ-ও তাদের কিছু করতে পরে না।

যখন আউশ ধান ঘরে উঠল, ছেলে তখন সাত মাসে পড়েছে। এবার তার মুখে ভাত দেওয়া হল। একে বলে অন্নপ্রাশন, কিন্তু বর্ধমানের মেয়েরা বলে ভুজনো, অর্থাৎ ভোজন। ধনী হিন্দুরা খুব ঘটা করে ছেলের মুখে ভাত দেয়। বদন গরীব মানুষ সে আর বেশী খরচ করবে কোত্থেকে? কিন্তু গোঁড়া হিন্দুর ছেলের যা যা করা উচিত তার সব-ই সে নিয়ার সঙ্গে করত। তার মনে হল ছেলের অন্নপ্রাশনে কিছু খরচ করা কর্তব্য।

প্রথমে ষষ্ঠীপুজো হল। তারপর বাছাই করা কয়েকজন নিকট আত্মীয়কে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হল। চাষীর বাড়িতে লোক খাওয়ানো মানে খুব একটা এলাহি কাণ্ড নয়। যৎসামান্য আয়োজন, ভাত, কলাই ডাল, একটা নিরামিষ ছেঁচকি, মাছের ঝাল, তেঁতুল দিয়ে মাছের অম্বল, আর শেষের পাতে দই। বড় ঘরের দাওয়ায় পুরুষ অতিথিরা দুটো সারি দিয়ে বসে, কলাপাতায় ভাত খেল। প্রত্যেকের ডান হাতের কাছে এক ঘটি জল, আর মাটির ওপর একটু নুন দেওয়া হল। মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। আলঙ্গা একাই পরিবেশন করল। প্রথমে প্রত্যেকের পাতে একটা বড় হাঁড়ি থেকে

ভাত দিয়ে গেল, তারপর ভাতের ওপরে অনেকখানি করে ডাল দিল। ডালের পর সবাইকে একটু করে তরকারি দিল। এবার খাওয়া শুরু হল। মাছের ঝাল এল, তারপর মাছের অম্বল। এইটিই সকলের সব চাইতে প্রিয় জিনিস।



মাছের অভাব ছিল না। বদনের পুকুর থেকে দশ বারো সের দুটো রুই মাছ ধরা হয়েছিল। বদনও ছেলের অন্নপ্রাশনে আহ্লাদে গদগদ হয়ে সকলকে পেড়াপেড়ি করে খাওয়াতে লাগল। আনন্দ রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না। প্রত্যেকের পাতে সে গাদা গাদা মাছ দিয়ে যাচ্ছিল। অতিথিরা চেঁচামেচি করছিল, "আর না! আর না! এর অর্ধেকও খেতে পারব না!" সবার শেষে এল দই। দই বেশ পাতলা। দেখে মনে হতে পারত এ দই কলাপাতায় ঢাললে গড়িয়ে যাবে, কেউ খেতে পারবে না। কিন্তু অতিথিরাও তেমনি চালাক, তারা সবাই পাতে খানিকটা ভাত নিয়ে ভাতের মধ্যিখানে গর্ত বানিয়ে, তার মধ্যে দই নিল। এক ফোঁটাও নষ্ট হল না। খাওয়া-দাওয়া হলে, জলের ঘটি মুখে না লাগিয়ে উঁচু করে তুলে ধরে সবাই গলায় জল ঢেলে খেল।

তারপর পুকুরে গিয়ে আঁচিয়ে উঠে, চূণ খয়ের সুপারি এলাচ দারচিনি লবঙ্গ দিয়ে সাজা পান খেল। তারপর উঠোনে মাদুরে বসে খানিক তামাক খেয়ে, ছেলেকে অজস্র আশীর্বাদ করে, যে যার বাড়ি গেল। ছেলের নাম রাখা হল গোবিন্দচন্দ্র সামন্ত।

চাষীর বাড়ি কথায় কথায় ষষ্ঠী পুজো। মা-ষষ্ঠী হলেন ছোটদের

রক্ষা-কর্ত্রী ; দয়ার শরীর তাঁর ; বড় সুখী তিনি। ছোট ছেলের না থাকে শরীরে শক্তি, না থাকে বুদ্ধি ; পদে পদে তার বিপদ ঘটতে পারে। মা-ষষ্ঠী তাকে রক্ষা করেন। হিন্দু দেব-দেবতাদের মধ্যে এঁকেই ভালোবাসা সবচাইতে সহজ ; এঁর কথা আরেকটু শোনা যাক।

দেবীর নাম ষষ্ঠী, কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মূলে যে পুরুষ-প্রকৃতি, মা-ষষ্ঠী তাঁদের ষষ্ঠাংশ। ষষ্ঠীর পূজো সম্বন্ধে বেশ একটি গল্প শোনা যায়।

স্বয়ম্ভু-মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত বহু বছর নির্জনে বসে নিবিষ্টভাবে ধ্যান করেছিলেন। অবশেষে ব্রহ্মার কথায় তিনি বিয়ে করেন। অনেক দিন কেটে গেল, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কোনো সন্তান হল না দেখে, তিনি মহামুণি কশ্যপকে তাঁদের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করতে অনুরোধ করলেন। যজ্ঞ হয়ে গেল, মুনি প্রিয়ব্রতর স্ত্রীকে পবিত্র চরু খেতে দিলেন। মাখনে আতপ চাল দিয়ে এই চরু তৈরি হয়।

চরু খাবার পর প্রিয়ব্রতর স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনা হল। সময় হলে তাঁর একটি সোনার মতো উজ্জ্বল ছেলে হল। দুঃখের বিষয়, ছেলের দেহে প্রাণ ছিল না। শোকার্ত হয়ে রাজা প্রিয়ব্রত তাঁর মরা ছেলেকে চিতার ওপর শোয়ালেন। এমন সময় আকাশে দেখা গেল সূর্যের মতো আভাময়ী পরমাসুন্দরী এক দেবী। রাজা মুগ্ধ হয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

দেবী বললেন, "আমি সব মায়ের মধ্যে সেরা ; আমি কার্তিকেয়র স্ত্রী ; আমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ ; লোকে আমাকে বলে ষষ্ঠী।" এই বলে মা-ষষ্ঠী মরা ছেলে কোলে তুলে, তার মুখে ফুঁ দিলেন। অমনি ছেলে জীবন্ত হয়ে উঠল। ষষ্ঠী তখন ছেলে কোলে নিয়ে স্বর্গরাজ্যে ফিরে যাবার উপক্রম করলেন। দুঃখে, ভয়ে, আকুল হয়ে রাজা ভক্তিভরে তাঁর আরাধনা করে ছেলেটিকে প্রার্থনা করলেন।

রাজার পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী বললেন, "হে স্বয়ম্ভু মনুর পুত্র,

তুমি ত্রিভুবন-পতি। যদি আমাকে কথা দাও সারা জীবন আমার পুজো করবে, তাহলে আমি ছেলে ফিরিয়ে দেব।" প্রিয়ব্রত তখুনি কথা দিয়ে, ছেলেটিকে বুকে করে নিয়ে আনন্দিত মনে বাড়ি ফিরে এলেন।

দেবীকে কৃতজ্ঞতা জানাবার উদ্দেশ্যে রাজা ঘটা করে মা-ষষ্ঠীর পুজো করলেন। সেই থেকে ভারতবর্ষের লোকের কাছে ষষ্ঠীপুজো একটি প্রিয় অনুষ্ঠান। প্রতি মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ দিনে নিঃসন্তান মেয়েরা ষষ্ঠীপুজো করে। তাছাড়া ছেলে জন্মাবার ছয়দিন পরে আর একুশদিন পরে আর অন্নপ্রাশনের সময় ষষ্ঠীপুজো করতে হয়।

মা-ষষ্ঠীর মূর্তিটি বেশ। মোটাসোটা গিন্নিবান্নি চেহারা, হলদে রঙের গা, বেড়ালের পিঠে বসা, কোলে ছেলে। তবে সাধারণতঃ মূর্তির বদলে, প্রায় মানুষের মাথার সমান বড় একটা গোলমতো পাথরে সিঁদুর মাখিয়ে, গ্রামের সীমান্তে বটতলায় বসিয়ে মা-ষষ্ঠী বলে লোকে তার পুজো করে। এমন কি বাড়ির উঠোনে একটা বটের ডাল পুঁতেও ষষ্ঠী পুজো করা হয়।

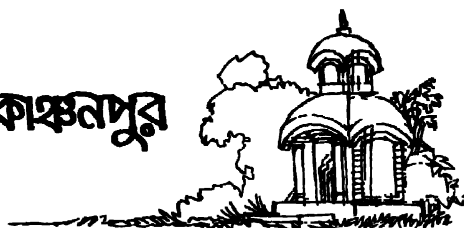
জ্যৈষ্ঠমাসে বাঙলার কোনো হিন্দু গ্রামে গেলে, একটা বড় সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। গাঁয়ের সীমান্তে কোনো বটগাছের নিচে গাঁয়ের মেয়েরা জড়ো হয়। গিন্নিরা, মায়েরা, বৌরা, আইবুড়ো মেয়েরা সবাই যে যার ভালো কাপোড়-চোপড় পরে, গা-ভরা গয়না পরে, তেল চুকচুকে মুখে, মাথায় ঘোমটা টেনে এসে জোটে। সবার হাতে নৈবেদ্যের থালা। পুরুত মশাই মন্ত্র পড়ে সবাইকে আশীর্বাদ করেন। নৈবেদ্যগুলো তাঁর প্রাপ্য। তবে যে-সব মন্দ-কপাল মেয়েদের সন্তান হয়নি, তারাও কিছু প্রসাদ নিয়ে যায়। তারা আঁচলে করে প্রসাদ নেয় আর ভাগ্যবতী সন্তানবতীরা তাদের বলে, "মা-ষষ্ঠীর দয়া হোক। আসছে বছর খালি নৈবেদ্য না, ছেলে কোলে এসে মা-ষষ্ঠীকে প্রণাম কর।" ষষ্ঠী পুজোর পর যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

গোবিন্দ জন্মাবার ছয়দিন পরে ওর-ও পুজো হয়েছিল। তির বদলে উঠোনে একটা বটের ডাল পুঁতে পুজো হল। ছেলের াপ নৈবেদ্য দিল। দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হল যেন ছেলেকে াচিয়ে রাখেন, তাহলে একুশ দিন হলে তাঁকে আরো নৈবেদ্য দেওয়া বে। তিনটি গোবরের ডেলায় তিনটি কড়ি বসিয়ে হলুদ কাপড়ে াকা দিয়ে দোর গোড়ায় রাখা হল। এটা হল মা-ষষ্ঠীর চিহ্ন; ছলের মঙ্গলের জন্য ওটি একমাস ঐভাবে থাকবে।

একুশ দিনে 'একুশ্যা' হল। সুন্দরী আঁতুড়-ঘর থেকে বেরিয়ে, ান করে, পরিষ্কার কাপড় পরে, বটতলায় সেই পাথরটির কাছে গিয়ে াকে ফলের মালা দিয়ে সাজাল, নৈবেদ্য দিল। পুরুতমশাই পুজো করলেন। কত রকম শপথ করল সুন্দরী, মা-ষষ্ঠীকে বারবার বলল, "দেখো মা, আমার ছেলেকে ভালোয় ভালোয় রেখো।" দান-সামগ্রীতে কিছু মিষ্টি ছিল। সেখানে যারা ছিল, সবাই প্রসাদ পেল। এইভাবে গোবিন্দের ষষ্ঠীপুজো হয়ে গেল।

হিন্দু দেব-দেবীদের মধ্যে ষষ্ঠী কিছু ফেল্‌না নন। তিনি যে শুধু নিঃসন্তানদের দেবতা তা নয়, ছোটো ছেলে-মেয়েদের তিনি রক্ষা করেন; সাংসারিক সুখের বিধান দেন। তাই সবাই তাঁকে ডাকে মা-ষষ্ঠী বলে আর বিশেষ করে মেয়ে বৌরা তাঁকে যেমনি ভক্তি করে, তেমনি ভালোবাসে।

সারাজীবন সুন্দরী মা-ষষ্ঠীর পুজো করে গভীর আনন্দ পেয়েছিল। তিনি যে ছেলে হবার সময় কষ্ট বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করেছেন আর সর্বদা তার ছেলেকে দেখেছেন, তাই সুন্দরীর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে থাকত।



৩

বদনের ছেলের মুখে-ভাতের কয়েক দিন পরে, একদিন সন্ধ্যা-বেলায় দরজার বাইরে থেকে ফ্যাঁশ্‌-ফেঁশে গলায় ডাক শোনা গেল, "হেই বদন, ঘরে আছ নাকি ?"

বড় ঘরের দাওয়ায় বসে হুঁকোয় ছুটো সুখ-টান দিচ্ছিল বদন। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, "কে-ও ?"

ফ্যাঁশ্‌-ফেঁশে গলায় উত্তর এল, "আমি সূর্যকান্ত।"

বদন অমনি এক লাফে দাওয়া থেকে নেমে বলতে লাগল, "আসুন, আসুন, আচার্য-মশাই। আপনার পায়ের ধূলো আজ আমার বাড়িতে পড়েছে, আজ আমাদের বড়ো ভালো দিন। ওরে গয়ারাম, আচার্য-মশাইকে আসন দে।"

জুতো খুলে রেখে আচার্য-মশাই বসলেন। জুতো বলতে চটি-জোড়া ; যারা সায়েবদের নকল করত, তারা ছাড়া প্রায় সব বাঙালীই চটি ছাড়া কিছু পায়ে দিত না। বসে বললেন, "ভালো আছ তো বদন ? শুনলাম তোমার খোকার অন্নপ্রাশনটা ভালোভাবেই চুকে গেছে। তা হবে নাই-বা কেন ? তোমার বাপ-ঠাকুরদারা গরীব হলেও সৎ-লোক ছিলেন, ধার্মিক ছিলেন, দেবতাদের ভক্তি করতেন। তাঁরা যখন জন্মেছিলেন, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র, রাশিচক্রে যে যার

মঙ্গল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই যে তোমার ছেলে—তার নাম বুঝি রেখেছ গোবিন্দ?—সে-ও ঐ রকম মঙ্গল প্রভাব নিয়েই জন্মেছে। এর একমাত্র কারণ তোমার ভক্তি-আর তোমার ছেলের পূর্ব-জন্মের ভক্তি-শ্রদ্ধা। তা কি বলছিলাম বদন, ছেলের কুষ্ঠি করাবে না?"

"করতে তো ইচ্ছে হয়ই আচার্য-মশাই, কিন্তু সবই তো জানেন। আমরা বড় গরীব, জমিদারের খাজনা বাকি, মহাজনের পাওনা বাকি। বাড়িতে যা খুদ-কুঁড়ো ছিল, তাও ছেলের মুখে ভাত দিতেই গেছে।"

"আহা, খরচের কথা বাদ দাও, বদন। সে পরে দিলেও চলবে। তুমি আমি তো অনেক দিনকার বন্ধু, তোমার কাছ থেকে আমি বেশি কিছু চাইব না।"

"আচ্ছা, একটা ভালো কুষ্ঠি করতে কত লাগে?"

"কুষ্ঠির ন্যায্য দামের কথাই যদি বল, কয়েক দিন আগে এক বেনের ছেলের কুষ্ঠি করে দিলাম। তারা আমাকে একটা মোহর দিয়েছিল।"

"মোহর! কি বলছেন, আচার্য-মশাই! ঐ বেনের সঙ্গে আমার মতো গরীব প্রজার আকাশ-পাতাল তফাৎ! একটা বামুনের সঙ্গে চাঁড়ালের যতখানি তফাৎ! গোবিন্দর কুষ্ঠি করতে কত দিতে হবে, তাই বলুন।"

"আহা, তুমি ন্যায্য দামের কথা বললে, তাই আমিও মোহরের কথা তুললাম। তোমার কাছ থেকে অত নেব কেন! দর কষাকষিও করব না। কুষ্ঠিটা আগে করে দিই, তারপর তোমার যা খুসি দিও।"

বদন বলল, "আমি গরীব মানুষ, আমি আর কত দিতে পারি? আপনার যোগ্য টাকাকড়ি দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। তবে একটা ভালো কুষ্ঠি করে দিলে, ফসল কাটার সময় দু শলি আউশ আর দু শলি আমন দেব।"

"নাঃ, তুমি বেজায় কিপ্টে হয়ে যাচ্ছ, বদন। বেশ, তাহলে ঐ চার শলি ধানের ওপর, আখ-কাটার সময় আধ মণ গুড় দিও। ভালো কুষ্ঠি করে দেব।"

"আচার্য-মশাইরা দেখছি মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন। বেশ, তাই হবে। এখনি তাহলে কাজ শুরু করে দিন। কদিন লাগবে?"

"ওহে, বদন, কুষ্ঠি তৈরি করা কি ছেলেখেলা ভেবেছ? কোন গ্রহের কোন নক্ষত্রের কোথায় অবস্থান, কেমন প্রভাব, সব দেখেশুনে জটিল হিসেবপত্র করতে হয়। এক মাসের আগে হবে না।"

"তাই হবে। এক মাস পরেই না হয় দেবেন। আমিও যেমন যেমন বলেছি ফসল-কাটার সময় আর আখ-কাটার সময় ঐ সব দেব। কুষ্ঠি কিন্তু ভালো হওয়া চাই, আচার্য-মশাই।"

"কি যে মেয়ে মানুষের মতো কথা বল, বদন! ভালো মন্দ কুষ্ঠি কি আমার হাতে? ছেলের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের ওপর সব নির্ভর করছে। সে-সময় প্রভাব যদি মঙ্গল থাকে, তো কুষ্ঠিও ভালো হবে। না থাকলে, মন্দ হবে। আকাশ আর দেবতারা যা লিখেছেন, তার বেশি কিছু তা আর আমি বলতে পারব না। তবে তুমি সৎ-লোক, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে, কুষ্ঠি যে ভালো হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"



এই সূর্যকান্ত আচার্য হলেন কাঞ্চনপুরের জ্যোতিষী মশাই। তাঁর আসল নামে কেউ তাঁর উল্লেখ করত না। সবাই তাঁকে ডাকত "ধূমকেতু"। তার কারণ হল কয়েক বছর আগে তিনি গণনা করে বলেছিলেন যে দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আর মহামারী দেখা দেবে, কারণ

আকাশে ধূমকেতু দেখা যাবে। গাঁয়ের লোকে ধূমকেতুকে বলত "আগুন-ঝাটা"।

বাঙলার সব গ্রামেই যে জ্যোতিষী থাকে এমন নয়। কাঞ্চনপুর বড় জায়গা, অনেক ধনী গৃহস্থের বাস, তাই এখানে একজন জ্যোতিষী -মশাই ছিলেন। "ধূমকেতু" শুধু কাঞ্চনপুরের নয়, আশপাশের কটা গ্রামের-ও ছেলেদের কুষ্টি তৈরি করে দিতেন—মেয়েদের সে রকম কুষ্ঠি করা হত না; বড় জোর এক টুকরো কাগজে তাদের জন্মের সময় আর গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান লিখে রাখা হত। তিনি শুধু কুষ্ঠি তৈরি করতেন না, বিয়ের সময়, কিম্বা কেউ যাত্রা করবার, বা অন্য কোনো গুরুত্বপুর্ণ কাজের আগে, শুভ দিন, লগ্ন, ক্ষণ সব গুণে দিতেন। এতে তাঁর মন্দ লাভ হত না। কারণ হিন্দুরা দিন-ক্ষণ না জেনে কোনো কাজ করে না।

তাছাড়া নতুন বছর শুরু হলে, তিনি গ্রামের প্রত্যেকটি নিষ্ঠাবান হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে নতুন পঞ্জিকা পাঠ করে আসতেন। তার মানে নয় যে শুধু পাঁজি পড়ে দিতেন, তার সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন বছরের জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত প্রধান ঘটনাগুলি ও তাদের ফলাফলের ব্যাখ্যানাও দিতেন। সেই বিষয় দু চারটে প্রাচীন কাহিনীও বলতেন। যারা যারা পঞ্জিকা পড়া শুনতে আসত, তাদের সকলকেই জ্যোতিষী মশাইকে যা হয় কিছু প্রণামী দিতে হত।

কোষ্ঠি তৈরি আর পঞ্জিকা পড়া ছাড়া ধূমকেতুর আরো কাজ ছিল। তিনি গণনা করতেন, অর্থাৎ লোকের ভাগ্য বলে দিতেন। সংখ্যা দিয়ে এমন চমৎকার ভবিষ্যৎ-গণনা করতেন যে লোকে আশ্চর্য হয়ে যেত। এতে তাঁর ঘরে অনেক পয়সা আসত।

গৃহস্থের গোরু হারালে, সোনা রূপোর বালা কি কানের গয়না চুরি গেলে, কাঁসা কি মুঙ্গেরের পাথরের থালা গেলে, ধূমকেতুকে ডাকা হত। তিনি তাঁর ঘরের মেঝের ওপর এক টুকরো খড়ি দিয়ে

এমন সব জটিল আঁকিবুঁকি কাটতেন যে বোঝে কার সাধ্য। কিন্তু তাই দেখেই তিনি নির্ভুল ভাবে হারানো জিনিসের হদিশ দিতেন। কাঞ্চনপুরের সকলে, তা সে বড়লোক-ই হক, কি গরীব-ই হক, তার হারানো জিনিসের পাত্তা পাবার আশায় তাঁর ঘরে ভিড় করত। সবাই জানতে চাইত তাদের গয়না কোথায় উধাও হল, কিম্বা গোরু কোথায় ভাগল।

মাঝে মাঝে তাঁর গণনা ভুল হলেও, তাঁর ওপর সকলের অগাধ বিশ্বাস ছিল, কারণ কখনো কখনো গণনা ঠিক-ও হত। মানুষের মনের বিশ্বাস এমনই জিনিস যে তারা ভুলগুলো ভুলে, শুধু ঠিক গণনাগুলোর কথা মনে রাখত, তবে একবারের ভুলের কথা লোকের অনেক দিন মনে ছিল, যদিও তাতে তাঁর গণনার খ্যাতির কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয়নি।

হয়েছিল কি, কাঞ্চনপুর থেকে কয়েক মাইল দূরের এক গ্রাম থেকে, ভদ্রলোকের মতো কাপড়চোপড় পরা দুজন লোক এসেছিল, তাদের একজনের হারানো গোরুর খোঁজ করতে। সাধারণতঃ হারানো গোরুর খোঁজে শুধু চাষীরাই আসত। এদের দেখে ধূমকেতুর একটু ভুল হয়ে গেল। তাদের চেহারা দেখে তিনি একবারও সন্দেহ করলেন না যে ওদের গোরু হারিয়েছে, ভাবলেন নিশ্চয় কোনো সোনার জিনিস গেছে, গলার হার, কি হীরের আংটি, কি ঐ রকম কিছু।

তাঁর যেমন অভ্যাস, ঘরের মেঝেতে এক রাশি দাগ কাটলেন, যার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা গেল না। তারপর লোকদুটির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে বললেন, "আপনাদের একটা জিনিস হারিয়েছে, দেখি, একটা জিনিস গেছে। ধাতুর তৈরি—হ্যাঁ, ধাতুর জিনিস। সোনা-সোনা-সোনা। হীরে-হীরে-হীরে। সোনার সঙ্গে হীরে। হ্যাঁ, একটা হীরের আংটি গেছে। সেটিকে পাবেন ন্যাকড়ায় মোড়া অবস্থায় আপনাদের বিয়ের ঘরের চালে গোঁজা।"

তাই শুনে লোক দুটি হো-হো করে হেসে বলল তাদের একজনের সব চাইতে ভালো গোরুটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এতটুকু না দমে, সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতু বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা বলেছেন। এখানে দেখছি অন্যমনস্ক ভাবে একটা ভুল সংখ্যা লিখে ফেলেছি! গোরুই হারিয়েছে। তাকে আপনাদের ঝিয়ের ঘরে পাবেন।"

এই রকম মানুষ ছিলেন জ্যোতিষী মশাই। তিনিই এখন আমাদের গল্পের নায়ক গোবিন্দের কোষ্ঠি তৈরি করবেন। যেমন কথা দিয়েছিলেন, এক মাস বাদে ধূমকেতু কোষ্ঠি এনে দিলেন। গোটানো খানিকটা হলদে কাগজ, খুলে মাপলে দশ হাত। পাতায় পাতায় নক্সা, রাশিচক্র; আগাগোড়া সংস্কৃতে লেখা। জাতকের ভাগ্য গোণা হয়েছে ১০০ বছর বয়স পর্যন্ত। প্রতি বছরের ঘটনা খুব সংক্ষেপে, দুচার কথায় দেওয়া। তবে অনেক জায়গায় তিনটি কথা চোখে পড়ে, যেমন 'ধন ধান্য বৃদ্ধি'। অর্থাৎ ধান শস্য টাকা-কড়ি বাড়বে। ফাঁড়াও আছে কয়েকটা। সব চাইতে গুরুতরটি গোবিন্দর ত্রিশ বছর বয়সে। সে বছর শনির প্রভাব এত জোরালো যে গোবিন্দ ফাঁড়াটা কাটিয়ে উঠবে কি না সন্দেহ।

অতিশয় ভক্তির সঙ্গে কোষ্ঠিটি হাতে নিয়ে, বদন সেটিকে বড় ঘরের কোণে রাখা কাঁঠাল কাঠের তোরঙ্গে বাড়ির আর সব দামী জিনিসের সঙ্গে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখল। বলা বাহুল্য ফাঁড়াগুলোর কথা জ্যোতিষী মশাই বদনকে বললেন না। শুধু বললেন মোটের ওপর গোবিন্দের জীবনটা এক নাগাড়ে সদা বাড়ন্ত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটবে। সময় মতো ধূমকেতু বদনের কথা মতো চার শোলি ধান আর আধ মণ গুড় পেয়েছিল।

এর পরের পাঁচ বছরে গোবিন্দর জীবনে সে-রকম কিছু ঘটেনি। তবে একবার কাছে-পিঠে কেউ ছিল না, উঠোনে হামা দিতে দিতে গোবিন্দ পুকুরে পড়ে গেছিল। ভাগ্যিস সেই সময় পুকুর পাড়ে বসে

আতুরী কাঁসা পাথরের থালা ঘটি মাজছিল। ছেলেটাকে জলে পড়তে দেখে সে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। সুখের বিষয়, পুকুরের ঐ দিকটাতে জল কম থাকাতে, জলে নেমে আতুরীই তাকে তুলে আনতে পেরেছিল এবং তার কোনো ক্ষতি হয়নি দেখে নিশ্চিন্ত হল।

এই ভাবে গোবিন্দ ক্রমে বড় হতে লাগল, সারা উঠোনে হামা দিয়ে ধুলা-কাদা মেখে, ভূত হয়ে। অনেক সময়ই মালতী কাছে থাকত। হাত ধরে দাঁড় করিয়ে ওকে হাঁটাতে শেখাত, সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটত, 'চলি চলি পা পা।'

গোবিন্দর যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বদনের সঙ্গে তার মায়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল। এখানে বলে রাখা ভালো যে বাংলার প্রায় সব হিন্দু বাড়িতেই ছেলেদের লেখা-পড়া শেখা শুরু হয়, পাঁচ পূর্ণ হয়ে ছয়ে পড়লে। তার আগে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পুজো করে, দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয় যেন তাঁর এই তরুণ উপাসকটি তাঁর সেরা প্রভাব লাভ করে। একে বলা হয় হাতে-খড়ি। এক টুকরো খড়ি দিয়ে ছেলে সেদিন ঘরের মেঝের ওপর অ অক্ষর লিখে, তার লেখাপড়া শুরু করে।



একটা কথা কিছুদিন থেকেই বদন মনে মনে নাড়াচাড়া করছিল। সেটি হল গোবিন্দকে লেখাপড়া শেখানো হবে কি না। লেখাপড়া বলতে বেশি কিছু নয়, বাংলা লিখতে, পড়তে আর আঁক কষতে। নিজে লিখতে পড়তে শেখেনি—বাস্তবিকই তার কাছে যাকে বলে ক-অক্ষর গো-মাংস—এই কারণে অনেক সময় নিজের অক্ষমতা নিয়ে

সে বড় ক্ষোভ বোধ করেছে। এখন ছেলে যদি লেখাপড়া শেখে, তার জীবনটা হয়তো বাপের চাইতে অনেক সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটবে। সে হয়তো ধূর্ত গোমস্তা আর অত্যাচারী জমিদারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারবে। বদন তার মাকে সর্বদা বড় ভক্তি করত; তার সঙ্গে পরামর্শ না করে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব। মায়ের ভারি সাংসারিক বুদ্ধি, একটু সুযোগ পেলেই তার কাছে কথাটা পাড়তে হবে।

কাজেই এর পর একদিন বিকেলের দিকে মাঠে বেশি কাজ নেই দেখে, বদন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এল। গয়ারাম রইল গোরু নিয়ে আর কালামানিক ধানক্ষেতে নিড়েন দিতে লাগল। মা রান্না-ঘরের দাওয়ায় চরকায় সুতো কাটছিল। পুকুরে গিয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়ে, বদন গিয়ে মায়ের কাছে চরকার পাশে বসল।

বিলেতে সেকালে আইবুড়ো মেয়েরাই চরকায় সুতো কাটত। বাংলায় ঠিক তার উল্টোটি হত। যাদের বয়স কম তারা আরো বেশি সচল বলে, সংসারের অন্য কাজ তারাই করত, চরকা কাটত বুড়িরা। এই নিয়মটাকেই ভালো মনে হয়। সে যাই হক আলঙ্গা চরকা কাটছিল; বদন তার কাছে বসে তামাক খেতে লাগল। কিছুক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। দুজনেই নিজেদের তৈরি মধুর সুরে মশগুল: একজনের হুঁকো বলে গুড়ুক-গুড়ুক গুড়ুক, অন্যজনের চরকা বলে গুণ-গুণ-গুণ। এমন মধুর সুর দেবতাদের শোনার যোগ্য। শেষটা বদন-ই রসভঙ্গ করে বলল,

"মা, কিছুদিন থেকেই মনে করছি, একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করব।"

আলঙ্গা বলল, "কি বিষয়, বাবা? কিছু হয়েছে নাকি? তোমার কি কোনো দুর্ভাবনার কারণ ঘটেছে? আমাকে খুলে বল, বাবা।"

বদন বলল, "না, না, সে রকম কিছু না। এই গোবিনের কথা বলছিলাম।"

আলঙ্গা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "গোবিনের কি কথা বদন? ওর কি শরীর ভালো নেই? কি হয়েছে ওর?"

বদন তখন ব্যাপারটা খুলেই বলল, "দেখ মা, গোবিন্দের হাতে-খড়ি দিলে হয় না? আমি লিখতে পড়তে পারি না বলে ভারি অসুবিধা হয়। একটা পাতা পড়তে পারি না, কবুলিয়ৎ লিখতে পারি না। নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে পারি না। নামের বদলে ঢ্যাঁড়া কেটে দিতে হয়। চোখ থাকতে আমি দেখতে পাই না। যত সব জোচ্চোর গোমস্তা আর অত্যাচারী জমিদারের খপ্পরে পড়ি! তোমার কি মনে হয় না গোবিন্দ লেখাপড়া শিখলে ভালো হয়?"

আলঙ্গা ব্যাকুল হয়ে উঠল, "ও বাবা বদন, লেখাপড়ার নাম-ও কর না। আমার ইচ্ছা ছিল না, তবু তোমার বাবা তোমার দাদাকে পাঠশালায় পাঠিয়েছিল। তাতে কি লাভ হল? এক বছর পাঠশালে যেতে না যেতেই দেবতারা তাকে তুলে নিলেন। আমাদের মতো গরীব মানুষদের কি লেখাপড়া সাজে? আমার বড় ভয় হয় গোবিনকে পাঠশালায় দিলে, তাকেও তাঁরা তুলে নেবেন। আহা, যেটের বাছার চিরকাল পরমায়ু হক।"

বদন কিন্তু কথাটা মানল না। "কি যে বল, মা। লেখাপড়া শেখার জন্য ছেলে মরেছে, এমন উদ্ভট কথা কে কবে শুনেছে? তাহলে বামুন কায়েতদের ছেলেরা যে লেখাপড়া শেখে, তারা সবাই মরে যেত না?"

আলঙ্গা বলল, "বামুন কায়েতের ছেলেরা লেখাপড়া শিখলে দেবতারা রাগ করবেন কেন? ঐ তো ওদের কাজ। আমাদের কাজ হল জমি চাষ করা। আমাদের যদি এতই বাড় বাড়ে যে লেখাপড়া শিখতে চাই, দেবতারা রাগ করবেন না তো কি করবেন?"

বদন মায়ের কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। "আচ্ছা মা, তুমি

কি জান না যে আমাদের মতো আগুরীদের মধ্যেও কেউ কেউ লিখতে পড়তে পারে? নটবর সামন্ত কি লেখাপড়া জানে না? মধু সিংহ কি মুহুরীর কাজ করে না? দেবতারা তাদের মেরে ফেলেননি কেন?"

আলঙ্গা বলল, "অন্যদের বেলায় যাই হক, আমাদের বংশের ধাতে লেখাপড়া সহ্য হয় না। তা না হলে পাঠশালে ভর্তি হবার পরেই তোমার দাদা মরবে কেন? সেই কথাটা বল।"

বদনও নাছোড়-বান্দা। "দেখ মা, মরা বাঁচা হল যার যেমন ভাগ্য। বিধাতা পুরুষ যার কপালে যা লিখেছেন, তা হবেই। আমার দাদার কপালে তিনি সাত বছরে মরণ লিখে রেখেছিলেন, তাই সে বাচল না। তাকে বাবা যদি পাঠশালে না-ও পাঠাতেন, তবু সে বাঁচত না। যতখানি চালের মাপ নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছিল, সেটি ফুরিয়ে গেল। কাজেই সে-ও মরে গেল। সব-ই ভাগ্য মা, সবই ভাগ্য।"

আলঙ্গা তবু ছাড়তে চায় না। "সে-কথা সত্যি বাবা, কপালটাই আসল। তা হলে কপালের সঙ্গে লড়তে চাও কেন? আমরা সর্বদা চাষ করে খাই, সারা জীবন আমাদের তাই-ই করতে হবে। তোমার বাপ ঠাকুরদারা কেউ লেখাপড়া শিখেছিলেন? তাঁরা যা করেননি, তোমার ছেলেকে দিয়ে তাই করাতে যাও কেন?"

বদন বলল, "তাদের কালটা ছিল জপ-তপ ধর্ম-কর্মের। তখন ছিল সত্য যুগ। কেউ কাউকে ঠকাত না, কারো ওপর উৎপীড়ন করত না। তাই লেখাপড়ার সেরকম দরকারও ছিল না। কিন্তু এখনকার লোক বড় অসৎ, দেবতা মানুষ কাউকে তারা ভয় করে না। এখন লিখতে পড়তে জানা দরকার, যাতে কেউ আমাদের ওপর অত্যাচার করতে না পারে।"

আলঙ্গা বলল, "তোমরা পুরুষমানুষরা মেলা কথা বল আর হাজার রকম যুক্তি দেখাও। পুরুষদের কথার ওপর মেয়েমানুষ আর

কি বলতে পারে ? যা ভালো বোঝ তাই কর, বাবা। আমার খালি ভয় হয়, শেষটা না তোমার দাদার মতো ওকেও দেবতারা কেড়ে নেন। লেখাপড়া শিখে মরে যাওয়ার চেয়ে গোবিন বেচারি বরং গোরুর রাখালি করে থাক।"

বদন ব্যস্ত হয়ে উঠল, "মাগো, বারবার বলছি মরা বাঁচা দেবতাদের হাতে। গোবিন্দর কপালে যদি লেখা থাকে অমুক দিনে তার মৃত্যু হবে—চিরকাল বেঁচে থাক বাছা—তবে তা হবেই হবে। পাঠশালায় গেল কি না গেল, তার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই মা। কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না। রামরূপ সরকারের পাঠশালায় গোবিনকে দেব ভেবেছি, তুমি আপত্তি কর না মা। রামরূপ জমিদারির হিসেব রাখার কাজ খুব ভালো বোঝে, ওর পাঠশালাই সবচেয়ে ভালো। কি বল, মা ?"

আলঙ্গা তখন বলল, "তাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় বাবা, তাই পাঠিও। গোপীনাথ ওকে রক্ষা করবেন। কিন্তু পাঠশালে যেতে হলে ক'দিন অপেক্ষা করতে হয়। আরো কিছু সুতো কাটি, ওর একটা ধুতি বোনা হক।"

মায়ের অনুমতি পেয়ে খুশি হয়ে, বদন ছুদিন অপেক্ষা করতে রাজি হয়ে গেল।

এর আগে বলা হয়েছে যে গোবিন্দের জীবনের প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে সে-রকম কিছুই ঘটে নি। কথাটা ঠিক নয়। আলঙ্গার কাছে পরে শোনা গেছে যে গোবিন্দের যখন পাঁচ শেষ হয়ে এসেছিল, ছয়ে পড়েছিল, তখন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। আলঙ্গা পরে বলেছিল যে সেদিনটা ছিল শনিবার ; তবে কোন মাস, কোন বছর, তা বলতে পারল না।

সে যাই হক, সেই শনিবার দিন একটা অদ্ভুত কাণ্ড হয়েছিল। মায়ের কাছে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল গোবিন্দ, হঠাৎ মাটিতে আছড়ে পড়ে অদ্ভুত ভাবে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। মুখ দিয়ে ফেনা

উঠতে লাগল, নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে লাগল; কেমন যেন বিশ্রী রকম ক্ষেপে উঠল। সুন্দরীর চিৎকার শুনে আলঙ্গা আর আহ্লরী দৌড়ে এল। গোবিন্দর ঐ রকম হাত-পা ছোঁড়া দেখে, সঙ্গে সঙ্গে আলঙ্গা তার কারণটা ঠাওরাল। কেঁদে উঠে আলঙ্গা বলল, "ও মাগো! আমার নাতিকে পেঁচোয় পেয়েছে!"

পেঁচোয় পেয়েছে? পেঁচো আবার কে? পেঁচো মানে পঞ্চানন, শিবের আরেক রূপ। বিকট চেহারা তার। পাঁচটা মাথা, পনেরোটা চোখ। তবে বোধ হয় লোকে ভয় পাবে বলে এ মূর্তি সাধারণতঃ গড়া হত না। পেঁচো হলেন একটা পাথর, তাতে লাল রঙ মাখানো: তিনি বটতলায় কি অশ্বত্থ গাছের নিচে থাকেন। দক্ষিণ বাংলায় এমন কোনো গ্রাম আছে কি না সন্দেহ, যেখানে একটি বা আরো বেশি গাছতলায় পঞ্চাননের পুজো হয় না। তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে হিন্দু মায়েরা এই পাঁচমুখো দেবতাকে যতটা ভয় করত, তেমন আর কাকেও নয়।



পঞ্চাননের যে কোনো গুণ নেই এমন নয়। মাঝে মাঝে খুসি হয়ে বন্ধ্যা মেয়েদের তিনি সন্তান দেন। কিন্তু সবাই জানত তিনি বেজায় রাগী আর কথায় কথায় শাপ দেন। এমনি খিটখিটে তাঁর স্বভাব যে গাছতলায় খেলা করতে করতে কোনো ছোট ছেলেমেয়ে যদি ভুলে লাল রঙ করা পাথরটা ছুঁয়ে ফেলে, অমনি তাকে ভূতে পায় আর সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা খিঁচতে থাকে।

আলঙ্গার দৃঢ় বিশ্বাস গোবিন্দ সেদিন কোনো সময় পঞ্চানন-তলায় গিয়ে অন্য রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খেলতে খেলতে হয় দেবতাকে ছুঁয়ে ফেলেছিল, নয় কোনো রকমে অসম্মান করেছিল। তার সাজা দেবার জন্য ছেলের ওপর তাঁর ভর হয়েছে।

ছেলেটা যন্ত্রণার চোটে মাটিতে গড়াচ্ছিল। আলঙ্গা ডেকে বলল, "বাবা, তুমি কে? আমার গোবিন্দকে কেন ভর করেছ? তুমি কি ভূত না ভগবান?"

অমনি গোবিন্দ, অর্থাৎ ভূতটা বলল, "আমি হলাম পঞ্চানন। তোমাদের ছেলে আমার গায়ে পা ঠেকিয়েছে। আমি তার ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষব।"

তাই শুনে মেয়েরা এমনি কান্নাকাটি লাগাল যে পাড়ার অন্য সব বাড়ি থেকে বৌরা আর ছেলেপুলেরা ছুটে এল। অন্যদের চেয়ে আলঙ্গার উপস্থিত বুদ্ধি বেশি ছিল। সে তখন দেবতার উদ্দেশে বলতে লাগল, "হেই ঠাকুর! হে বাবা পঞ্চানন! ও ছোট ছেলে, ও কি কিছু বোঝে! ওকে ক্ষমা কর! ওকে ছেড়ে চলে যাও! বোকা, বুদ্ধি নেই; কি ভালো কি মন্দ কিছুই জানে না। হেই ঠাকুর! আমার গোবিনকে ক্ষমা কর! আমরা তোমার পুজো দেব!"

এর পর গোবিন্দের হাত-পা আরো জোরে খিঁচতে লাগল, মেয়েরা আরো জোরে কেঁদে উঠল। ছেলের বাপ কাকারা মাঠে কাজ করছিল, তাদের খবর পাঠানো হল। তারাও অমনি হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এল। এসে দেখে ছেলের মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে, সে নিজের চুল ছিঁড়ছে। এখন কি করা যায়? একজন বামনী সেখানে এসেছিলেন। তিনি বললেন এর একমাত্র উপায় হল পঞ্চাননের পুজো দেওয়া। তখুনি কুলপুরোহিত রামধন মিশ্রকে ডেকে পাঠানো হল। তিনি এসেই বললেন বামনী ঠিক বলেছে, এখনি পঞ্চাননের পুজো দিতে হবে।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে পূজোর আয়োজন করা হল। তারপর গোবিন্দকে নিয়ে গ্রামের সীমান্তের বটতলায় যাওয়া হল। সেখানেই সেই তেল মাখানো লাল রঙ করা পাথরটি ছিল। ওখানে পৌঁছেই গোবিন্দর আরেকবার ফিট্ হল। মিশ্র পূজো শুরু করলেন, মন্ত্র পড়া হল ফুল ফল, মিষ্টি নৈবেদ্য দেওয়া হল। গিন্নীরা কান ফাটানো চিৎকার করে দেবতাকে বলতে লাগল, "দয়া কর! দয়া কর! ছেলেটাকে ছেড়ে যাও!"

গোবিন্দকে দিয়ে বারবার পাথরটাকে প্রণাম করানো হল, তার সামনে মাটিতে মাথা খোঁড়ানো হল। দেবতাকে কত অনুনয়-বিনয় করা হল, খোসামোদ করা হল; কতবার বলা হল ভবিষ্যতে নৈবেদ্য দেওয়া হবে, পূজো দেওয়া হবে। এই রকম করতে করতে মনে হল ফল দিয়েছে। গোবিন্দর ফিট্ সেরে গেল। গিন্নীরা তখন দেবতাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি চলে গেল। আলঙ্গার কাছে শোনা গেছে এর পর গোবিন্দর আর কখনো ফিট্ হয় নি।

গোবিন্দর লেখাপড়া শেখা নিয়ে বদনের আর তার মায়ের সে দিনের সেই কথাবর্তার পর, আলঙ্গা যেন আরো বেশি করে সুতো কাটতে আরম্ভ করল। সারা সকাল কেটে যেত আদুরী সুন্দরীর সঙ্গে রাঁধাবাড়া, ঘরকন্নার কাজে। তারপর সারা দুপুর আলঙ্গা সুতো কাটত। ঘর কন্নার কাজ বলতে বোধ হয় আরো কিছু বলা দরকার।

কাক ডাকার সঙ্গে বদনের বাড়ির মেয়েরা উঠত। বিলেতে লোকে বলে মোরগ ডাকার সঙ্গে ওঠা। এ-দেশের হিন্দুরা তো আর মোরগ মুরগি ছুঁত না, বা পুষত না; কাজেই তারা কাক ডাকার সঙ্গে উঠত। উঠেই তারা পুকুরে যেত, ঐ পুকুরের জলেই সংসারের সব কাজ হত। নিজেরা হাত-মুখ ধুয়ে, গোবর দিয়ে গোলা বানিয়ে, খোলা উঠোনটাতে গোবর-ছড়া দিয়ে তালপাতার ঝাঁটা দিয়ে সাফ

করে ফেলত। ঘর আর ঘরের দাওয়া সাফ হত অন্যরকম করে। ঘর, ঘরের দাওয়া সব আগাগোড়া মাটি দিয়ে তৈরি। কোথাও একটা ইট, কি পাথর, কি কাঠের তক্তা ব্যবহার হয়নি। ঘরদোর রোজ নিকোতে হত। তার মানে একটু মাটি দিয়ে, গোবর দিয়ে গোলা বানিয়ে, ন্যাতায় করে সমস্তটাতে বুলোনো হত। একটুও বাদ যেত না। একেই বলে নিকোনো। তারপর ঘর আপনি শুকিয়ে যেত।

বিদেশীরা ভাবতে পারে এরকম করলে ঘরদোর নিশ্চয় আরো নোংরা হয়ে থাকে। কিন্তু একেবারেই তা হয় না। ঘরের আর দাওয়ার মেঝের এতে আরো উন্নতি হয়। মোলায়েম, চক্‌চক্ করে; কোথাও কোনো ফাটল-ফোকর দেখা যায় না। আর গোবরের বদ্ গন্ধের কথাই যদি বলা যায়, সে-সব কিছুই থাকে না। গন্ধটা বরং বেশ ভালোই লাগে। হিন্দুরা বিশ্বাস করে গোবর ভারি পবিত্র জিনিস কোথাও গোবর লাগালে সেটা শুদ্ধ হয়ে যায়। কেন এরকম বিশ্বাস, তা বলা মুশকিল। গোবরের জন্য কি স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়?



বাড়ির মেয়েদের গোবরের কাজ তখনো শেষ হয়নি। উঠোনের কোণে মস্ত এক ঢিপি গোবর। খানিকটা গোয়াল থেকে ঝেঁটিয়ে বের করা হয়েছিল আর খানিকটা আগের দিন গয়ারাম গোরু চরাতে গিয়ে, মাঠ থেকে ঝুড়ি করে তুলে এনেছিল। কিছু নিজের গোরুর, কিছু অন্য লোকের গোরুর গোবর। গেরস্থ বাড়িতে গোবর বড় মূল্যবান জিনিস।

আলঙ্গা, সুন্দরী, আদুরী এবার সেই গোবরের ঢিপি নিয়ে পড়ল। প্রথমে গোবরটাতে একটু জল ঢেলে মেখে নিল; তারপর তিনটি ঝোড়াতে করে, বাড়ির দেয়ালের যেখানে যেখানে রোদ পড়ত সেখানেই হাতে চাপটি করে ঘুঁটে দেওয়া হল। শুকিয়ে তুললে এই ঘুঁটে বড় কাজের জিনিস। উনুন ধরানোর কাজে আর কোনো জ্বালানি লাগে না। রান্নার জন্মে, গোয়াল-ঘরে ধোঁয়া দেবার জন্মে, এই ঘুঁটেতেই সম্বৎসর চলে যেত।

বাঙালী চাষীদের কাছে গাই-বলদের মতো জানোয়ার নেই। বাড়ির ছেলেমেয়েরা জন্মে অবধি গোরুর দুধ খায়। যে ধান চাষীর পরিবারের প্রধান খাদ্য, সে-ধান ফলাবার জন্ম বলদ না হলে চলে না। ধান পাকলে ঐ গোরুই সেটি বয়ে ঘরে এনে তুলে দেয়। গরীব চাষীর জ্বালানিও যোগায় তার গোরু। হিন্দু দেবতা আর বাঙালী বাবুদের প্রিয় ঘি-ও এই গোরুর দয়াতেই পাওয়া যায়। কাজেই হিন্দুরা যে মা-ভগবতী বলে গোরুকে ভক্তি করে, পুজো করে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

বাড়ি সাফ-সুফ হলে তবে মেয়েরা অন্য কাজে হাত দেয়। তার মধ্যে আছে ঢেঁকিতে কোটার আগে ধান সেদ্ধ করে, রোদে শুকুনো। পুকুর পাড়ে গিয়ে বাড়ির লোহার, পেতলের পাথরের সমস্ত বাসন-কোসন মেজে তোলা। তারপর স্নান। তারপর রান্নাবান্নার বড় কাজটি। আলঙ্গাই এ কাজের বেশি দায়িত্ব নিত। তারপর দরকার মতো মাঠে ভাত পাঠানো, নিজেদের খাওয়া-দাওয়া। সকলের খাওয়া হলে আলঙ্গা সারাদিনের মধ্যে ঐ একটিবার খেতে বসত। হিন্দু বিধবাদের তাই নিয়ম ছিল। তাতে আলঙ্গার খুব যে ক্ষতি হত, তা কিন্তু মনে হত না।

আলঙ্গার খেতে খেতে বেলা দুটো তিনটে বাজত। তারপর সে চরকা নিয়ে বসত। অনেক দিনের অভ্যাসের ফলে সুতো কাটায় আলঙ্গা ভারি দক্ষ হয়ে উঠেছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই গোবিন্দের

জন্য একটা দেড় হাত বহরের পাঁচ হাতি ধুতির যোগ্য সুতো কেটে ফেলল। তাঁত চালাতে সে জানত না, কাজেই গাঁয়ের উত্তর দিকে যে তাঁতী থাকত, তাকে ধুতি বুনতে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য তাকে তার ন্যায্য মজুরী দেওয়া হল।

গোবিন্দর প্রথম দিন পাঠশালায় যাওয়াটা শুধু গোবিন্দের কাছে নয়, ওদের বাড়ির সকলের কাছেই একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। মধ্য বিত্তদের আর বড়লোকদের ছেলেদের প্রথম ইস্কুলে ভরতি করার আগে কিছু পুজোটুজোর নিয়ম ছিল, তবে গরীবরা সে সব করত না। পুরুৎ না ডাকলেও, ব্যাপারটাতে বাড়ি শুদ্ধ সকলের ভারি উৎসাহ। প্রথম কথা হল যে জন্মে অবধি গোবিন্দের গায়ে একটা ত্যানা পর্যন্ত ওঠেনি। পাঁচ বছর বয়স হল, তবু এতদিন তার ন্যাংটো হয়েই দিব্যি কেটেছে। পাঠশালায় যাবার দিন ঠাকুমা ওর কোমরে ধুতিটি বেঁধে পরিয়ে দিল। শরীরের বাকিটা অবিশ্যি খালিই রইল। কাপড় পরে খুদে মানুষটি ঠাকুমাকে, মা বাবাকে, কাকাদের, কাকীকে প্রণাম করল। সবাই ওকে আশীর্বাদ করল। পাঠশালায় গিয়ে প্রথম দিনই লিখতে শুরু করার কথা, তাই বদন করল কি, গোবিন্দের ধুতির খোঁটে এক টুকরো রাম-খড়ি বেঁধে দিল। আর আলঙ্গার তো সদাই চোখ থাকত কিসে বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের একটু সুবিধা, একটু আরাম হয়। সে গোবিন্দের কোঁচড়ে এমন ভাবে খানিকটা মুড়ি বেঁধে দিল যে খিদে পেলেই গোবিন্দ তাতে হাত পুরে মুড়ি বের করে খেতে পারে। এই রকম তোড়জোড় করে আমাদের খুদে যোদ্ধা বিদ্যার রাজ্য জয় করতে চললেন।



গোবিন্দর হাত ধরে, বদন তিনবার শ্রী-হরির নাম করে পাঠশালার পথ ধরল।



৪

আগেই বলা হয়েছে গাঁয়ের মধ্যিখানে মুখোমুখি দুই শিব-মন্দির। তার একটির সামনে সারি সারি থাম। সেইখানে গাঁয়ের পাঠশালা বসত। ঐ পাঠশালায় বামুন গুরুমশায়ের কাছে গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ আর বড়লোক বেনেদের ছেলেরা লেখাপড়া শিখত। বর্ধমানে গুরুমশাইকে সবাই ডাকত 'মশাই। এই গুরুমশায়ের বাপ-ঠাকুরদারাও চোদ্দ পুরুষ ধরে এখানে বসে গাঁয়ের ছেলেদের লেখা-পড়া শিখিয়েছেন। তবে কাঞ্চনপুরে আরেকটা পাঠশালাও ছিল। সেখানকার গুরুমশাইয়ের ততটা খাতির ছিল না। তিনি বামুন ছিলেন না, কায়স্থের ছেলে। কাজেই অন্য গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় ছিল তিনগুণ ছাত্র। সেখানে হয়তো রোজ ষাট-সত্তরজন পড়ুয়া দেখা যেত; এ পাঠশালায় জনা কুড়ির বেশি বড় একটা দেখা যেত না। তাই বলে বামুন পণ্ডিতটি এঁর চাইতে কিছু বেশি ভালো শিক্ষক ছিলেন না।

বামুন পণ্ডিত 'সংক্ষিপ্ত সার' বলে সংস্কৃত ব্যাকরণের খানিকটা পড়েছিলেন। কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক ঝাড়তেন; কিন্তু বাংলা লিখতে গেলে হাস্যকর সব ভুল করতেন। অন্য শিক্ষকটি সংস্কৃত বিদ্যা নিয়ে কখনো বড়াই করতেন না; কিন্তু সবাই মানত যে ভয়ঙ্কর ভালো অঙ্ক জানতেন এবং জমিদারির হিসাব-পত্র রাখায় দক্ষ ছিলেন। এ বিষয়ে বামুন-পণ্ডিত কিছুই জানতেন না। কায়স্থ শিক্ষকের

পাঠশালার পোড়োদের বেশির ভাগই যদিও চাষীদের আর গরীবদের ছেলে, তবু তারই মধ্যে কয়েকটি বামুনের ছেলেও ছিল। তাদের মা-বাবাদের বিশেষ ইচ্ছা যে ছেলেরা আঁক কষতে, জমিদারির হিসাব রাখতে শিখুক। দুটি কারণে এই পাঠশালাটাই বদনের পছন্দ।

প্রথম কারণ হল বামুন পণ্ডিতের পাঠশালায় যত বড়লোকদের ছেলেরা যেত। বদনের ইচ্ছা তার ছেলে তাদের সমান কিম্বা সামান্য ভালো অবস্থার ছেলেদের সঙ্গে মিশুক।

কাজেই গোবিন্দকে নিয়ে বদন কায়স্থ শিক্ষক রামরূপ সরকারের বাড়িতে গেল। তাঁর পাঠশালা বসত তাঁর বাড়ির উঠোনে, বেশ ছায়া ছায়া একটা কাঁঠাল গাছের তলায়। বর্ষাকালে পাঠশালা সেখান থেকে উঠে তাঁর দাওয়ায় বসত।

রামরূপ একটা মাদুরে বসেছিলেন; সামনে গুটি বারো ছাত্র কেউ কাগজে, কেউ কলাপাতায়, কেউ তালপাতায় লিখতে ব্যস্ত ছিল। রামরূপ বললেন, "কি হে বদন, কি খবর? এখানে কি মনে করে?"

বদন বিনীত ভাবে বলল, "ছেলেটাকে নিয়ে এলাম, মশাই, যদি শিখিয়ে পড়িয়ে একটু মানুষ করে দিতে পারেন।" রামরূপ খুসি হলেন। "বাঃ, খুব ভালো, বদন। তুমি নিজে লেখাপড়া শেখনি, তবু ছেলেকে শেখাতে চাও। ঠিক কাজ করছ। চাণক্য বলেন বিদ্যারত্ন মহাধনম। বিদ্যাই মহা ধন।"

বদন বলল, "ঠিক কথাই বলেছেন, মশাই। যে লিখতে পড়তে জানে না সে সত্যিই গরীব—একেবারে অন্ধ। আমার দুটো চোখ থাকতেও, আমি দেখতে পাই না। এক টুকরো কাগজে কি লেখা আছে তাও পড়তে পারি না।

মশাই বললেন, "বস বদন, তামুক খাও। ওরে মোধো! তামাক সাজ।"

বদন মাটির ওপর বসল; গোবিন্দ দাঁড়িয়ে থাকল; মধু হল

পাঠশালের সর্দার পোড়োদের একজন : সে তামাক আর আগুন আনতে ছুটল। বাঙলায়—আর শুধু বাঙলায় কেন, সম্ভবতঃ সমস্ত ভারতে সেকালের ছাত্ররা গুরুমশায়ের সেবার কাজ করতে পারলে রাগ করা দূরে থাকুক, এটুকু করবার সুযোগ পাচ্ছে বলে সম্মানিত বোধ করত। গোবিন্দের দিকে ফিরে মশাই বললেন. "কি বাবা, পণ্ডিত হবে? এসো তো আমার কাছে।"

গোবিন্দ বেচারা কেঁপে টেঁপে অস্থির। সমবয়সী বন্ধুদের কাছে ও শুনেছিল মশাইরা সাক্ষাৎ যমের মতো ভয়ঙ্কর আর পাঠশালে যারা যায়, তাদের বিতিয়ে লাল করা হয়। কাজেই রামরূপের কাছে যেতে গোবিন্দ ইতস্ততঃ করতে লাগল। শেষটা বদন ওকে ঠেলে দিল। মশাই ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "লক্ষ্মী ছেলে হও. বাবা। আর শোন, মশাইকে দেখে ভয় পেতে হয় না।"

তারপর বড় ছেলেদের একজনকে ডেকে বললেন, 'মাটির ওপর প্রথম চারটি অক্ষর লেখ্ দিকিনি।" সে তাই লিখে দিল। বদন গোবিন্দের ধুতির খুঁট থেকে রাম-খড়িটি বের করে, ওর হাতে দিল। রামরূপ খড়িসুদ্ধ গোবিন্দের হাতখানি ধরে, মাটিতে লেখা অক্ষর-গুলোর ওপর বুলিয়ে দিলেন।

ততক্ষণ সর্দার পোড়ো মধু তামাক সেজে এনে রামরূপের হাতে দিল। চারদিকে সুগন্ধ ভুর ভুর করতে লাগল। এখন রামরূপ আর বদন এক জাতের নয়; কাজেই এক হুঁকোয় তামাক খাওয়ায় বাধা ছিল। রামরূপ শুধু কল্কেটাকে তুলে বদনের হাতে দিল। বদন তার তলার দিকটা দু হাতে ধরে, ডান হাতের দুটো আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিব্যি সুখটান দিতে লাগল। দু তিন মিনিট তামাক খেয়ে, বদন কল্কেটা মশাইকে ফিরিয়ে দিল। তিনি সেটি হুঁকোর ওপর বসিয়ে দিব্যি মৌজ করে তামাক টানতে লাগলেন।

এবার এই গুরুমশাইটির চেহারা কেমন, মানুষ কেমন ধারা, তাই দেখা যাক। কথায় কথায় রেগে যেতেন; রেগে গেলেই মাথা

থেকে পা পর্যন্ত কাঁপতে আরম্ভ করত আর হতভাগ্য ছাত্রের পিঠে বিদ্যুৎবেগে সপাসপ বেতের বাড়ি পড়ত। বসবার সময় একটা পা যেভাবে রাখতেন, তাই দেখেই বোঝা যেত যে মানুষটা খোঁড়া; তার ওপর পাশেই তাঁর মোটা লাঠিটি থাকত। সেইটিতে ভর দিয়ে চলা-ফেরা করতেন। তবে বড় কষ্ট করে চলতে হত, বড় জোর বাড়ির এ-ঘর থেকে ও-ঘর। রাস্তায় বেরুনো প্রায় অসম্ভব ছিল, ন-মাসে ছ-মাসে একবার। এইজন্য সবাই তাঁকে বলত খোঁড়া-মশাই; যাতে বামুন পণ্ডিতের সঙ্গে তফাৎটা বোঝা যায়। ছাত্ররা প্রায়ই তাঁকে এ-ঘর ও-ঘর করতে সাহায্য করত এবং বলতে খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বেত খাওয়ার ক্ষতিপূরণ হিসাবে পড়ে যেতেও সাহায্য করত।



খোঁড়া-মশাইয়ের বছর চল্লিশ বয়স, কালো রঙ, রোগা শরীর, বাঁকানো নাক, বাঙ্গালীর পক্ষে কপালটা বেশ উঁচু। দস্তুরমতো কুঁজো। খোঁড়া পা ছাড়াও ওঁর শরীরে আরেকটা খুঁৎ ছিল, যার জন্য ওঁর খাতির অনেক কমে গিয়েছিল এবং উনি ঠাট্টার পাত্র হয়ে উঠে-ছিলেন। লোকটা খোনা। বদনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বললেন, "কেঁমন আঁছ বঁদন?" সে এমনি নাকী সুর যে অন্ধকার ঘরে শুনলে, ছেলেপিলেরা ভূত ভেবে ভয় পেতে পারত। কে না জানত বাঙালী ভূতরা নাকী সুরে কথা বলে।

তা সে যতই পঙ্গু শরীর আর খোনা গলা হক না কেন, রামরূপের স্বাভাবিক গুণগুলোও তুচ্ছ করবার মতো ছিল না। গ্রামে ওঁর মতো কেউ অঙ্ক জানত না। শুভঙ্করী ওঁর নখের ডগায়; বীজগণিত

পর্যন্ত জানতেন। অবিশ্যি গ্রামে আরেকজন গণিত শাস্ত্রবিৎ-ও ছিলেন, যিনি খোঁড়া-মশাইকে খুব হেয় জ্ঞান করতেন। তিনি হলেন আমাদের ধূমকেতু জ্যোতিষী। তবে দুজনার মধ্যে এই তফাৎ ছিল যে জ্যোতিষী-মশাই আকাশ গণ্যি নিয়ে মাথা ঘামাতেন, আর খোঁড়া-মশাই পার্থিব ব্যাপারে গণ্যি লাগাতেন। রামরূপ শুধু গণিতে পণ্ডিত ছিলেন না, তিনি চমৎকার যুক্তি প্রয়োগ করতেও পারতেন। গোতমের সূত্র না পড়েই তিনি দক্ষ তার্কিক হয়ে উঠেছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে যখনি বর্ধমানের খৃশ্চান মিশনারি সায়েব কাঞ্চনপুরে আসতেন, খোঁড়া-মশাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা না করে ছাড়তেন না। দুজনায় খুব তর্ক-যুদ্ধ হত আর গাঁয়ের লোকদের ধারণা সায়েব-ই সর্বদা হেরে যেতেন।

রামরূপের শাসন বড় কড়া। মোটা লাঠিটা ছাড়াও পাশে একটা লিকলিকে বেত নিয়ে বসতেন। সেই বেতটা শুধু যে ছাত্রদের হাতেই সপাসপ্ পড়ত তা নয়; মাথায়, পিঠে সব জায়গায় পড়ত। মাঝে মাঝে নিষ্ঠুর বুদ্ধি খাটিয়ে মশাই ওদের হাতের গাঁটে, হাঁটুতে, পায়ের কব্জিতে মারতেন। পাঠশালার সময় বাড়ির সামনে দিয়ে গেলেই, বেতের শব্দ শোনা যেত। অন্য রকম শাসনের ব্যবস্থাও ছিল। নাড়ু-গোপাল বলে একটা বিখ্যাত ব্যাপার ছিল।

নাড়ুগোপাল মানে হতভাগ্য ছাত্রকে এক হাঁটু গেড়ে বসে, দু দিকে দুই হাত লম্বা করে বাড়িয়ে, দুটি থান ইঁট তুলে ধরে রাখতে হত। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থাকতে হত। ইঁট পড়লেই বেতের বাড়ি!

আরেকটা সাংঘাতিক সাজার কথাও বলি। দোষীর হাতে হাত-কড়া পরিয়ে, বটগাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে পা বেঁধে, গায়ের এখানে ওখানে বিছুটি লাগানো হত। বিছুটির জ্বলুনি মৌমাছি কি বোলতার হুল ফোটানের চেয়ে কম যায় না। সে যে কি দারুণ যন্ত্রণা, অথচ হাত-পা বাঁধা, পালাবার কিম্বা নিদেন জ্বালার জায়গাটার

ওপর হাত বুলোবার পর্যন্ত উপায় থাকত না। বিকট চ্যাঁচানো ছাড়া গতি ছিল না। তবে সত্যের খাতিরে বলতে হবে যে এ-সব সাজা খোঁড়া মশাই তৈরি করেন নি, আবহমান কাল থেকে বাংলার গেঁয়ো পণ্ডিতরা এই শাস্তি দিয়ে এসেছেন।

রামরূপের আর্থিক অবস্থার কথা বলি। পাঠশালার মাইনে ছিল মাসে এক আনা (অর্থাৎ এখনকার ছয় পয়সা)। ত্রিশ-বত্রিশের বেশি ছাত্র হত না। অর্থাৎ মাসে তিনি পেতেন দুটো টাকা। তাছাড়া আরেকটু ছিল। পাঠশালা বসত ভোর থেকে বেলা ১১টা অবধি : আবার তিনটে থেকে সন্ধ্যা অবধি। রোজ বিকেলে আসবার সময় ছেলেরা মশাইয়ের জন্য পানটা, সুপুরিটা, তামাকটা নিয়ে আসত। এর ওপর ছিল মাসে একবার মশাইয়ের 'সিধা'। তার মানে খানিকটা চাল, ডাল, তরি-তরকারি, তেল, নুন, এমন কি ঘি পর্যন্ত। এতে তাঁর অনেকখানি উপায় হলেও, তিনি, তাঁর স্ত্রী আর দুটি ছেলে-মেয়ে, এই চারটি মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হত না। ঘাটতিটুকু মেটাতেন তাঁর দশ বিঘা জমির ফসল থেকে। নিজে তো আর চাষ করতে পারতেন না, কাছের এক চাষীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন।

এমনি পণ্ডিতের পাঠশালায় গোবিন্দ তো ভরতি হল। তবে কদ্দূর কি শিখল, কদ্দিন থাকল, সে সব হল অন্য কথা।

দেখতে দেখতে সেকালের মতে মালতীর বিয়ের বয়স হয়ে গেল। তখন এই ছিল নিয়ম। মালতীর এগারো বছর পূর্ণ হয়ে গেল, অথচ বদন তার বিয়ে দিচ্ছিল না। গাঁয়ের লোকে নিন্দা করতে শুরু করল। গিন্নীরা এমন সব কটুকথা বলতে লাগল যে শুনে আলঙ্গার চোখে জল আসত। এ-সব আলোচনার বেশির ভাগ হত স্নানের ঘাটে; সেখানে গাঁয়ের মেয়েরা মিলে সব বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশ করত।

গিন্নীদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, "কই, আলঙ্গা, মালতীর বিয়ে

দেবে কবে ? মস্ত হয়ে উঠল যে। বাবা! কলাগাছের মতো পা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ তোমাদের দেখছি বিয়ে দেবার নাম নেই !” সে সময় বাঙালী মেয়েদের বারো বছরে পড়বার আগেই বিয়ে হয়ে যেত। তার বেশি হলেই লোকে বলত ‘অরক্ষণীয়া’, যাকে রাখা যায় না। বদন-ও হয়তো অনেক দিন আগেই মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেলত. শুধু খরচপত্রের কথা ভেবে করেনি। হাতে তার টাকাকড়ি ছিল না। তবে ক্রমে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; মেয়ের এবার বিয়ে না দিলেই নয়। নইলে গ্রামের লোকে যা-তা বলতে শুরু করবে।

টাকাকড়িও যেমন করে হক জোগাড় করতে হবে। ধার ধোর করা ছাড়া উপায় ছিল না : বদনের মতো সৎলোক তো আর চুরি করতে পারত না। কিন্তু চেয়ে নিতে লজ্জা কি ? গরীব বাঙালী চাষীর অত ‘কিন্তু’ করলে চলে না। তবে চাইলেও দেবেটা কে ? ধার করা ছাড়া উপায় নেই। গাঁয়ের মহাজন গোলক পোদ্দারের কাছেই টাকাটা পাওয়া যাবে। সে বদনের-ও মহাজন। তার সুদটা একটু চড়া হলেও এই শতকরা ১০০ থেকে ১৫০—যাদের সঙ্গে ভাব ছিল, তাদের কাছ থেকে কম নিত। বদন সেই ভাগ্যবানদের একজন। ওর কাছে গোলক শতকরা ৭৫-এর বেশি নেবে না। কাজেই ধার করাই ঠিক হল। চারদিকে একটি ভালো পাত্রের খোঁজ করা হতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় বদন, কালামানিক, গয়ারাম আর গোরুগুলো বাড়ি ফিরে আসার পর, আলঙ্গা ভূত তাড়াবার উদ্দেশ্যে ঘরে ঘরে আলো দেখাচ্ছিল। কে না জানে যে-ঘরে সন্ধ্যাবেলায় কেউ গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও আলো দেখায়নি, যত রাজ্যের ভূত-প্রেত সেই ঘরেই রাত কাটাবার চেষ্টায় থাকে। এমন সময় একজন বাইরের লোক এসে উঠোনে দাঁড়াল।

বদন তাকে চিনতে পেরে বলল, “আরে, এই যে ঘটক-মশাই !

থাক আপনি এসেছেন ভালোই হল। আশাকরি সুখবর এনেছেন? মালতী মা, এক ঘটি জল নিয়ে আয়, ঘটক-মশাই পা ধোবেন।

সঙ্গে সঙ্গে জল এল; ঘটক-মশাই পা ধুলেন। তারপরেই হুঁকো এল, ঘটক-মশাই জোরে জোরে টান দিতে লাগলেন।

সেকালে এ দিকের অনেক বিয়েই ঘটকরা ঠিক করে দিত। তাদের কাজটি বেশ। হাসিখুসি বরের সঙ্গে সুন্দর কনের বিয়ে ঠিক করে দেওয়ার মতো আছে কি? মানুষের সুখের ব্যবস্থা এমন আর কজনা করতে পারে? সাধারণতঃ ঘটকদের কাজও যেমন আনন্দের ব্যাপার, তাদের স্বভাবও তেমনি অমায়িক হত। তারা কখনো বিয়ের যুগ্যি কারো দোষ দেখতে পায় না। মেয়ে যতই না হত-কুচ্ছিৎ হক, ছেলে হাজার বিকলাঙ্গ হক, ঘটকদের কথা শুনে মনে হবে মেয়ে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণের মতো সুন্দরী আর নরম সরম; আর ছেলে কার্তিকের মতো রূপবান, গুণবান।

তবে এই যে লোকটি বদনের উঠোনে বসে তামাক খাচ্ছিলেন, ঘটক বলতে যা বোঝায়, তিনি আসলে তা ছিলেন না। সত্যিকার ঘটকরা হতেন উঁচু জাতের বামুন আর তাঁরা শুধু বামুন পাত্র-পাত্রীর বিয়ে ঠিক করে দিতেন। তাঁরা প্রায়ই পণ্ডিত মানুষ হতেন আর সর্বদা ভারি কইয়ে-বলিয়ে। তাছাড়া সব বামুনদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠি, টিকুজি-কুষ্ঠী তাঁদের মুখস্থ থাকত। তবে সব জাতেরই নিজের নিজের ঘটক ছিল। এই যে ভদ্রলোকের কথা হচ্ছিল, ইনি হলেন আগুরীদের ঘটক। বদন আর আলঙ্গা এঁকেই লাগিয়েছিল মালতীর জন্য একটি ভালো পাত্র সংগ্রহ করে দিতে।

এর আগেও ঘটক-মশাই কয়েকবার বদনদের সঙ্গে আর কয়েকবার তাঁর পছন্দমতো এক পাত্রের মা-বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেছেন। এখন ব্যবস্থাটা পাকা করার কথা। ব্যবস্থা বলতে কি বোঝাচ্ছে, সেটা ওদের কথাবার্তা থেকেই টের পাওয়া গেল।

বদন বলল, "তা হলে ঘটক-মশাই, কি খবর বলুন ? সব পাকা হয়ে গেছে, আশা করি ?"

ঘটক-মশাই বললেন, "প্রজাপতির আশীর্বাদে সব পাকা। তোমার মেয়ে নিশ্চয়ই ভারি শুভলগ্নে জন্মেছিল, নইলে সমস্ত রাঢ়-ভূমির মধ্যে উগ্র-ক্ষত্রিয় কুলীন-শ্রেষ্ঠ, দুর্গানগরের কেশবচন্দ্র সেনের ছেলে মাধবচন্দ্র সেনের মতো রূপবান, গুণবান, স্বাস্থ্যবান বর পায় কি করে ?"

বদন বলল, "ঘটকরা সকলের প্রশংসা করে। সত্যি বলুন, ছেলের শরীরে কোনো দোষ নেই তো ?"

"রাম ! রাম ! আমি কি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি নাকি ? মাধব হল দ্বিতীয় কার্তিক ; দুর্গানগরে অমন ভালো দেখতে আর দুটি নেই ! আর সম্পত্তির কথাই যদি বল, বুড়ো কেশবের দুটো দুটো মরাই আছে ; এত কাঁসা-পেতলের বাসন যে তার গোণাগুন্তি নেই ; যে-সব জমির জন্য ওকে খাজনা দিতে হয়, তা ছাড়াও দশ বিঘে লাখরাজ জমি আছে।"

আলঙ্গা বলল—"কি কি গয়না দেবে ওরা ?"

ঘটক-মশাই বললেন, "ছেলের বৌয়ের গা ঢেকে গয়না দেবে। কিসের কিসের বায়না দিয়েছে বলি ঃ চন্দ্রহার, মল, পৈঁছা, বাউটি, তাবিজ, ঝুমকো, পাশা, বালা, নথ। কিগো বুড়িমা, তোমার বিয়ের সময় এত পেয়েছিলে ?"

আলঙ্গা বলল, "দেখুন ঘটক-মশাই, আমাদের সময় লোকে এখনকার মতো অত গয়না-গাঁটি ভালবাসত না। সে ছিল সাদাসিধে মোটা ভাত-কাপড়ের দিন। আজকাল হল শখের যুগ।"

বদন জিজ্ঞাসা করল, "মাধবের বয়সটা ঠিক কত ?"

ঘটক-মশাই বললেন, "উনিশ বছর দশ মাস পাঁচ দিন। ওর কোষ্ঠী দেখে এসেছি।

বদন বলল, "আশা করি আমাদের সগোত্র নয় ?"

ঘটক-মশাই বিরক্ত হয়ে উঠলেন, "আচ্ছা বদন, আমাকে কি একেবারে নির্বোধ ভাব? ঘটকালি করে করে চুল পাকালাম আর আজ কি না তোমার কাছে নিজের ব্যবসা শিখতে হবে!

আলঙ্গা বলল, "এ বিয়েতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। এখনই সব পাকা করে ফেলুন। দেখাই যাচ্ছে মালতী মাধবের হাঁড়িতে চাল দিয়েছে। একে বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। এ বিয়ে কে ঠেকাবে?"

কথাবার্তার ফলাফলে ঘটক-মশাই মহা খুসি হয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, বড় ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। সারা দিনে অনেক হেঁটেছিলেন, শরীর নেহাৎ ক্লান্ত, তাই শোবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন।

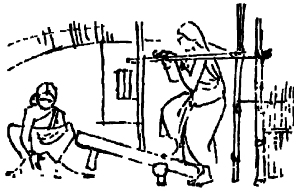
পর দিন ভোরে কাক ডাকার আগেই ঘটক-মশাই উঠে দুর্গানগরের পথ ধরলেন। কুড়ি মাইল হাঁটতে হবে। এতটা দীর্ঘ একঘেয়ে পথ; তবে যাত্রা-শেষে মোটা বখশিসের আশায় ক্লান্তি অনেকখানি কমে গেছিল। মাঝে মাঝে তামাক খাবার জন্য দু-তিন মিনিট থেমেছিলেন, নইলে প্রায় একটানা হেঁটে চলেছিলেন। ছোট নদী মায়ার ধারে পৌঁছে একবার একটু বেশিক্ষণ থেমে, স্নান করলেন। তারপর পুঁটলি থেকে আলঙ্গার গুড় মুড়ি খেলেন। লোকে বলত মায়ানদীর জল বড় ভালো। ও জল খেলে লোহার চাল-কড়াই-ও হজম হয়ে যায়। সেই জল আঁজলা ভরে পান করলেন। তারপর আবার হাঁটা। দুর্গানগর পৌঁছতে সন্ধ্যা নামল, গোরুগুলো গোয়ালে ফিরছিল। সম্বন্ধ পাকা হয়েছে শুনে কেশব সেন আর তার স্ত্রী বড় খুসি হয়ে, আনন্দের সঙ্গে বিয়ের দিন গুণতে লাগল।

এর দু দিন পরে, একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে কেশব কাঞ্চনপুরে এল। সঙ্গীর হাতে একজোড়া শাড়ি, আর দুর্গানগরের সেরা ময়রার তৈরি এক হাঁড়ি মিষ্টি। ভারি খুসি হয়ে

বদন তাদের অভ্যর্থনা করল। মালতীর মিষ্টি চেহারা আর সরল ব্যবহার দেখে, ভারি সন্তুষ্ট হয়ে, কেশব বাগ্‌দান করে গেল। দুই পক্ষেরই ইচ্ছা বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়, তাই ধূমকেতুকে ডেকে একটা ভালো দিন ঠিক করে দিতে বলা হল। রাজ্যের হিসেবপত্র করে ২৪শে ফাল্গুন দিন স্থির হল। সেদিন চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকলের প্রভাব মঙ্গল। দুদিন বাদে কেশব আর তার সঙ্গী দুর্গানগরে ফিরে গেল।

বিয়ের দু সপ্তাহ আগে থেকেই এদিকে কাঞ্চনপুরে, আরেক দিকে দুর্গানগরে বিয়েবাড়ির হৈ-চৈ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। কাছে, দূরে, বদনের যেখানে যত আত্মীয়স্বজন ছিল, যারা গ্রামে থাকত আর যারা অন্য জায়গায় থাকত, সবাই বদনের মেয়েকে আশীর্বাদ জানাতে এল। দূর থেকে যে-সব নিকট আত্মীয়রা এসেছিল, তারা বিয়ের হাঙ্গামা চুকে যাওয়া অবধি থেকে গেল।

অনেক লোক খাওয়ানো হবে; তার আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। বদনের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, বরপক্ষের লোকেরা, সবাই খাবেদাবে। দিন রাত ঢেঁকি পড়তে লাগল, রাশি রাশি ধান ছেঁটে চাল হল।



বদনদের হাতে-ঘোরানো যাঁতাটি সারাদিন কলাই, অড়র, আরো নানা রকম ডাল পিষতে লাগল। জেলেদের বায়না দেওয়া হল, ভালো মাছ যোগাড় করে আনতে হবে। বদনের পুকুরের মাছে কুলোবে না। হিন্দু চাষীদের ব্যাপার বাড়িতে তো আমিষ বলতে শুধু মাছ। গাঁয়ের গয়লাবাড়িতে হাঁড়ি হাঁড়ি দই ফরমায়েস করা হল;

বাঙালী চাষীরা বড় দইয়ের ভক্ত। তাছাড়া আলঙ্গা, সুন্দরী, আহ্লী আর পাড়ার গিন্নীরা মালতীর কাপড় গয়না নিয়েও ভাবতে বসল। বিয়ের রাতে বরকে কেমন জ্বালাতন করা যাবে, তাই নিয়ে অল্পবয়সী মেয়ে-বৌরা নানা ফন্দি আঁটতে লাগল।

বাঙালী বিয়েতে হলুদের বড় দরকার পড়ে; হলুদ ছাড়া বিয়েই হয় না। বিয়ের সময় হলুদের কেন এত প্রাধান্য সে-কথা বলা মুশকিল; বোধ হয় কালো রঙকে ফরসা করে বলেই। সে যাই হক, আলঙ্গা আর সুন্দরী একগাদা হলুদ বাটল। বিয়ের আগে মালতীর গায়ে-হলুদ হল। অনেকখানি হলুদে সরষের তেল মিশিয়ে তার গায়ে মাখানো হল। অবিশ্যি বাড়ির অন্য মেয়েরা, আত্মীয়স্বজনরা বান্ধবীরা, সখীরা, কেউ বাদ গেল না। মালতীর গায়ে যখন হলুদ মাখানো হচ্ছিল, গিন্নীদের মুখের হুলুধ্বনিতে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। তারপর মালতী স্নান করে উঠল। সেদিনের ঐ ব্যাপার বাড়ির ছুটোছুটি, হাঁকাহাঁকি, মেয়েদের হাসি-তামাশা, গাল-গল্প, যে আসে তারি কাপড়ে হলুদের ছাপ আর কান ফাটানো উলু—উলু—উলু শব্দ—সব মিলে কাঞ্চনপুরের ছোট্ট জগৎটিকে জানিয়ে দিতে লাগল যে বদনের বাড়িতে বিয়ে লেগেছে।

দুর্গানগরে এর চাইতেও বেশি হৈ-চৈ লেগেছিল। রোজ সকালে কেশবের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে ছেলে বুড়োর ভিড়। সবার মুখে ঐ একটা বই কথা নেই; মাধবের বিয়ে হচ্ছে!

বেলা দশটা নাগাদ অন্দরমহল থেকে উলু—উলু—উলু শব্দ শুনে গাঁয়ের সবাই বুঝল এবার বিয়ের পাত্রের গায়ে হলুদ মাখানো হচ্ছে। সকলেরই মহা ফুর্তি; মাধবের গায়ে তেল-হলুদ লাগাবার সময় বুড়িরা আর ছুঁড়িরা কতরকম ঠাট্টাই যে করল তার ঠিক নেই। তারপর স্নানের পালা।

বিয়ের আগের কটা দিন মাধব নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এর বাড়ি ওর বাড়ি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়াল। আইবুড়ো ভাত মানেই

অবিবাহিত অবস্থায় নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ানো। কম-বয়সীদের কি আমোদ-আহ্লাদ। পরে মাধব গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপে বসলে, ঘটক এসে সে কি ভাঁড়ামি লাগাল। মালতীর রূপ-গুণের ব্যাখ্যা না দিয়ে সবাই হাসাতে তার বেশি অসুবিধা হল না। 'মালতী-মাধব' নামে যে সংস্কৃত নাটক আছে, ঘটক সেই প্রসঙ্গ তুলে, নাটকের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে এই বিয়ের পাত্র-পাত্রীর তুলনা করতে লাগল।

অবিশ্যি আমোদ-"আহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়-ব্যাপার চলেছিল। মাধব হল গিয়ে কেশবের একমাত্র ছেলে, কাজেই তার বাপ ঠিক করেছিল এ বিয়েতে যতখানি পারে খরচপত্র করবে। বিয়ের বরের জন্য খুব দামী কাপড়-চোপড় কেনা হয়েছিল। গ্রামের মালাকারকে বলা হয়েছিল জমকালো এক টোপর বানিয়ে দিতে। সব বাঙালী বররাই—তা সে গরীব-ই হক কি বড়লোক-ই হক—সোলা দিয়ে রাংতা দিয়ে তৈরি টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে যায়। কলকাতা থেকে রূপোলী জরীর কাজ করা জুতো কিনে আনা হয়েছিল। একজন বড়লোক প্রতিবেশীর চতুর্দোলা চেয়ে আনা হয়েছিল, তাতে করে বর যাবে বিয়ে করতে। বরের যাওয়ার পথে আলো দিতে অনেকগুলো মশাল তৈরি করা হয়েছিল; তাছাড়া রং-মশালও ছিল। ফিরিঙ্গি সায়েবরা রং-মশালকে বলত 'বেঙ্গল-লাইট'। একদল বাজনদার ভাড়া করা হয়েছিল; এক প্রস্থ জগঝম্প, চারটে ঢোল, দুটি কাঁসি, দুটি সানাই, আর একপালা রসুনচৌকি। বিয়ের কদিন আগে থাকতেই এই বাজনদাররা এমনি হট্টগোল বাঁধিয়ে দিল যে সকলের কানে তালা লাগার জোগাড়।

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত ২৪শে ফাল্গুনের শুভদিনটি আগত হল। বরযাত্রীদের শোভাযাত্রার সব আয়োজন কেশব করে ফেলল। ভোরে কাক ডাকার আগেই তারা রওনা হয়ে গেল, কারণ এক দিনেই কাঞ্চনপুর পৌঁছতে হবে। চারজন ষণ্ডা বেহারা

চতুর্দোলায় করে বরকে নিয়ে রওনা দিল। তাছাড়া গেল বরের বাবা; তার সঙ্গে জনা বারো আত্মীয়-বন্ধু; বাজনদাররা; কেশবদের কুল-গুরু, পুরুতঠাকুর আর সবার শেষে—যদিও খাতিরে সে কিছু কম যায়নি—কেশবদের বাড়ির নাপিত। এই শোভাযাত্রা একবারও না থেমে, উনিশ মাইল পায়ে হেঁটে, বেলা তিনটের সময় ওরা কাঞ্চনপুর থেকে একমাইল দূরে দেবগ্রামে পৌঁছল। সেখানে থামা হল; পুকুরে স্নান সারা হল; তারপর তাড়াতাড়ি কিছু রেঁধে খাওয়া হল। তারপর জাঁকজমক সহকারে কনের বাড়ির গ্রামে যাবার আয়োজন শুরু হল।

একদিকে বরযাত্রীরা কাঞ্চনপুরের লোকেদের তাক লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে থাকুক; অন্যদিকে দেখা যাক কনের বাড়িতে কনের বন্ধুরা কি করছে। সেই সুন্দর শুভ-দিনের ভোর থেকেই বদনের বাড়িতে হট্টগোলের শেষ ছিল না। বাড়িময় আনন্দ-কোলাহল। কাছের বন্ধু, দূরের বন্ধু সবাই হাজির; অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনরা উপস্থিত। থেকে থেকেই উলু দেওয়ার শব্দ। [illegible], কুলপুরোহিত, বাড়ির নাপিত, নাপিতেনী। তাছাড়া অগুন্তি মেয়ে-পুরুষ, ছেলে বুড়ো আধা-বয়সী। এরা কেউ আত্মীয়-বন্ধু নয়, রবাহুত দর্শকমাত্র।

বদনের বাড়ির উঠোনে শতরঞ্চি পাতা হয়েছিল; মাথার ওপর একটা ক্যাম্বিশের মেরাপ বাঁধা হয়েছিল। এ দুটো জিনিসই জমিদার বাড়ি থেকে চেয়ে আনা। সবার চোখ ছিল বিয়ের কনের ওপর। কাছাকাছি যত চাষী বাড়ি ছিল, সেখান থেকে মেয়ে-বৌরা এসে একবাক্যে মালতীকে সাজাতে গোজাতে শুরু করেছিল, যাতে আজকের এই বিশেষ দিনে তাকে যতটা সম্ভব সুন্দর দেখায়। সকালে দই আর হলুদ মাখিয়ে মালতীকে স্নান করানো হল। তারপর তার চুল বাঁধা হল। সে এক এলাহি কাণ্ড। কত যে বেণি বাঁধা হল, চুল জড়িয়ে বিচিত্র নক্সা হল। তারপর গয়নাগুলো পরানো হল।

নাপতেনীর ডাক পড়ল। সে এসে ঝামা ঘষে মালতীর ছোট ছোট পা দুখানিকে সাফ করে, পরিপাটি করে আলতা পরাল। সবার শেষে মালতী লাল চেলী পরে সেজেগুজে, বর আসার জন্য বসে রইল। মালতীর পক্ষে এ দিনটি জীবনের আর সব দিন থেকে আলাদা রকমের। মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন কেন যে তাকে এমন পটের বিবি সাজাচ্ছে, মালতী তা ভেবে পেল না। সে অবিশ্যি জানত আজ তার বিয়ে হবে; কিন্তু বিয়ে যে কি জিনিস, বিয়ে হলে তার কি কি কর্তব্য হবে; তার কিছুই সে জানত না।

দেবগ্রামের আমবনের পেছনে সূর্য অস্ত গেল। গোরুগুলো গোয়ালে ফিরল; গোবরের ঝুঁড়ি মাথায় নিয়ে রাখালরা এল। পাখিরা যে যার গাছে ফিরে, জায়গা নিয়ে মহা কিচির-মিচির লাগিয়ে দিল; সমস্ত সমতল ভূমি জুড়ে সন্ধ্যা নামল। এমন সময় বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা রওনা হল। মাধব চতুর্দোলায় চড়ল; মশাল, রং-মশাল জ্বালা হল, বাজনদাররা বাদ্যি বাজাতে লাগল, অসময়ে এত আলো দেখে, এত হট্টগোল শুনে ভয় পেয়ে, বিয়ের বাজনার সঙ্গে শেয়ালের দল তাদের বিকট চিৎকার জুড়ে দিল।

বদনের বাড়িতে যারা জড়ো হয়েছিল, আগ্রহে অধীর হয়ে তারা কখন বর আসবে বলে অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে বিয়ের বাদ্যি শুনে তাদের পায় কে! বদনের মনটা আর তার চাইতেও বেশি করে আলঙ্গার মনটা আনন্দে নেচে উঠল। বাজনা যতই কাছে এল, ততই জোরে শোনাতে লাগল; বদনের আর আলঙ্গার বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল।

আর মালতীর কি হচ্ছিল? ব্যাপারটার খুব সামান্যই সে বুঝতে পারছিল, কাজেই ভয় বা আনন্দ, কোনোটাই বিশেষ টের পাচ্ছিল না। তবে তার আদরের মা-বাবাকে আর তার চেয়ে বেশি আদরের ঠাকুমাকে ছেড়ে একজন অদেখা লোকের সঙ্গে অচেনা জায়গায় যেতে হবে ভেবে তার মনটা খারাপ হয়ে গেছিল।

শোভাযাত্রা গাঁয়ের কাছাকাছি পৌঁছলে, যত সব পুরুষ, মেয়ে, ছেলেপিলে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে চ্যাঁচাতে লাগল, "বর আসছে! বর আসছে!" গাঁয়ে ঢুকবার জায়গায় পৌঁছে, বাজনা হঠাৎ থেমে গেল। সেখানে একদল গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল। তারা বলল যে ঢেলা-ভাঙানীর পয়সা না দিলে বরযাত্রীদের গাঁয়ে ঢুকতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ কি না গাঁয়ের লোকরা যাতে ঢিল ছুঁড়ে দোলা-চতুর্দোলা না ভাঙে আর বরযাত্রীদের মুণ্ডু না ফাটায়, তাই কিছু পয়সা খসাতে হবে। উভয় পক্ষের এই নিয়ে খানিকটা বচসা হবার পর, বরের বাপ পাঁচ টাকা ঘুষ দিয়ে শোভাযাত্রা নিয়ে গাঁয়ে ঢুকবার অনুমতি পেল।

আরেকটু বাদে আরেক দল লোক শোভাযাত্রা থামিয়ে গ্রামের জন্য চাঁদা আদায় করল। তারপর একদল ছোট ছেলে তাদের গুরু-মশাইয়ের জন্য পয়সা চাইল। এই সব মিটিয়ে দিয়ে, অবশেষে বর-যাত্রীরা বদনের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছল। বদন নিজে বেরিয়ে এসে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। সে রাতের নায়ক মাধব এবার সামিয়ানার তলায়, উঠোনের মধ্যিখানে গিয়ে বসল। কনের বাড়ির লোকরা তাকে ঘিরে রইল। অনেকগুলো হুঁকো এল. প্রায় সবাই তামাক খেল। নানা বিষয়ে আলাপ চলতে লাগল। রামরূপ পণ্ডিতের ছাত্ররা দলেবলে সহপাঠির দিদির বিয়ে দেখতে এসেছিল। তারা নানা রকম শক্ত শক্ত অঙ্কের ধাঁধা বলতে লাগল, তাই শুনে বরযাত্রীরা বেজায় মজা পেল।

এই আসরে গঙ্গা নাপিতের কাজ সব চাইতে বেশি। অতিথিদের তামাক দেবার ভার তার হাতে ছিল। একটার পর একটা কলকে সে সেজেই যাচ্ছিল। মেয়েদের আসরে ওর হাসিখুশি বৌটাও ভারি ব্যস্ত ছিল। বড় ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা একেকটা ন্যাকড়ার পুঁটলির মতো বসেছিল; নাপতেনী তাদের দেখাশুনো করছিল। তাদের অবিশ্যি তামাক দিতে হচ্ছিল না, কারণ হিন্দু মেয়েরা তো

আর হুঁকো খায় না। কেউ কেউ অবিশ্যি পানের সঙ্গে দোক্তা খায়, সে-ও তো তামাক পাতা। নাপতেনী মেয়েদের সঙ্গে খোশ-গল্প করে বেশ জমিয়ে রেখেছিল।

অবশেষে শুভলগ্ন হল। এই সময় বিয়ে হলে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, সকলের মঙ্গল প্রভাব পাওয়া যায়। বদন গলায় কাপড় দিয়ে হাতজোড় করে, বিনীত ভাবে সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, "মশাইরা, লগ্ন হয়ে গেছে, আপনাদের যদি আদেশ পাই, তাহলে শুভ কাজে আর বিলম্ব করি না। আমার কন্যা মালতীর সঙ্গে দুর্গা-নগরের কেশবচন্দ্র সেনের ছেলে মাধবচন্দ্র সেনের শুভ বিবাহ সম্পাদন করা হক।"

উপস্থিত অনেকে বলে উঠল, "আমরা অনুমতি দিলাম। শুভ কাজ আরম্ভ কর। বর-কন্যাকে প্রজাপতি আশীর্বাদ করুন।" সাধারণতঃ স্ত্রী-আচার হয় ভিতর-বাড়িতে। কিন্তু বদনের মতো গরীব মানুষদের ভিতর-বাড়ি বার-বাড়ি বলে আলাদা কিছু থাকে না, কাজেই যা কিছু সব-ই ঐ উঠোনেই হয়।

বড় ঘরের আর ঢেঁকি-ঘরের মধ্যিখানে উঠোনের কোণায় ছাঁদনা-তলা হয়েছিল। সেখানে একটা বড় পিঁড়ি পেতে, তার চার কোণে চারটি কচি কলা-গাছ পোঁতা হয়েছিল। সেগুলোকে ঘিরে সুতো বাঁধা হয়েছিল। মাধবকে পিঁড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে, মালতীকে আরেকটা পিঁড়িতে বসিয়ে কলা-গাছ সুদ্ধ মাধবের চার দিকে সাত পাক ঘোরানো হল। ততক্ষণ উলু শব্দে কান ঝালাপালা। আর বরের পিঠে দুমদাম কিলের বৃষ্টি। একটু ব্যথা না পেয়ে কনে নিয়ে চলে গেলেই হল কি না!

সুন্দরী এসে বরকে বরণ করল। একটা কাঁসার থালায় নানা রকম ফল, শস্য আর প্রদীপ নিয়ে, বরের কপাল ছুঁয়ে তাকে বরণ করা হল। তারপর গাঁটছড়া বাঁধা হল, মালাবদল হল। সম্প্রদান, মন্ত্রপাঠ, যা যা করণীয় সব হল।

বিয়ের পর বদন সমবেত অতিথিদের প্রীতিভোজন করাল। উঠোন থেকে শতরঞ্চি তুলে ফেলা হল। উঠোনে জল ছিটিয়ে ধুলো বসিয়ে দেওয়া হল। কুশাসন আর কলাপাতা দেওয়া হল।

তারপর বিয়ের ভোজ। চাষী বাড়ির ভোজের আয়োজন বড় সাদাসিধে, কিন্তু পরিমাণ যথেষ্ট। ভাত, ডাল, নিরামিষ তরকারি, মাছের কালিয়া, মাছের অম্বল আর দই। আমাদের খাতায় কিছু লেখা না থাকলেও, হয়তো কম খরচের মিষ্টান্নও কিছু থাকত, যেমন বোঁদে।

ঐ সাদাসিধে খাওয়াই ভারি তৃপ্তি করে খেল সবাই। কেউ বেশি কথা বলছিল না, খালি থেকে থেকে "এদিকে মাছ!" "এ পাতে আরো দই!" দিতে বলছিল। তারপর পাশের পুকুরে আঁচিয়ে, মশলাপাতি দিয়ে পান চিবুতে লাগল। হাতে হাতে হুঁকোও ঘুরতে লাগল। তারপর যে যার বাড়ি চলে গেল।

পুরুষদের পালা চুকলে, বড় ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া ঐ একই, হট্টগোল কম, কিন্তু লোকমুখে শোনা যায় পরিমাণের দিক থেকে এরাই বেশি খেল। তারপর আঁচিয়ে, পান খেয়ে, সবাই বাড়ি চলে গেল। থেকে গেল জনকয়েক অল্পবয়সী মেয়ে-বৌ: তারা বাসরঘরে রাত কাটাবে ঠিক করে রেখেছিল।

আশা করি কেউ মনে করেনি যে বর-কনের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ভোজ খাবে আর তারা দুজন উপোস করবে। উপোস অবিশ্যি সারা দিনই তাদের করার নিয়ম। বিয়ের পর উপোস ভাঙা হয়। তখন তাদের সামনে গরীব চাষীর সাধ্যমতো নানা ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত সাজিয়ে দেওয়া হয়। সাজালে কি হবে, খেতে কি আর পারে তারা! সন্ধ্যার নানা ঘটনার ফলে মাধবের পেটে খিদে ছিল না। আর মালতী যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো হয়েছিল, এসব কিছুই তার সত্যি বলে মনে হচ্ছিল না। অবিশ্যি মাধবের ভালো করে না খাওয়ার আরেকটা কারণও ছিল। ঘর বোঝাই যুবতী মেয়ে: তাদের একমাত্র কাজ মনে হল বিয়ের বরকে নানা ভাবে জব্দ করা।

আলঙ্গা একবার এসে ঘর খালি করে দেবার চেষ্টা করে গেল, কিন্তু তার সাধ্য কি! মাধব সবেমাত্র একগ্রাস ভাত মুখে তুলেছে, এমন সময় একজন যুবতী বলল, "বাঃ! আমাদের কার্তিকের দাঁতগুলো তো খাসা! কোদালের মতো ছোট ছোট, হুঁকোর নলের মতো সাদা।" কে না জানে হুঁকোর নল হয় আবলুস কাঠের। আরেকজন বলল, "কি সুন্দর চোখ গো! ঠিক যেন বেড়ালের চোখ।" তৃতীয় একজন বলল, "আর নাকটা দেখ ভাই, ডগাটা কি সুন্দর চ্যাপ্টা।" তারপর একজন এসে ওর পিঠে এমনি জোরে এক কিল বসাল যে শব্দ হল যেন পাকা তাল পড়ছে! তাই দেখে মেয়েদের কি অট্টহাসি। কিন্তু যতক্ষণ ধরেই ভোজন-পর্ব চলুক না কেন, এক সময় না এক সময় শেষ হয়। মাধবকে বাসরঘরে নিয়ে যাওয়া হল।

বিয়ের রাতের যেটুকু বাকি থাকে, সেটাকে বর-কনে সেখানে কাটায়, সে ঘরকে বাসরঘর বলে। সায়েবদের বিয়ের পর বর-কনে কয়েক দিন "মধু-চন্দ্র" করতে কোনো নিরিবিলি জায়গায় যায়। আমাদের দেশের হিন্দু বিয়ের ঐ একটা বাসরঘরের রাতেই বারোটা মধু-চন্দ্রের রস পূরে দেওয়া হয়।

বাসরঘর হয়েছিল বদনের বড় ঘরের যে দিকটাতে ওরা শুত। গরীব মানুষ খাট-পালঙ্ক মশারি ইত্যাদি কোথায় পাবে? ওরা সবাই সর্বদা মাটিতে মাদুর পেতে ঘুমোতো। আজকের দরকারের জন্য বদন পাড়াপড়শীর বাড়ি থেকে একটা তক্তপোষ চেয়ে এনেছিল। তার ওপর একটা তোষক আর দুটি বালিশ দিয়ে বিছানা পাতা হয়েছিল। যুবতীরা মাধবকে তক্তপোষে বসিয়ে, মালতীকে নিয়ে নিজেরা নিচে একটা মাদুর পেতে বসল।

একটু বাদে মালতীর সম্পর্কে এক বুড়ি মাসি, তাকে কোলে করে তুলে মাধবের বাঁ পাশে বসিয়ে দিল। লজ্জায় মালতীর মুখ লাল হয়ে উঠল; সে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢাকল। বুড়িরা বর-কনের কাছে

গিয়ে তাদের অনেক আশীর্বাদ করল। দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করল তারা যেন সুখে থাকে, চিরকাল বাঁচে, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, বিশেষতঃ ছেলে হয়; তাদের ঝোড়াঝুড়ি গোলা যেন সদাই ভরা থাকে। এই আশীর্বাণী শেষ হলে মালতী মাধব বুড়িদের সবাইকে প্রণাম করল! মাধব আবার তক্তপোষে বসল, কিন্তু মালতী মেয়েদের সঙ্গে মাদুরে বসল।

পাঠকের মনে হতে পারে যে এবার নিশ্চয় মেয়েগুলো বিদায় নিয়ে মালতী মাধবকে একটু ঘুমোতে দেবে। মোটেই তা হল না। আলঙ্গা দরজার কাছে এসে মাধবকে একটু ঘুমিয়ে নিতে বলল। মাধব খুসি হয়েই ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু মেয়েগুলো দিলে তবে তো ঘুমোবে! একজন বলে উঠল, "ওমা! এ আবার কেমন ধারা বিয়ে গো? বলি, বিয়ের রাতে কোন বর ঘুমোয় গা? মাধব আজ আমাদের সঙ্গে সারারাত জাগবে। বসন্তকাল তো সবে শুরু হল; এমন সময় কোন বর-কনের ঘুমের কথা মনে আসে! এসো ভাই, সবাই মিলে ফুর্তি করা যাক!"

তারপর বরের দিকে ফিরে সে বলল, "কি ভাই, কেমন রূপসী আর নরম-সরম বৌ বল দিকিনি! আশা করি তার সঙ্গে ভালো ব্যাভার করবে।"

মাধব বলল, "নিজের বৌয়ের সঙ্গে কে কবে খারাপ ব্যাভার করে শুনি?"

প্রথম যুবতী বলল, "কে খারাপ ব্যাভার করে জানতে চাও? এ-ও যদি না জান তো তুমি একটি আস্ত গাধা! এই কাঞ্চনপুরেই গণ্ডায় গণ্ডায় আছে। এই কাদিকেই ধর না, রোজ রাতে ওর স্বামী ওকে ঠ্যাঙায়!"

মাধব বলল, "বৌকে ঠ্যাঙানো খুব খারাপ কাজ। আমার মতে যাই হোক না কেন, বৌয়ের গায়ে কখনো হাত তোলা উচিত নয়।"

প্রথমা বলল, "আরে এই বরটাকে তো ভারি ভালোমানুষ মনে হচ্ছে। ওলো মালতী, তোর কপাল ভালো। কেমন ভালো স্বামী পেইছিস্!"

দ্বিতীয়া তাই শুনে বলল, "সে কি রে, তুই-ই যে ওর বরের প্রেমে পড়লি! বরং বরের বাঁ পাশে গিয়ে বোস আর আমরা সবাই উলু দিই! বরের কথাগুলো বুঝি বড্ড ভালো লাগছে। কিন্তু শুনে রাখ্, এখন কথাগুলো মধুর মতো মিষ্টি হলেও, পরে হবে বিষের মত তেতো! সব বরই সমান। পুরুষ মানুষরা ঐ রকমই হয়। বৌয়ের সঙ্গে সবাই মন্দ ব্যাভার করে।"

মাধব বলল, "আপনি কি নিজের কথা বলছেন নাকি?" দ্বিতীয়া বলল, "বাঃ বেড়ে বলেছ, ভাই। বেশ চটপট জবাব দিয়েছ। তোমার মধ্যে দেখছি যথেষ্ট রস আছে। যতটা কাট-খোট্টা ভেবেছিলাম ততটা নও। গোড়ায় মনে করেছিলাম তুমি একটি আস্ত গোরু, এখন দেখছি ভেতরে পদার্থ আছে! সাবাস! সাবাস! অনেকদিন বাঁচলে হয়!"

এই রকম ব্যঙ্গ কথা শুনে অন্য মেয়েরা বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। তারা বলাবলি করতে লাগল এখন এই নিয়ে একটা অপ্রিয় ব্যাপার না হয়। শেষে ঐ মেয়েটি নিজেই বলল যে সে কিছু মনে করেনি, তামাশা করে ও-সব বলেছিল।

তারপর একজন মেয়ে মাধবকে বলল, "বেশ মজার দেখে একটা গল্প বল না, ভাই। মাধব বলল, "তার চেয়ে আপনারাই গল্প বলুন, আমি বরং শুনি।" তখন মেয়েদের একজন ভারি মজার একটা গল্প বলল, সবাই হেসে লুটোপুটি। দুঃখের বিষয় গল্প যখন শেষ হয়ে এল, মাধব পড়ল ঘুমিয়ে। তাই দেখে গল্পকার উঠে গিয়ে তার কান ধরে টান দিল। বাকিরা বেজায় হাসতে লাগল।

পাশেই একটা গাছে কোকিল ডেকে ওঠাতে, মেয়েদের একজন মাধবকে বলল, "একটা গান গাও, ভাই।" মাধব স্বীকার

করল সে গান গাইতে পারে, কিন্তু মেয়েদের গলা অনেক বেশি মিষ্টি হয়, তারাই একজন গান করুক না। ওখানে যে মেয়েরা ছিল, তাদের মধ্যে প্রায় কেউ-ই গান গাইত না। সেকালে চাষীর ঘরের মেয়েদের-ও গান গাওয়া নিন্দার বিষয় ছিল। তবু ওদের মধ্যে একজন গাইতে পারত। সে একটি প্রেমের গান গাইল। তাতে খাঁচায় বন্ধ টিয়াপাখির কথা ছিল। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে, আনন্দের রাজ্যে উড়ে যেতে পাখির প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। এই তো গান। গায়িকার গলাটি বড় মিষ্টি, সকলে তার গান গাওয়ার তারিফ করতে লাগল। শেষটা সকলের পেড়াপীড়িতে মাধব-ও একটা গান গাইল।

গান শেষ হতে না হতেই আলঙ্গা হঠাৎ এসে ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলল, "বাছা মাধব, কাক ডাকছে, সকাল হয়েছে, সূর্য উঠল বলে। এবার উঠে মুখ হাত ধোও। মালতী কোথায় বাছা?" মালতী তখন মাদুরে শুয়ে ঘুমিয়ে কাদা। মেয়েরা বলল তাদের 'শয্যাতুলুনি' না দিলে, মাধবকে উঠতে দেওয়া হবে না। অনেক হাসি-তামাশার পর মাধবের কাছ থেকে দুটো টাকা আদায় করে, তোশক বালিশ তুলে দিয়ে, তবে মেয়েরা যে যার বাড়ি চলে গেল। টাকা দুটো দিয়ে মিষ্টি কেনা হল।

এইভাবে মালতীর বিয়ের বাসর শেষ হল। এর দু দিন পরে বর-কনে দুর্গানগরে রওনা হয়ে গেল।



দুঃখীদের কথা

৫

একদিন রাতে শুতে গিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করেই গয়ারামের সে কি রাগ! আদুরীকে বলল, "ঐ যে বৈরাগীটা আজ সকালে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল, তুমি তার দিকে তাকিয়ে ছিলে কেন?" আদুরী অবাক হয়ে বলল, "কোন বৈরাগী? আমি কোনো পুরুষ মানুষের মুখের দিকে তাকাই না।"

গয়ারাম বলল, "কোন বৈরাগী! ন্যাকা! যেন কিছুই জান না, আকাশ থেকে পড়েছ!"

আদুরী বলল, "ঠাকুরের নাম নিয়ে বলছি, তোমার ছাড়া আর কারো মুখের দিকে আমি তাকাই না। মিছিমিছি দোষ দিও না।"

গয়ারাম রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল, "মিছিমিছি দোষ দেব! ধূর্ত শেয়ালনী কোথাকার! দেখিনি নিজের চোখে? উঠোনের মধ্যিখানে বৈরিগী দাঁড়িয়েছিল; তুমি ওর লাউ-খোলাতে এক মুঠো চাল দেবার সময় তাকাওনি ওর মুখের দিকে? সে-ও ফিরে তাকাল; মিনমিন করে তুমি হাসলে। গোয়াল ঘর থেকে সব দেখেছি। এ সব কি তুমি অস্বীকার করছ নাকি?"

আদুরী বলল, "গোপিনাথের নামে বলছি সব মিছে কথা; বৈরিগীর লাউ-খোলায় চাল দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু তাকাইওনি, হাসিওনি।"

গয়ারাম বলল, "নিশ্চয় তাকিয়েছ, হেসেছ। না বল না। সব দেখেছি।"

আহুরী বোঝাতে লাগল, "তোমার সবটাতেই সন্দেহ বাতিক। নইলে তুমি লোক ভালো। তুমি খালি ভাব আমি এর দিকে তাকালাম, ওকে দেখে হাসলাম। অথচ আমি কোনো কালেও তা করি না। বিয়ের পর থেকে কতবার এমন কথা বলেছ বল দিকিনি? অথচ পরমেশ্বর জানেন আমার কোনো দোষ নেই।"

গয়ারাম বলল, "তুমি কোনো দোষ করেছ বলছি না। কিন্তু তোমার স্বভাব ভালো না। এর দিকে, ওর দিকে তাকাও। আজ সকালে বৈরিগীটাকে দেখে হেসেছিলে, সে-কথা মানছ না কেন?"

আহুরীও তখন চটে গেছিল। "না হাসিনি। তুমি মিছে কথা বলছ!"

এ কথা শুনে গয়ারাম রাগে ফেটে পড়ল। দিল আহুরীর গালে একটা চড় কষিয়ে। বিকট চেঁচিয়ে মাটিতে পড়ে আহুরী যেন প্রাণের ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। আলঙ্গা পাশের ঘরে শুত, যার দাওয়ায় ঢেঁকি পাতা ছিল। সে ছুটে বেরিয়ে এসে গয়ারামের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল কি হয়েছে। গয়ারাম বলল, "কিছু হয়নি। ছোট বৌ দুষ্টুমি করেছে, তাই একটু বকেছি, তাই চ্যাঁচাচ্ছে।" আলঙ্গা বলল, "আহা, ওকে মারধোর করিস না!" এই বলে নিজের ঘরে শুতে গেল।

মাটিতে শুয়ে শুয়ে আহুরী বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "হায় ভগবান! আমার কপালে কি এই লিখেছিলে! আমি মলে বাঁচতাম। হাড়ে বাতাস লাগত!"

গয়ারাম তবু বলতে লাগল, "এবার স্বীকার কর বৈরিগী দেখে হেসেছিলে আর কথা দাও এমন কাজ আর কক্ষনো করবে না। তাহলে তোমাকে মাপ করব।"

আহুরী কেঁদে বলল, "গুরুর দিব্যি, আমি কিছু করিনি। তুমি আমার প্রাণপতি, আমাকে মন্দ ভেবো না।"

গয়ারাম বলল, "নিজের চোখে দেখলাম, তবু অস্বীকার করছ?"

তখন আহুরীর রাগ হল, "তাই যদি করেই থাকি, বৈরিগীর দিকে তাকিয়ে যদি হেসেই থাকি, তাতে হয়েছেটা কি? কোনো অপরাধ করেছি?"

মেয়েদের লজ্জাশীলতা, বিনয়, এইসব সম্বন্ধে অন্য হিন্দুদের মতো, গয়ারামেরও কতকগুলো ধারণা ছিল। এখন আহুরীর মুখে এমন বেহায়ার মতো কথা শুনে, রেগেমেগে বিছানা থেকে উঠে, যেখানে আহুরী মাটিতে শুয়ে বিলাপ করছিল, সেখানে গিয়ে গয়ারাম তার পিঠে গুম্ গুম্ করে গোটাকতক কিল বসিয়ে দিল। বলা বাহুল্য আহুরী আবার চিৎকার জুড়ে দিল। কিন্তু আলঙ্গা ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কাজেই সে কিছুই শুনতে পেল না। এ-ঘরে আর কোনো কথা নেই। গয়ারাম বিছানায় শুয়ে ঘুমোতে লাগল আর আহুরী অনেকক্ষণ ধরে কান্নাকাটি হা-হুতাশ করে, শেষটা যেখানে শুয়েছিল, সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে উঠে গয়ারাম ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে না তাকিয়ে, গোয়াল ঘরের দিকে চলে গেল।

সময়মতো আহুরীও ঘর থেকে বেরিয়ে আলঙ্গা আর সুন্দরীর সঙ্গে সংসারের নিত্যকার কাজে লেগে গেল। বদন আর কালামানিক মাঠে গেল; গয়ারাম আগেই গোরু নিয়ে চলে গেছিল; পাড়ার অন্য ছেলেদের সঙ্গে গোবিন্দ-ও রামরূপ মশাইয়ের পাঠশালায় গেল। সুন্দরী আগে স্নান করল। এখন ছেলে বড় হয়ে গেছে, কাজেই রাঁধাবাড়ার ভারি কাজটা ও-ই করত। আলঙ্গা আরো বুড়ো হয়েছিল, গতরে তেমন জোর পেত না। বাড়ির পুরুষরা দুপুরে ভাত খেতে বাড়ি এল। গোবিন্দও হাতে-মুখে কালি মেখে পাঠশালা থেকে ফিরল; তাকে দেখেই বোঝা গেল এবার সে মন দিয়ে লিখতে শিখছে। পুরুষরা ভাত খেয়ে আবার মাঠে গেল। গোবিন্দও খাওয়া-দাওয়ার পর আবার পাঠশালায় গেল। বাড়ির মেয়েরা তখন খেয়ে দেয়ে, রোজকার মতো পুকুর ঘাটে গিয়ে ছাই মাটি খড় দিয়ে বাসনপত্র মেজে তুলল। তারপর

আলঙ্গা চরকা নিয়ে বসল; আহুরী আর সুন্দরী মাটির কলসী বাঁ কাঁখে নিয়ে, কলসীর গলা বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে, হিমসাগরে চলল খাবার জল আনতে।



বিকেল পাঁচটা নাগাদ আলঙ্গার পাশে বসে সুন্দরী আর আহুরী তুলো পেঁজে দিচ্ছিল, হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড হয়ে গেল! আহুরী হো-হো করে হাসতে হাসতে মাটিতে পড়ে গেল! তাকে তুলে ধরতেই সে আরো বেজায় হাসতে হাসতে দাওয়ার ওপর লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। আলঙ্গা, কিম্বা সুন্দরী আহুরীকে কখনো এ-রকম বাড়াবাড়ি করে হাসতে দেখেনি, তাদের তো চক্ষুস্থির! তাদের মনে হল আহুরীর গায়ে বাতাস লেগেছে, অর্থাৎ তাকে ভূতে পেয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে খবরটা গ্রামময় রটে গেল আর দেখতে দেখতে মাঠে বদনের আর তার ভাইদের কানেও পৌঁছল। তারা দৌড়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ভরা লোক। আর সে কি দৃশ্য! সে ভাষায় বলা যায় না। হিন্দু বৌরা কখনো ভাসুরের মুখ দেখে না, অন্ততঃ কখনো চোখে চোখে তাকায় না। বিয়ে হয়ে অবধি আহুরী কখনো বদনের কিম্বা কালামানিকের মুখ দেখেনি। তারা বাড়ি থাকলে সে নাক অবধি ঘোমটা টেনে রাখত। সেই আহুরীর আজ একেবারে অন্য মূর্তি দেখা গেল। ঘোমটা তো ফেলেই দিয়েছে, কোমরের ওপর থেকে গা খালি; কাপড় খসে গেছে। এই অবস্থায় বদন আর কালামানিকের সামনে এসে আহুরী হাসছে,

নাচছে, লাফাচ্ছে ! ওকে যে ভূতে পেয়েছে সে-বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ রইল না ।

কিন্তু কি রকম ভূতে পেয়েছে, সেই হল সমস্যা। বাংলায় অন্ততঃ দু রকম ভূত মানুষের ঘাড়ে চাপে। হয় ডাকিনী, নয় প্রেত। এখন কথা হল আহ্লরীর ঘাড়ে কে চেপেছে ? এর উত্তরটা তাড়াতাড়ি জানা দরকার, কারণ দুটোর একেবারে দু রকম চিকিচ্ছে। যে বদ্যি ডাকিনী ছাড়ায়, সে ভূতকে বাগ মানাতে পারে না। ঠিক সেই সময় এক বুড়ি এসে পড়াতে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

বুড়ি বলল আহ্লরীর নাকের তলায় এক টুকরো হলুদ পোড়ানো হক। যদি ও চুপ করে হলুদ পোড়ার গন্ধ সইতে পারে, তা হলে বুঝতে হবে ওকে ডাকিনীতে পেয়েছে। কিন্তু যদি হলুদ-পোড়া সইতে না পারে, তার মানেই ওর ঘাড়ে ভূত চেপেছে। তখন গয়ারাম আর জনাকতক বলিষ্ঠ লোক আহ্লরীকে চেপে ধরে রাখল ·তার গায়ে তখন অমানুষিক শক্তি—এদিকে ওর নাকের তলায় হলুদ পোড়ানো হল।

যেই না নাকে হলুদের ধোঁয়া ঢুকছে, আহ্লরী বিকট চিৎকার করে, চার-চারটে ঐ রকম ষণ্ডা পুরুষ মানুষের হাত ছাড়িয়ে পালায় আর কি ! এবার কারো মনে সন্দেহ রইল না যে আহ্লরীকে ভূতে পেয়েছে। কাঞ্চনপুর থেকে এক মাইল দূরে দেবগ্রামের কথা আগেও বলা হয়েছে: সেখানে 'ভূত-তাড়াইয়া' বলে এক ওঝা থাকত ; চারদিকের সব গ্রামে তার ভারি সুখ্যাতি। তক্ষুণি তাকে আনতে লোক পাঠানো হল। অত নাম-করা ওঝা তো আর তুড়ি দিলেই এসে হাজির হবে না। ভূত-প্রেতের ওপর সে রাজত্ব করে ; তার আসতে কিছু সময় নেবে বৈ-কি। ততক্ষণ দেখা যাক বাংলায় কত রকম ভূত-প্রেত আছে ; তাদের কেমন স্বভাব, কেমন রূপ ধরে, ইত্যাদি। হিন্দু ভূতদের কথাই ধরা

যাক; মুসলমান ভূত, যারা 'মামদো' নামে চলে, তাদের কথা আপাততঃ বাদ দেওয়া যাক।

বাঙালী ভূত, অর্থাৎ বাঙালী মেয়ে পুরুষদের প্রেতাত্মা অনেক রকম হয়। তবে সাধারণতঃ পাঁচ জাতের ভূত দেখা যায়। শহরের কথা বলা হচ্ছে না; সেখানে ভূত-প্রেতদের খুব একটা যাওয়া-আসা আছে বলে শোনা যায় না। আমরা বাংলার পাড়াগেঁয়ে ভূতের কথাই বলছি।

সব চাইতে সম্মানিত ভূতদের ব্রহ্মদৈত্য বলা হয়। তারা হল বামুনদের ভূত। তারা অশ্বত্থ গাছে, কিম্বা বেল গাছে থাকে। অন্যান্য ভূতদের মতো তারা যা-তা খেয়ে বেড়ায় না। শুদ্ধ জিনিস ছাড়া কিছু মুখে তোলে না। অন্যান্য ভূতদের মতো এরা মানুষদের ভয়ও দেখায় না। তাতে ওদের আত্মসম্মানে বাধে। এরা সাধারণতঃ কারো ক্ষতি করে না; রাতে কেউ একা বাইরে বেরুলে তাকে ভয়ও দেখায় না, কারো ঘাড়েও চাপে না। কিন্তু যদি তাদের অপমান করে, কিম্বা তাদের থাকবার জায়গা অপবিত্র করে, তখন তাদের রাগ দেখে কে? তক্ষুণি অপরাধীর ঘাড় মটকে তাকে মেরে ফেলে। এই রকম প্রতিশোধই তাদের পছন্দ। কাজেই হিন্দুরা সহজে ঐ বিশেষ জাতের অশ্বত্থ গাছে চড়ে না। এদিকে বেলপাতা সংগ্রহ করবার জন্য বামুনদের বেল গাছে চড়তেই হয়, নইলে পুজো বন্ধ হবে। তারা করে কি, গাছে চড়বার আগে সাধারণ ভাবে সব দেবতাদের নামে আর বিশেষ করে যদি গাছে কোনো ব্রহ্মদৈত্যর বাস থেকে থাকে, তার নামে পুজো দিয়ে, তবে গাছে চড়ে।

সব চাইতে বেশি ভূত হল দ্বিতীয় শ্রেণীর। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র মলে এই জাতের ভূত হয়। এরা তাল-গাছের মতো ঢ্যাঙা; রোগা টিংটিঙে; কালো কুচকুচে। ব্রহ্মদৈত্যদের গাছে ছাড়া, এরা সব গাছেই থাকে। রাতে, বিশেষতঃ রাত বারোটায় যখন নিঝুম নিশুতি

আঁধারের রাজত্ব, তখন তারা বেরিয়ে এসে গাঁয়ে, মাঠে ঘুরে বেড়ায়। রাতে কেউ বেরুলে, কিম্বা কারো বাড়ি ফিরতে দেরি হলে তাদের ভয় দেখায়। এরা নোংরা জায়গা পছন্দ করে; দেবস্থানের ধারকাছে যায় না। এরা খালি গায়ে থাকে। মেয়েদের ঘাড়ে চাপতে ভালোবাসে। ভাত খায়; মানুষরা যা যা খায় এরাও তাই খায়; মাছ খেতে বেজায় ভালোবাসে। সবাই সে-কথা জানে। তাই গাঁয়ের মানুষদের অনেক টাকা ঘুস না দিলে, কেউ রাতে মাছ হাতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে রাজি হয় না। আর যদি কেউ এতই বেপরোয়া হয় যে মাছ নিয়ে গ্রামের সীমান্তে, কিম্বা মাঠের মধ্যিখানে গেল, তাহলে মাছের লোভে একাধিক ভূত তাকে আক্রমণ করবেই। দুটো ভূত এলে ভালো কথা, কারণ তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে এমনি মারামারি করবে যে মাছ নিয়ে গ্রামবাসী ততক্ষণে পগার পার!

ভূতের হাত থেকে বাঁচার সব চাইতে ভালো উপায় হল কালী, দুর্গা, শিব ইত্যাদি দেবতার নাম নেওয়া। শিবের তো আরেক নাম-ই ভূতনাথ।

ভূত ভাগাবার আরেকটা উপায় হল সঙ্গে একটা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে বেরুনো। যে-কারণেই হক, ভূতরা ঐ জিনিসটিকে বেজায় ভয় করে। সেইজন্য কোনো কোনো ঋতুতে যখন হিন্দু চাষীদের রাতের বেলাও ক্ষেতে যেতে হয়, তারা সর্বদা লোহার ডাণ্ডা নিয়ে যায়। সে না হয় হল; কিন্তু দেবতাদের নাম-ই করা যাক, কিম্বা লোহার ডাণ্ডাই হাতে থাক, তাতে তো আর দূর থেকে ভয় দেখানো বন্ধ করা যায় না, না হয় মানুষটার গায়ে হাত না দিল।

ভূতদের আরেকটা বিশেষত্ব হল যে তাদের মুখের গড়ন এমন যে তারা নাকী সুরে ছাড়া কথা বলতে পারে না।

ভূত বলতে পুরুষ ভূত-ই বোঝায়। কিন্তু দু জাতের মেয়ে ভূতও আছে, যথা—পেত্নী আর শাঁখচুন্নী। পেত্নীদের বিষয় খুব বেশি জানা

যায়নি ; তবে তারা নাকি বেজায় নোংরা, তাদের গায়ে এমনি দুর্গন্ধ যে বমি আসে। পেত্নীরা পুরুষ মানুষদের ধরতে খুব ভালোবাসে। শাঁখচুন্নী বা 'শঙ্খচূর্ণী'দের ঐ রকম নাম হবার দুটি কারণ শোনা যায়। তারা নাকি শাঁখের মতো সাদা কাপড় পরতে ভালোবাসে। আবার কেউ কেউ বলে তারা শাঁখ ভাঙতে ভালোবাসে। সে যাই হক, এরা পেত্নীদের মতো নোংরা না হলেও তাদের সমান ভয়াবহ। পেত্নীরা সাধারণতঃ ধবধবে সাদা কাপড় পরে রাতে গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে মনে হয় বুঝি সাদা কাপড় ঝুলছে।

আরেক জাতের ভূত আছে, তাদের নাম স্কন্ধ কাটা, কারণ তাদের মুণ্ডু থাকে না ; কাঁধের ওপর থেকে মাথাটা কেটে নেওয়া হয়েছে। এরা অতি ভয়ঙ্কর ভূত, কাউকে পেলে আর তার রক্ষা নেই। এরা থাকে গাঁয়ের বাইরে নিচু জলা জায়গায়। লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। সেই হাতের নাগালে পড়লে নির্ঘাৎ মৃত্যু। এ-সব গল্প আপাততঃ থাক, কারণ বদনের বাড়িতে ওঝা এসে পৌঁছেছে।

ওরা আসবার আগেই আহ্লাদীকে কোল-পাঁজা করে বদনের শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে সে গায়ের কাপড় প্রায় খুলে ফেলে দিয়ে নাচছিল, লাফাচ্ছিল, মাটিতে পা ঠুকছিল, কখনো চিৎকার করছিল, কখনো বিড় বিড় করে কি সব বকছিল তার এক বর্ণও বোঝা যাচ্ছিল না। ওঝা ঘরে ঢোকবামাত্র বিকট ভাবে চেঁচিয়ে আহ্লাদী ঘরের কোণায় গিয়ে লুকোল।

ওঝা লোকটি হল বেশ ষণ্ডা গোছের আধা-বয়সী, কর্কশ চেহারার একজন চাষীর ছেলে। সে মেঝের ওপর একটা তক্তায় বসে, মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে লাগল। তারপর সে কতকগুলো মন্ত্র পড়তে শুরু করল। তার একটা এই রকম :—

ধূলা সত্যম,

মধু পত্তম,

লাধুলা করম সার ;
আশী হাজার কোটি বন্দম,
তেইশ হাজার লার।
যে পথে যা যা অমুক ছেড়ে দে কেশ,
দানো, যোগিনী, প্রেত, ভুত,
বাও, বাতাস, দেব দূত,
কাহারো নাইকো নাবালেও।
কার আজ্ঞা ?
কানাদের কামাক্ষা হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।
শীগ্‌গির লাগ্‌, লাগ্‌, লাগ্‌!

তারপর আসন ছেড়ে উঠে আহুরীর কাছে এসে ওঝা বলল, "তুমি কে ? কোথায় থাক ?"

নাকী সুরে আহুরী বলল, "আঁমার সঁঙ্গে তোর কিঁরে ? যেঁখানে খুঁসি থাঁকি !"

ওঝা বলল, "তুমি কে না বললে টেরটা পাবে।"

আহুরী বলল, "কিঁ কঁরবি কঁর! আঁমি কেঁ তাঁ বঁলব না। আঁমার কিঁ ক্ষঁতি কঁরবি কঁর।"

ওঝা বলল, "মহাদেবের নামে দিব্যি, না বললে তোর হাড়গোড় হামাম-দিস্তায় কুটব !"

আহুরী বলল, "বঁলব না, যাঁ !"

এ-কথা শুনে ওঝা বিড়-বিড় করে মন্ত্র পড়তে আর গায়ের জোরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করল। তারপর একটা বাঁশের কঞ্চি দিয়ে আহুরীকে আগা-পাস্তলা পেটাতে লাগল। ব্যথার চোটে আহুরীও গলা ছেড়ে চ্যাঁচানি শুরু করল। তারপর সেই রকম নাকী সুরে বলল, "বঁলছি, বাঁবা বঁলছি। তোঁমার সঁব কঁথার উঁত্তর দিঁচ্ছি !"

ওঝা জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি ?"

আহ্বরী বলল, "আঁমি এঁকটা ভুঁত, মঁহাদেবের অঁনুচর।"

"কোথায় থাক?"

অাঁগে হিঁমসাগরের দঁক্ষিণে-পঁশ্চিম কোঁণে এঁকটা মস্ত আঁম-গাছে থাঁকতাম। হাঁলে বাঁসা বঁদলে বঁদনের বাঁড়ির কোঁণে তাঁল-গাছে উঠেছি।"

ওঝা বলল, "ভূত হবার আগে কার দেহে ছিলে?"

আহ্বরী বলল. "সেঁ কঁথা বঁলা বাঁরণ। ওঁটা প্রেঁত-লোঁকের গোঁপন কঁথা।"

"কিন্তু ছোট-বৌয়ের দেহে ভর করেছ কেন?"

আহ্বরী বলল, "ওঁর যেঁ বঁড় রূঁপের দেঁমাক! ওঁ যেঁ লোঁকের মুঁখে চেঁয়ে হাসে!"

ওঝা বলল, "এক্ষুণি ওকে ছেড়ে যাও।"

আহ্বরী বলল, "জোঁর কঁরে তাঁড়াতে তোঁ আঁর পাঁরবে না।"

ওঝা বলল. "পারব না? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।"

এই না বলে ওঝা আবার আহ্বরীকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বেদম ঠ্যাঙাতে লাগল। আহ্বরীও বিদ্যুতের বেগে ঘরের এ-ধার থেকে ও-ধারে ছুটে বেড়াতে লাগল! চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, চুল উস্কো-খুস্কো, কাপড় খুলে পড়ে যাচ্ছে। পিছন পিছন ওঝাও ছুটতে লাগল আর বাড়ির ওপর বাড়ি পড়তে লাগল। সে কি গোঙানি, সে কি চিৎকার আর নাকী স্বরে কি ভীষণ বিলাপ! যারা যারা ঘরে ছিল, তাদের তো চক্ষুস্থির।

এঁকটু বাদে আহ্বরীর ঘাড়ের ভূতটা একটু দম নিয়ে বলল, "যাঁচ্ছি, বাঁবা, যাঁচ্ছি, এঁক ঘঁণ্টার মঁধ্যেই চঁলে যাঁচ্ছি!"

ওঝা রাজি হল না। বলল, "এক্ষুণি যেতে হবে!" এই বলে আবার পেটাতে আরম্ভ করল। তারপর থলির ভিতর থেকে কিসের একটা শেকড় বের করে, পানের পাতায় জড়িয়ে, জোর করে আহ্বরীর মুখে পুরে দিল। আহ্বরী সেটা চিবিয়ে গিলে ফেলল। তারপর কয়েক

মিনিট একেবারে স্থির হয়ে রইল। ওঝা জিজ্ঞাসা করল, "ছোট-বৌকে এক্ষুণি ছেড়ে যাচ্ছ তো ?"

আহুরী বলল, "হ্যাঁ। হ্যাঁ!"

ওঝা বলল, "যাচ্ছ যে তার চিহ্ন দিয়ে যাও। নইলে কি করে বুঝব সত্যি গেছ ?"

আহুরী বলল, "যাবার সময় দাঁতে করে এঁদের মশলা-বাঁটার শিলটা ঘরের এধার থেকে দাওয়ার ওধারে ফেলব, তা হলেই বুঝবে।"

"বেশ, তাই হবে।"

ওঝার কথামতো শিলটা এ-ঘরে আনা হল। পাঁচ সের মতো তার ওজন। আহুরী তখুনি সেটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে, দরজার দিকে চলল। তারপর চৌকাঠ ডিঙিয়েই ধপাস্ করে পড়ে গিয়ে একেবারে অজ্ঞান। দাঁতে দাঁত-কপাটি লেগে গেছে। আলঙ্গা, সুন্দরী আর মালতী তাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। মালতী ততদিনে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল।

তারপর একটা সুপুরি কাটার যাঁতি দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে দাঁত আলগা করে, গলায় একটু জল ঢালা হল। অমনি আহুরী সুস্থ হয়ে উঠল। জ্ঞান ফিরে আসতেই, চারিদিকে চেয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে সুন্দরীকে ফিসফিস করে বলল, "আমি এখানে কেন, দিদি ? ঘরে এত লোক-ই বা কিসের জন্য ?"

ওঝার কেরামতি দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেছিল। তাকে একটা টাকা আর একটা পুরনো ধুতি দেওয়া হল। তারপর বাইরের লোক যারা ভিড় করেছিল, সবাই যে যার বাড়ি চলে গেল। গয়ারাম এমনি ভয় পেয়েছিল যে সে-রাতে আর তার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত সে কিছুতেই আহুরীর সঙ্গে শুতে রাজি হয় নি। তারপর কুল-পুরোহিতকে ডেকে পুজো দিয়ে আহুরীকে শুদ্ধি করানো হল, তবে গয়ারাম আবার স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট করে নিল।

এদিকে গোবিন্দ তো রোজ পাঠশালায় যাচ্ছিল; সেখানে রামরূপের কাছে তার লেখাপড়া শেখা কতখানি এগোচ্ছিল সেটা একবার দেখা দরকার। প্রথম দিন মাটিতে লেখা অক্ষরের ওপর খড়ি বুলিয়ে প্রথম পাঠ নিতে হয়েছিল সে তো আমরা দেখেই ছিলাম। ছয় মাস ধরে ঐ রকম করে গোবিন্দর অক্ষর চেনার কাজ চলেছিল। তারপর মাটি ছেড়ে তালপাতায় লেখা আর খড়ির বদলে কালি আর খাগের কলম। সেকালে বাংলায় কোনো ছোট ছেলেই—তা সে রাজার ছেলেই হক কিম্বা চাষীর ছেলেই হক—হাঁসের পালকের কলম, কি ইস্টিলের কলম দিয়ে লিখত না। সবাই নল খাগড়া কেটে কলম তৈরি করত। খালি সংস্কৃত টোলের হবু পণ্ডিতরা খাগের বদলে বাঁশ কেটে কলম বানাত।

কলম তো হল, এখন লিখবে কিসের ওপর? স্লেট জিনিসটার এদেশে চলন ছিল না; পরে ইংরেজরা এনেছিল বটে, কিন্তু বিলিতী ধাঁচের ইস্কুলে ছাড়া স্লেট ব্যবহার হত না। যারা সবে লিখতে শিখেছে, তাদের পক্ষে তালপাতাই ভালো। এক পয়সাও লাগে না, বিশেষ করে পাড়া-গাঁয়ে। তারপর স্লেটের চাইতে টেকে বেশি; ভাঙেও না, সহজে ছেঁড়েও না। তৃতীয় কথা হল স্লেটের চেয়ে অনেক হাল্কা হওয়াতে ছোট ছেলেদের পক্ষে নেওয়া-আনার সুবিধা।



রোজ সকালে বিকেলে গোবিন্দকে দেখা যেত পাঠশালায় যাচ্ছে; বগলে গোটা কুড়ি তালপাতা, ডান কানের পেছনে খাগের কলম গোঁজা, বাঁ হাতে একটা মাটির দোয়াত, ডান হাত খালি। বাড়ি ফিরত যখন, হাতে কালি, মুখে কালি, ধুতিতে কালির ছিটে। কারণ

তালপাতার ওপর ভুল অক্ষর লিখে ফেললেই গোবিন্দ হাতের তেলো কিম্বা কব্জি দিয়ে সেটাকে মুছে ফেলত। তাই দেখে কিন্তু আলসা আর সুন্দরী বেজায় খুসি হত, কারণ গায়ে আর কাপড়ে প্রচুর কালি মাখা মানেই সোনামানিক প্রচুর লেখাপড়া শিখছে।

সেকালের গোঁড়া পণ্ডিতদের পাঠশালায়—আর শুধু সেকালে কেন, অনেকদিন পর অবধিও—কয়েক বছর ধরে ছেলেরা খালি লেখা অভ্যাস করত আর একটু একটু আঁক কষতে শিখত; বইটই বিশেষ পড়ত না। হাতের লেখা ভালো হওয়া চাই আর আঁক কষতে পারা চাই, তাহলেই হয়ে গেল।

ভোরে পাঠশালায় গিয়েই গোবিন্দ বাংলা বর্ণমালার পঞ্চাশটা অক্ষর, যুক্তাক্ষর—সে যুক্তাক্ষর দেখলে বিদেশীদের চোখ কপালে উঠে যায়—১ থেকে ১০০ অবধি সমস্ত সংজ্ঞা লিখে লিখে, কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিত। ভাত খেতে বাড়ি যাবার আগে, তাকে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমস্বরে ঐ সব অক্ষর আর সংজ্ঞা পড়তে হত। বিকেলে ফিরে এসে আবার ঐ একই জিনিস লেখা, তারপর সন্ধ্যায় পাঠশালা বন্ধ হবার আগে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সুর করে দুই এক্কে দুই থেকে কুড়ি কুড়িং পর্যন্ত নামতা বলতে হত। নামতা বলার ব্যাপারে বোধ হয় বাংলার পাড়াগাঁয়ের ছেলেদের জুড়ি সমস্ত পৃথিবীতে আর নেই।

তারপর অক্ষর লিখতে শেখা হলে নাম লিখতে শিখতে হত, বিশেষ করে মানুষের নাম। পাঠশালার সব ছেলের নাম, তারপর গ্রামের অধিকাংশ লোকের নাম একের পর এক গোবিন্দর তালপাতায় শোভা পেল।

লেখার কাজের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক শেখা চলত। প্রথমে সব নামতা গড়গড়ে মুখস্থ; তারপর যোগ, সরল আর মিশ্র; তারপর বিয়োগ, সরল আর মিশ্র; তারপর গুণ ভাগ আলাদা করে না শিখে

একেবারে সের-কষা, মণ-কষা, কাঞ্চনমালা, সুদ-কষা, কাঠাকালি, বিঘাকালি ইত্যাদি। তাই বলে কেউ যেন না মনে করে যে গোবিন্দ এই সমস্তই শিখেছিল। ঘটনাক্রমে মিশ্র বিয়োগ শিখবার পরেই ওর লেখাপড়ায় ইতি হয়ে গেল। সে-কথা পরে হবে।

এদিকে গাঁয়ের পাঠশালায় কেউ স্লেট ব্যবহার করত না, ব্ল্যাক-বোর্ডের কথা তো ছেড়েই দিলাম—তালপাতায় লম্বা লম্বা সংখ্যার জায়গাই হত না, কাজেই বেশ কয়েক বছর ধরে পাঠশালার পোড়োরা মাটিতে আঁচড় কেটে আঁক কষত।

সব চাইতে নিচে হল 'মেঝে-খড়ির' ক্লাস। এই ক্লাসে গোবিন্দ ছয় মাস ছিল। তারপর তালপাতার ক্লাস; সে-ক্লাসে গোবিন্দ তিন বছর পড়েছিল। চতুর্থ বছরের পড়ায় ওকে কলাপাতার ক্লাসে তুলে দেওয়া হল। তার-ও ওপরে হল কাগজে লেখার ক্লাস। গোবিন্দ বেচারির দৌড় অতদূর পৌছয়নি।

কলাপাতার ক্লাস পর্যন্তই ওর দৌড়। সে কাহিনী শুনতে বেশ লাগে। তালপাতার গাদা ফেলে দিয়ে গোবিন্দ তো কলাপাতা ধরল। বাড়িতে কলাপাতার অভাব ছিল না। তবে মাঝে-মধ্যে বাড়িতে কোনো কারণে খাওয়া-দাওয়া থাকলে কলাপাতা যেত ফুরিয়ে। তখন পাড়া-পড়শীদের বাড়ি থেকে চেয়ে চিন্তে কিম্বা চুরি করে কলাপাতা জোগাড় করতে হত। গোবিন্দ এবার লোকের নাম লেখা ছেড়ে, চিঠিপত্র লেখা ধরল। পাঠশালার শিক্ষার এটা একটা প্রধান অঙ্গ। বেশ কয়েক বছর ধরে শেখানো হত। এমান রচনা লেখানো হত না, কারণ রচনা আবার কার কোন কাজে লাগে? যা কিছু বাস্তব কাজে লাগে, পাঠশালায় সেই-সব শেখানোর ওপর জোর দেওয়া হত। এ-কথা সবাইকে মানতেই হবে যে ব্যবসা করতে গেলে উপযুক্ত ভাবে চিঠিপত্র লিখতে না পারলে চলে না। তাছাড়া বাংলায় চিঠিলেখা খুব সহজ ছিল না। শিরোনামা, সম্বোধনই একশো রকমের; যে চিঠি লিখছে আর যাকে লিখছে, তাদের সম্বন্ধটা বুঝে। যে-ভাবে

বাপকে সম্বোধন করা হবে, সে-ভাবে কাকাকে করা হবে না। আবার কাকার সম্বোধন মামার সম্বোধন থেকে আলাদা। যত রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা সম্ভব, প্রত্যেকের আলাদা নিয়ম। কাজেই সম্বোধন শেখার শেষ ছিল না। গোবিন্দ এবার সম্বোধনের সেই দুস্তর সাগরে পাড়ি দেওয়া শুরু করল।

বাংলার বিলিতী নিয়মের স্কুল কলেজগুলোর পাঠশালা দেখে কিছু শিখবার আছে। আমাদের বি-এ এম্-এ পাস করা ছোকরা বাবুরা সহজ ইংরিজিতে একটা চিঠি লিখতে পারেন না। এদিকে সাহিত্য, অর্থশাস্ত্র, দর্শন সম্বন্ধে বড় বড় জ্ঞানগর্ভ রচনা লিখবেন, ওদিকে ব্যবসা প্রসঙ্গে ইংরিজিতে একটা সামান্য চিঠি লিখতে গিয়ে জিব বেরিয়ে পড়বে। এ ধরনের শিক্ষার মধ্যে কোথাও একটা বড় গলদ থেকে যাচ্ছে। দুটি নিয়মের মধ্যে যেন পাঠশালারটিই ভালো মনে হয়, তারা অন্ততঃ বাস্তব জীবনের চাহিদা মেটাতে শেখায়। হ্যাঁ, শৌখীন বিদ্যা শেখাতে চাও, তাই শেখাও; তাই বলে শখের জন্য প্রয়োজনটাকে বাদ দিও না।

যাকগে গোবিন্দর কথাই হক। রামরূপের যে-সব কঠিন সাজার কথা আগেই বলা হয়েছে, গোবিন্দও যে তার হাত থেকে রেহাই পেত না, সে তো সহজেই বোঝা যায়।

চাষীর ছেলে; ছেলেমানুষ, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান; তার যে পাঠশালায় বদ্ধ থাকতে ভালো লাগবে না এবং সে যে প্রায়ই পালিয়ে যাবে, সে তো জানা কথা। পাঠশালায় না গিয়ে, গোবিন্দ দূরের কোনো দীঘির ধারে বাঁধে উঠত; কিম্বা আম-বনে তেঁতুল-বনে গিয়ে রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মাতত। রামরূপ কিন্তু ফেরারী ছেলে ধরে আনতে ওস্তাদ ছিলেন। চারজন সরদার পোড়ো দিয়ে তিনি নিজস্ব একটি গোয়েন্দা বিভাগ বানিয়েছিলেন। কোনো ছেলেকে গ্রেপ্তার করে আনতে হলেই তাদের পাঠাতেন।

গোবিন্দ যেদিন পাঠশালায় যেত না, এই পোড়োরা ওদের বাড়ি

গিয়ে ওর মা কিম্বা ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করত গোবিন্দ কোথায়। তারা যদি বলত, "কেন, সে তো রোজকার মতো পাঠশালায় গেছে।" তাহলে অমনি ছুটত তারা গ্রামের সীমান্তের কাছে, বিশেষ করে যে-সব জায়গায় গোবিন্দ যেতে ভালোবাসত। ঠিক পাকড়াও করত তাকে। যদি গোবিন্দ আপত্তি করত, দুটো ছেলে ওর দু ঠ্যাং ধরত, দুটো ছেলে ধরত দু হাত। অমনি তাকে চ্যাং-দোলা করে গুরুমশায়ের কাছে নিয়ে আসত। গোবিন্দ তো ভয়েই আধমরা। রামরূপও তাকে বেদম পেটাতেন।

ঐ চার গোয়েন্দা গুরুমশায়ের অন্য কাজেও লাগত। তাঁর বাড়িতে যদি লোক খাওয়ানো হত—আর হিন্দুদের তো বারো মাসে তেরো পার্বণ—অমনি তাদের ডাক পড়ত, "কলাপাতা নিয়ে আয়।" আর তারাও কারো বাগানে ঢুকে কলাপাতা কেটে আনত। গুরুমশাই-ও কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না, যদিও জানতেন সব-ই। কলাপাতা পেয়ে তিনি খুসিই হতেন।

এইভাবে একের পর এক নানা রকম শিক্ষা, শাসন আর নীতি-জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে গোবিন্দ দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা দুর্ঘটনার ফলে তার ছাত্রজীবন সাঙ্গ হল। সে কথা পরে বলা হবে।

গোবিন্দের যখন সাত আট বছর বয়স, তখন সে একটা বীভৎস দৃশ্য দেখেছিল। সেকালে বাংলার সমতল ভূমিতে, বিশেষ করে পবিত্র ভাগীরথী নদীর তীরে, এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত। সুখের বিষয় পরে বৃটিশ সরকার আইন করে এই ব্যাপার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। একদিন দুপুর বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর, বগলে পাততাড়ি আর হাতে মাটির দোয়াত নিয়ে গোবিন্দ পাঠশালায় যাচ্ছিল, এমন সময় ঢাক ঢোলের শব্দ কানে এল। শব্দটা কেমন যেন অন্য রকম মনে হল। ঢাক বাজছিল গোবিন্দদের কুলপুরোহিত রামধন মিশ্রদের বাড়ি থেকে। কাজেই পাঠশালা শিকেয় তুলে,

গোবিন্দ অকুস্থলে চলল। অগুন্তি মেয়ে পুরুষ ছেলেপিলেও সেদিকে ছুটেছিল।

রামধন মিশ্রের বাবা সেদিন সকালে মারা গেছিলেন। ঐ অদ্ভুত ঢাকের শব্দে গ্রামসুদ্ধ সকলকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে রামধনের মা স্বামীর চিতায় পুড়ে সতী হবেন। ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে গোবিন্দ বাড়িতে ঢুকল। উঠোনের মধ্যিখানে রামধনের মা অনেকগুলো মেয়ে বৌয়ের মাঝখানে বসেছিলেন। কান্নাকাটি করা দূরে থাকুক, থেকে থেকেই হাসছিলেন; মনে হচ্ছিল তাঁর মনে খুব ফুর্তি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্নান করে-ওঠা চেহারা। নাপিতেনী এসে হাতের পায়ের নখ কেটে, পায়ে আলতা পরিয়ে দিয়েছিল। চমৎকার এক নতুন শাড়ি গায়ে, সর্বাঙ্গে গয়না পরা। কপালে সিঁদূর, পান খেয়ে ঠোঁট লাল। হাতে একটা পাতাসুদ্ধ আমের ডাল। দেখে একটুও শোকাহতা বিধবা মনে হচ্ছিল না; বিয়ের কনের মতো সাজ করা।

ওঁর স্বামীর মৃতদেহ আগেই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবার উনিও যাত্রা করবেন। শ্মশানটা গ্রামের সীমান্তে। সেখানে হেঁটে যাবার সময় রামধনের মা তাঁর সঙ্গী সাথীদের বলতে লাগলেন আজ তাঁর বিয়ের দিন, তাঁর জীবনের সব চাইতে আনন্দের দিন। —বলে নিজেই উলু দিতে লাগলেন। গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের—কি পুরুষ, কি নারী—মন ভক্তিতে ভরে উঠল। সকলেই বলতে লাগল এই রকম সতী-সাধ্বীর মতো কেউ হয় না, স্বামীর সঙ্গে ইচ্ছা করে পরলোকে চলেছেন! চারদিকে কান ফাটানো উলু-ধ্বনি আর হরিবোল শব্দ।

একটা দীঘির ধারে চিতা তৈরী করা হয়েছিল, তার ওপর ওঁর স্বামীর দেহ শোয়ানো ছিল। সাত-আট ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া, তিন ফুট উঁচু চিতা। প্রচুর জ্বালানি কাঠ, পাটকাঠি, পাট, এক হাঁড়ি ঘি।

এবার সতী নিজের গা থেকে গয়নাগুলো খুলে খুলে আত্মীয়

আর বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। সঙ্গে খই আর কড়ি ছিল, সেগুলো ভিড়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। সেগুলো কুড়োবার জন্য ভিড়ের মধ্যে সে কি ঠেলাঠেলি। ওতে নাকি মারাত্মক রোগও সেরে যায়। মায়েরা অনেক সময় ঐ কড়ি তাঁদের সন্তানদের গলায় সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতেন। গোবিন্দ-ও ভাগ্যক্রমে একটা কড়ি পেয়ে, ধুতির খুঁটে যত্ন করে বেঁধে রেখেছিল।

এরপর সতী খই আর কড়ি ছড়াতে ছড়াতে চিতার চারিদিকে ঘুরলেন। তারপর চিতায় উঠে, স্বামীর মৃতদেহের পাশে শুলেন। দুজনকে একসঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। তার ওপর কাঠ চাপানো হল। এবার চারদিক একেবারে চুপ। তারপর ওঁদের ছেলে রামধন পাটকাঠিতে আগুন ধরিয়ে, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে, বাপের মুখে আগুন দিলেন। শাস্ত্রে লেখা আছে বাপের প্রতি ছেলের এই হল শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠল। মৃতের আত্মীয়স্বজনরা বিলাপ করতে শুরু করল। সতীর দেহে আগুন পৌঁছলে তিনিও বিকট চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু হতভাগিনীর চিৎকারের শব্দ চাপা দিয়ে ঢাক ঢোল বাজতে লাগল। আরো কাঠ, আরো ঘি দেওয়া হল।

অসহ্য যন্ত্রণায় সতী দড়ি খুলে উঠে বসলেন। হাত বাড়িয়ে কাতরভাবে অনুনয় করতে লাগলেন। চীৎকার করতে লাগলেন। নেমে পালাবার চেষ্টা করলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত কেমন একটা কুসংস্কারের নেশায় মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন; এবার প্রকৃতি তার শোধ নিক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ঢাকের শব্দ আর হরিবোল চিৎকারে সবার কানে তালা লাগল। দুটো বাঁশ ঠিক করাই ছিল। তাই দিয়ে সতীকে চেপে ধরে, চিতা থেকে নেমেপড়া বন্ধ করা হল। তারপর সব শেষ। কুসংস্কারে বলি হলেন রামধনের মা। আরো কাঠ আর ঘি দিয়ে দেহদুটিকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হল।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখে গোবিন্দর কি হয়েছিল সে-কথা জানা যায় নি। কিন্তু এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে সমস্ত কাঞ্চনপুরে এমন একজনও ছিল না, যার মনে হয়েছিল যে এ-ভাবে আত্মহত্যা করা পাপ। বরং তাদের ধারণা ছিল যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জীবন্ত বলি-স্বরূপা ঐ হতভাগিনীর মতো সৌভাগ্যবতী কম আছে।

সুখের বিষয় কাঞ্চনপুরে এর পর আর কখনো সতীদাহ হয়নি। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই সহৃদয় শাসক উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক প্রচণ্ড সৎ-সাহস দেখিয়ে, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮২৯ থেকে আইন করে সতীদাহ বন্ধ করেন। এই মহৎ কাজে রামমোহন রায় ইত্যাদি কয়েকজন মহাপুরুষ তাঁর সহকারী ছিলেন।



বলা বাহুল্য কাঞ্চনপুরে কোনো মদের দোকান ছিল না। তবে গাঁয়ের উপকণ্ঠে এক জায়গায় 'হাঁড়িয়া' বিক্রি হত। হাঁড়িয়া জল ভাত পচানো মদ। সেখানকার খদ্দেররা সব হাড়ি ডোম ইত্যাদি। সমাজে এদের জায়গা চাষীদের অনেক নিচে। হাঁড়িয়ার দোকানে আড্ডা বসত না ; খোদ্দেররা মদ খেতে যেত ; খাওয়া হলেই বাড়ি ফিরত। বদন কিম্বা তার বাড়ির কেউ যেমন খুন করার কথা ভাবতে পারত না, তেমন মদ খাওয়ার কথাও ভাবতে পারত না। ওদের কাছে দুটোই প্রায় সমান অপরাধ। বদন, কালামানিক, গয়ারাম সন্ধ্যাবেলায় সাধারণতঃ বাড়িতেই থাকত। মাঝে-মধ্যে

বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে বেড়াতে যেত। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্যন্ত বেজায় গরম। তখন মাঠ থেকে ফিরে গা ধুয়ে, উঠোনে মাদুর পেতে, তার ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে ওরা তামাক খেত আর সারা দিনের ঘটনা নিয়ে গল্প করত। আলঙ্গাও অনেক সময় ওদের কাছে এসে বসত, তবে একটু দূরে আর মাটিতে।

কি বিষয়ে ওরা গল্প করত? আবহাওয়ার কথা; বলদগুলোর কথা: লাঙ্গল দেবার, কিম্বা মই দেবার, কিম্বা ধান বোনার, বা সেচের কথা: জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ—এই সব নিয়ে তাদের গল্প। এ-সমস্ত বিষয়ে বদনের যতখানি উদ্বেগ, আলঙ্গার ও ততখানি। মাঝে মাঝে প্রতিবেশী কেউ আসত, অমনি তাকে হুঁকো দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত। যে আসত তাকেই তামাক দেওয়া হত।

এ-সব সময় গোবিন্দও সর্বদা উপস্থিত থাকত। সূর্য ডোবার সময় সে পাঠশালা থেকে ফিরত: ফিরেই বড়-ঘরের দাওয়ার এক কোণায় পাততাড়ি, কলম, দোয়াত রেখে, পুকুরে গিয়ে ভালো করে হাত-মুখ-পা ধুত। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে ডাল-ভাত খেত। ওর মা কি ঠাকুমা পরিবেশন করত। বড়রা রাত আটটা নটায় খেত। গোবিন্দ ছেলেমানুষ, ও আর কি করে অতক্ষণ জাগবে। আলঙ্গা অবিশ্যি বেলা তিনটের সময় ঐ একবারই খেত। খাওয়ার পর গোবিন্দও বাপ-কাকাদের সঙ্গে উঠোনের মাদুরে গিয়ে বসত।

তখন ওকে নামতা শোনাতে হত আর পাঠশালায় যা যা শিখে এসেছিল, সব বলতে হত।

বদন নিজে লেখাপড়া না জানলেও, ছেলেকে নানা রকম প্রশ্ন করত। যেমন: "এক পয়সায় যদি দশটা কলা পাওয়া যায়, চার পয়সায় কটা পাবে?" বা "এক পয়সায় যদি দশটা কলা পেলে, পঞ্চাশটা কলার দাম কত?" প্রথমবার যখন বদন এই ধরনের প্রশ্ন করেছিল, গোবিন্দ সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি রকম কলা,

বাবা? বর্তমান না কাঁটালি?" বিজ্ঞের মত হেসে বদন উত্তর দিয়েছিল, "কি রকম কলা তাতে তোমার কিছু আসে যায় না, গোবিন্দ, সব কলার হিসেব-ই এক।"

অনেক সময় একটা প্রশ্ন নিয়েই গোবিন্দ পনেরো মিনিট কাটিয়ে দিত। বদনের ভয় হত খুদে মানুষটা বুঝি ঘুমিয়েই পড়ল। "ঘুমুলি নাকি, গোবিন?" সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ উত্তর দিত, "না, বাবা, ঘুমুচ্ছি না। মনে মনে হিসেব কষছি।"

তবে বদন বুঝত মেলা প্রশ্ন করে ছেলেটাকে তিতিবিরক্ত করে তোলা উচিত নয়। দুটো একটা প্রশ্ন করেই ওকে ছেড়ে দিত, যা ভালো লাগে করুক বেচারি। যা ভালো লাগত সেটি হল রোজ রাতে পাড়ার এক পাতানো মাসির কাছে গিয়ে গল্প শুনতে। মাসির গল্প বলার জন্য খ্যাতি ছিল।

তার নাম ছিল শম্ভুর মা। বছর পঞ্চাশেক বয়স, বিধবা মানুষ, সুতো কেটে তাঁতীদের কাছে বিক্রি করে সংসার চালাত। শম্ভু বলে তার এক ছেলে; সে পাড়ার একজনদের গোরু চরিয়ে কিছু রোজগার করত। তার বয়স দশ বছর। সবাই বলত শম্ভুর মায়ের মতো এ গাঁয়ে কেউ গল্প বলতে পারে না। ছেলেপিলেরা তার ভারি ভক্ত। সন্ধ্যাবেলায় যেই না ঘরে ঘরে আলো জ্বলত, একে দুইয়ে, বা ছোট ছোট দল বেঁধে ছেলে-মেয়েরা তার ঘরে জড়ো হয়ে, হাঁ করে আশ্চর্য সব উপকথা শুনত। রোজ রাতে বাপ-কাকাদের প্রশ্নের কাছ থেকে রেহাই পেয়েই, গোবিন্দও সেইখানে ছুটত।

শম্ভুর মার ঘরে মিট মিট করে একটা আলো জ্বলত। তার সামনে শম্ভুর মা বসত। খুদে শ্রোতারা পালা করে বাতির তেল যোগাত। গল্প বলবার সময়-ও কিন্তু শম্ভুর মায়ের হাতের কাজ থামত না; সমস্তক্ষণ ঘনর-ঘনর করে চরকা ঘুরত। মাঝে মাঝে কোনো বিকট ভয়াবহ কিম্বা দুঃখের কথা বলবার সময়, ডান হাত

থকে চরকার হাতল, বাঁ হাত থেকে তুলোর গুছি পড়ে যেত। শম্ভুর মা দরকার মতো হাত-পা নেড়ে গল্প বলতে থাকত।

গল্পগুলো তিন রকমের ঃ—রাজারানীদের গল্প, ভূতের গল্প আর চার বন্ধুর ভ্রমণের গল্প। রাজাদের সর্বদা দুটো করে রানী থাকত; সুও, সে বড় ভালো আর দুও, সে খুব মন্দ। গল্পের শেষে দুষ্টু রানী সাজা পেত, ভালো রানী সুখী হত। চার বন্ধুর ভ্রমণ কাহিনীর ব্যাপার একেক গল্পে একেক রকম। কিন্তু বন্ধুরা সর্বদা এক রকম, রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে, কোটালের ছেলে, সদাগরের ছেলে।

তবে যে-গল্প শ্রোতারা সব চাইতে ভালোবাসত, সে হল ভূতের গল্প। ভূতের গল্প বলবার সময় বুড়ির কি বর্ণনা! ভূত আসার সময় গলা নামিয়ে বুড়ি ফিসফিস করে কথা বলত। ভূত কথা বললে বুড়িও নাকী স্বর ধরত। ভূতের গল্প শুনবার সময় ছেলেপিলেরা সর্বদা বেজায় ভয় পেত। জড়োসড়ো হয়ে তারা শম্ভুর মায়ের গা ঘেঁষে বসত; ওদের গা শির শির করত, চুল খাড়া হয়ে উঠত। যে দিন শেষের গল্পটা হত ভূতের বিষয়, ছেলেরা একা বাড়ি ফিরতে ভয় পেত। সে দিন তারা দল বেঁধে যেত; যে যার বাড়ি পৌঁছলে, একে একে খসে পড়ত। সব চাইতে সাহসী যে, সে সবার শেষে বাড়ি যেত।

গোবিন্দ তো পাশের বাড়িতেই থাকত; তবু ভূতের গল্প শুনে সে কিছুতেই একা বাড়ি ফিরত না। বন্ধুরা সঙ্গে করে শুধু দোর-গোড়াতেই ওকে ছেড়ে দিত না, একেবারে বাড়ির ভিতর পর্যন্ত দিয়ে আসত। বাঙালী ছেলেরা এরকম ঝুড়ি ঝুড়ি ভূতের গল্প শোনে। তাতে নাকি দুটো ফল হয়ঃ ওদের অলৌকিকে বিশ্বাস বাড়ে আর ওরা বেজায় ভীতু হয়ে যায়। তবে এর আরেকটা দিক-ও আছে। ভূতের গল্প শুনে শুনে ভূতের ভয়টাও কমে যায়।

তখন শ্রাবণ মাস। দিগ্‌গজরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মহাসাগরে শুঁড় ডুবিয়ে আকাশের বুকে জল ছিটোচ্ছিলেন। এমনি জোরে বৃষ্টি

পড়েছিল যে কাঞ্চনপুরের লোকরা বলাবলি করছিল, "বাবা! একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে গো!" গাঁয়ের মধ্যে সব চাইতে বুড়ো যে, সে-ও বলল, "জন্মে অবধি এমন বৃষ্টি দেখিনি।" দুর্দান্ত অজয় নদীর বাঁধ ভেঙে, চারদিক জলে ডুবে গেল। তারি মধ্যে কাঞ্চনপুর সমুদ্রের মাঝখানে একটা ছোট দ্বীপের মতো মাথা তুলে রইল।

বলা বাহুল্য চাষ-বাস বন্ধ; গোরু বাছুর গোয়ালে তোলা। চাষীরা বসে বসে হয় তামাক খেত, নয় ছিপের সুতো কাটত। বেপরোয়া দু চারজন হাতে কুঁড়ো-জালি নিয়ে বানের জলে মাছের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ত। কয়েক দিনের মধ্যে জল কমল; ক্ষেতের আল দেখা গেল; বদন, কালামানিক আর গয়ারাম ক্ষেত দেখতে চলল।

আউশ ধানের কি অবস্থা হল কে জানে। বড় জলের আগে সেগুলো কাটবার জন্য প্রায় তৈরি ছিল। তিনজনের হাতে বাঁশের পাঁচন-বাড়ি: এগুলো ছাড়া ওরা কখনো মাঠে যেত না। দুই ক্ষেতের মধ্যিখানে আলের ওপর দিয়ে গয়ারাম চলেছে; এমন সময় তিন হাত লম্বা এক কাল কেউটে নিমেষের মধ্যে খাড়া হয়ে উঠেই, ওকে তাড়া করল। পালাবার এতটুকু সময় পেল না বেচারি। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কব্জির ওপর একবার দাঁত বসিয়েই ফণা তুলে আবার ছোবল দিল। কালামানিক কাছেই ছিল; ছুটে এসে পাঁচনের এক বাড়িতে সাপের দফা শেষ করে দিল। কিন্তু তখন আর কিছু করার ছিল না। কাল-কেউটের বিষ সব সাপের বিষের চাইতে ভয়ানক। গয়ারাম মাটিতে শুয়ে পড়ল।

বদন দৌড়ে এসে কাটা জায়গাটার ওপরে শক্ত করে গামছা বেঁধে দিল। তারপর কালামানিক আর বদন গয়ারামকে তুলে বাড়ি নিয়ে এল। বাড়ির মেয়েরা চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল। পাড়ার লোকরা আর গ্রামের যারা খবর শুনল, সবাই ছুটে এল। সকলে স্তম্ভিত। অনেকেই সাপের ঈশ্বরী মনসা দেবীকে ডাকতে লাগল।



কেউ এক ওষুধ বলে, কেউ আরেক ওষুধ। শেষে ঠিক হল দু মাইল দূরের চন্দ্রহাটি গ্রামের নামকরা সাপের বদ্যিকে ডাকা হবে। তাদের বলে 'মাল'। তারা সাপ ধরে, সাপের কামড়ের ওষুধ দেয়। কিন্তু যতক্ষণ না সে এসে পৌঁছায়, ততক্ষণ কি করা যায়? একটিমাত্র কাজ বদন করল; পায়ের কব্জির ওপরে পা-টাকে কষে বেঁধে, ক্ষত-স্থানটা দুধ দিয়ে ধোয়াতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে শরীরে বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছিল। কখনো গয়ারাম বিষের জ্বালায় চিৎকার করছিল; কখনো বা নিস্তেজ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ছিল। তখন সকলে তাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছিল। গয়ারামের বয়স খুব কম; ভারি কোমল মিষ্টি ব্যবহার তার: কখনো কারো ক্ষতি করেনি সে; গাঁ সুদ্ধ সকলের তার জন্য সেকি সমবেদনা। বুড়িরা অনেক রকম ওষুধের কথা বলছিল। তার কিছু কিছু পরীক্ষা করে দেখাও হল। কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হল না।

তারপর চন্দ্রহাটির মাল এসে চিকিৎসা শুরু করল।

প্রথমেই যেন বিষ নামিয়ে দেবার জন্য গয়ারামের শরীরটা সে ওপর থেকে নিচে দলাই-মলাই করতে লাগল। ফুঁ দিল, অনেক মন্ত্র পড়ল। তার একটা এই রকম:

হায় মোর কি হল!
ঘটাইতে বিষ মল!
নাই বিষ, বিষারির আজ্ঞা!

অবিশ্যি শুধু মন্ত্র-তন্ত্র দিয়েই ওঝা থামল না। কতকগুলো গাছের শেকড় গুঁড়িয়ে গয়ারামকে খাওয়াল; একটা সাদা গুঁড়ো খাওয়াল, অ্যামোনিয়ার মতো দেখতে; যদিও ওষুধটার নাম সে বলল না। সারা রাত মাল আপ্রাণ চেষ্টা করল; ঠাকুর দেবতাদের, বিশেষ করে মহাদেবকে কত ডাকল। কখনো গায়ে মালিশ করে, কখনো মুখে ফুঁ দেয়, কখনো ওষুধ গেলায়। কিন্তু সবই বৃথা। ভোরের আগে গয়ারামের প্রাণটা বেরিয়ে গেল।

বদনের গরীব দুঃখী সংসার শোকে ভেসে গেল। বদনের মনে হতে লাগল তার ডান হাতটাই কাটা গেছে। গয়ারাম সবার ছোট ভাই হলেও, বয়সের তুলনায় সে বড় বিচক্ষণ ছিল ; বিপদের সময় সে-ই সব চাইতে সং-পরামর্শ দিত। বদনের চেয়ে কালামানিকের স্বভাব আরো চাপা ছিল। বাইরে থেকে যতই কাঠখোট্টা অসুন্দর দেখতে হক, ওর মনটা সোনার মত ছিল খাঁটি আর অত্যন্ত কোমল, স্নেহশীল। আদরের ছোট ভাইটি অকালে, এমন ভয়াবহ ভাবে চলে যাওয়াতে, তার দুঃখের আর শেষ ছিল না। সে দুঃখ বাইরে প্রকাশ পেত না বলে, ভিতরে ভিতরে গুমরে গুমরে তার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে লাগল।

আলঙ্গার দুঃখের কথা ভাষায় বলা যায় না। সবার ছোট ছেলেটি ছিল তার সব চাইতে আদরের। দিন রাত মায়ের কান্নার শেষ ছিল না। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আলঙ্গা বিলাপ করত। অনেক দিন অবধি চরকা ছোঁয়নি। সারা দুপুর কেঁদে কাটিয়েছিল। গ্রামের দূর অঞ্চল থেকেও সে বিলাপ শোনা যেত। কেবলি গয়ারামের রূপ-গুণের কথা বলে শোক।

কি শোচনীয় ভাবে গয়ারাম মরেছিল ভেবে আলঙ্গার দুঃখ শত-গুণ বেড়ে গিয়েছিল। এ কি অস্বাভাবিক মরণ। সাপের কামড়ে, বাজ পড়ে, আগুন লেগে, পড়ে গিয়ে, কেউ মারা গেলে, লোকে বলত এই সব দৈবাৎ আকস্মিক মৃত্যু হল কোনো পাপকর্মের জন্য দেবতাদের সাজা। আলঙ্গা ভেবে পাচ্ছিল না, এত লোক থাকতে, তাদের-ই বা কোন পাপকর্মের জন্য এমন সর্বনাশ হবে! মনে মনে আলঙ্গা কেবলি বলত, "আমরা কি দেবতাদের ভয় করি না, পুজো করি না? আমরা কি ব্রাহ্মণদের ভক্তি করি না? আমরা কি হিন্দু-ধর্মের সব নিয়ম মেনে চলি না? তবে কেন আমরা দেবতাদের কোপে পড়ব? কি এমন পাপ করেছি আমরা যে এমন মর্মান্তিক সাজা পেতে হল? হে বিধাতা, তোমার মনে কি আছে বল।"

আছুরীর শোক সব চাইতে বিষম, যদিও আলঙ্গার শোকের মতো স্বার্থশূন্য ছিল না। তার মন হতাশায় ভরে গিয়েছিল। তার বিবাহিত জীবনের এইখানেই শেষ। তার বয়স এত কম, তবু সারা জীবন তাকে বৈধব্য পালন করতে হবে। হিন্দুরা বলে মেয়েদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা হল স্বামীর সঙ্গ লাভে। সে সুখই যদি গেল, তবে বেঁচে থাকার কি মানে? সারা জীবন বিধবা হয়ে থাকতে হবে; এ কথা মনে করলেও আছুরীর সবচেয়ে বেশি দুঃখ হত। দুপুর না হতে তার জীবনের সূর্য ডুবেছে। সবার মনে আশা থাকে: শুধু তার-ই কিছু নেই। বাকি জীবনটা তাকে যদি জীবন বলা যায়— একটা অনন্ত অন্ধকার রাতের মতো, যার শেষে ভোরের আশা-ও নেই।

হিন্দু বিধবাদের সঙ্গে সকলের সহানুভূতি হতে বাধা। তাদের আত্মীয় বন্ধুরা যে সর্বদা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এমন নয়। তাদের সব চাইতে বড় দুঃখ হল যে হৃদয়ের স্নেহ-প্রীতি সখ-সাধ সব শুকিয়ে যায়। তাদের কোনো বিষয়ে আগ্রহ থাকে না; জীবনটা শূন্যময় হয়ে যায়। আলঙ্গার মতো আছুরী বিলাপ করে বাড়ি এবং পাড়া মাথায় করেনি; অমন অমায়িক স্বামীর গুণগানও করেনি। বিধবা মানুষ অমন করলে লোকে তার নিন্দা করত। আছুরীর দুঃখের ভাষা ছিল না। দিন রাত সে গুমরে কাঁদত। শাঁখা, গালার চুড়ি, রূপোর বালা আছুরী ভেঙে ফেলে দিল; লোহা খুলে ফেলল; চুল বাঁধা বন্ধ করল। সিঁদূর মুছল; পাড় দেওয়া কাপড় পরা ছাড়ল। এখন থেকে জীবনের কোনো আনন্দে তার ভাগ রইল না। জীবনের নাটকে তার ভূমিকা শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীতে বাস করবে বটে, কিন্তু এখন থেকে পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ইংরেজদের কেন জানি ধারণা যে হিন্দু বিধবারা শ্বশুরবাড়িতে মন্দ ব্যবহার পায়। কথাটা ঠিক নয়। দুটো একটা ব্যতিক্রম সব নিয়মের-ই থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ হিন্দু বিধবাদের সঙ্গে কেউ

খারাপ ব্যবহার তো করেই না, বরং তারা যথেষ্ট সমবেদনা পায়। অনেক সময়ই দেখা যায় হিন্দু পরিবারের বুড়ি বিধবারা পুরুষদের পরামর্শ দিচ্ছেন, কর্তব্য বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের একজন বুড়ি বিধবার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল; তিনি শুধু যে নিজেদের বাড়ির মাথা ছিলেন তা নয়, তাঁদের গ্রামে কোনো মতভেদ বা সমস্যা দেখা দিলে তাঁর কাছে সবাই মীমাংসার জন্য আসত।

এ রকম শুধু এক-আধবার দেখা যায় না। বুড় বিধবারা যদি বুদ্ধিমতী ও সচ্চরিত্রা হন, তাহলে সারা জীবনের অভিজ্ঞতার জোরে, তাঁরা অনেক কম-বয়সী পুরুষদের ওপরেও প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। আর বিধবারা বড়ই বঞ্চিত বলে যে কথাটা শোনা যায়, হৃদয়ের দিক থেকে সেটা খানিকটা সত্যি হলেও, অন্য দিক দিয়ে ততটা নয়। সত্যি কথা, তারা দিনে একবার মাত্র খায়। তবে পরিমাণে সে খাওয়াটা অনেক সময়ই সধবাদের খাওয়ার চেয়ে বেশি হয়। তারপর তারা বিকেলের দিকে পেট ভরে খায়; কয়েক ঘণ্টা পরেই ঘুমোতে যায়। তাই অনেকের-ই দিব্যি চেক্‌নাই শরীর। তাছাড়া ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চাষীরা আর বাংলার হিন্দু সিপাইরাও দিনে একবার-ই খায়। তাই বলে কেউ যেন না মনে করেন আমরা আদুরীর দুঃখটা কমিয়ে দেখবার চেষ্টা করছি। তার অবস্থা বাস্তবিক-ই শোচনীয়। যদিও শ্বশুরবাড়ির কেউ কেউ দুর্ব্যবহার করবে বলে কোনো ভয় ছিল না, তবু সমাজের কাছে সে এখন মৃত। আর সংসারে সে সত্যি করেই নিদারুণ ভাবে একা।

বদনের বাড়ির এই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর, গোবর্দ্ধনের জীবনের সমস্ত রূপ রঙ বদলে গেল। যদি লেখাপড়া আরো খানিকটা শিখতে পারত, তাহলে কি হত বলা যায় না। হয়তো কোনো জমিদারের মুহুরী, কি গোমস্তা, কি নায়েব হতে পারত। কিন্তু গয়ারামের অকাল মৃত্যুর জন্য সে আশা ছাড়তে হল। তার আর লেখাপড়া শিখবার

কোনো সম্ভাবনাই রইল না। গাই-বলদ দেখত গয়ারাম সে তো স্বর্গে গেল, এখন সে কাজ করে কে? বদন আর কালামানিককে চাষের কাজ দেখতেই হবে। বদনদের মতো চাষীর ঘরে, খুব ছোট ছোট মেয়েরা ছাড়া, বয়স্কারা কখনো মাঠে গিয়ে গোরু চরাত না।



কাজেই গোবিন্দর পাঠশালা যাওয়া বন্ধ করাই ঠিক হল। যোগ, বিয়োগ আর নাম লেখার পাঠ শেষ করেই তাকে পড়াশুনোয় ইস্তফা দিতে হল। তবে ইস্কুল, পাঠশালার বাইরেও একটা বড় বিদ্যালয় আছে; সেখানেও অনেক কিছু শেখা যায়। এবার দেখা যাক সেই বিদ্যালয়ে গিয়ে গোবিন্দ কি সুবিধা করতে পারল।



৬

গয়ারামের নিদারুণ আকস্মিক মৃত্যুর পর বদনের পরিবারের সকলে এক মাস অশৌচ পালন করল। যাদের সংসারে নিত্য অভাব, অশৌচের সময় তাদের খুব বেশি কষ্ট হয় না। তাহলেও কিছুটা অসুবিধা ভোগ করতে হয় বৈকি। বাঙালীদের দু বেলা মাছ ভাত খেয়ে অভ্যাস; সেই এক মাস সকলের মাছ বন্ধ। আলঙ্গার অবিশ্যি তাতে কিছু এসে গেল না, সে তো বিধবা হয়ে অবধি মাছ ছেড়েছিল। খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও. সামাজিক মেলামেশাতেও বাধা ছিল। তা ছাড়া চুল-দাড়ি কামানো বন্ধ; স্নানের সময় তেল-মাখা বন্ধ। সব চাইতে কঠোর নিয়ম পালন করতে হয় মৃতের স্ত্রী আর ছেলেদের। গয়ারামের ছেলেপিলে ছিল না, কাজেই আদুরী একাই সে নিয়ম পালন করল।

এক মাস সে একখানি থান পরে দিনরাত কাটাল। রোজ স্নানের পর গায়ে ভিজে কাপড় শুকোত; অন্যদের সঙ্গে শুত না। অন্যদের রান্নাও খেত না। নিজে রেঁধে খেত। অন্যরা যা খেত তা-ও খেত না। একটু দুধ ঘি দিয়ে আতপ চাল সেদ্ধ করে খেত। এই ভাবে ত্রিশ দিন কাটল।

ত্রিশ দিনের দিন সকলে শুদ্ধ হল। নাপিত এসে পুরুষদের কামিয়ে দিল। নাপতেনী মেয়েদের নখ কাটল। পুকুরে স্নান করে সকলে নতুন কাপড় পরল। পুরুত এল; শ্রাদ্ধ-শান্তি হল; তারপর ওরা আবার সামাজিক কাজকর্মে যোগ দিতে পারল।

গল্প বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই কুলগুরু, কুলপুরোহিত, বাড়ির নাপিত-নাপতেনী এদের কথা বলা হয়েছে। বিদেশীরা ভাবতে পারে গরীবের বাড়িতে আবার এত খরচ করা কেন। কিন্তু এই তিনজন মানুষ ছাড়া কোনো হিন্দু বাড়ির চলত না। হিন্দুদের সামাজিক জীবন মানেই নানান ধর্ম-অনুষ্ঠান; আর সবগুলিতেই ঐ তিনজনের কাজ থাকে।

এদের জন্য খুব একটা খরচ-ও হয় না। গঙ্গা নাপিত ১৫ দিন অন্তর এসে বদনের দাড়ি কামাত, চুল ছাঁটত। পরে গোবিন্দর-ও চুল ছাঁটত, দাড়ি কামাত। তার বৌ মাসে একবার এসে মেয়েদের নখ কেটে দিয়ে যেত : ঐ নাপতেনীর নামটি যে কি, তা কেউ বলতে পারল না। সবাই ডাকত "নাপতেনী"। এর জন্য তারা কি পেত? ফসল কাটার সময় আধ মণ ধান। সেকালে তার দাম ছিল হয়তো চার-ছয় আনা। তাছাড়া বিয়ে, শ্রাদ্ধ, জাতকর্ম ইত্যাদিতে কিছু বখশিশ পেত। পুরুত রামধন মিশ্র যাঁর মা সতী হয়েছিলেন, তিনি জন্মের সময়, বিয়েতে, শ্রাদ্ধে আর সব পুজো-পার্বণে বাড়ি-বাড়ি পুজো করে যেতেন। তার জন্য নৈবেদ্যের চাল-কলা ইত্যাদি আর ক্ষেতের ফল-তরকারি, আলু বেগুন, ভাল আখ, এইসব পেতেন।

আগুরীরা সাধারণতঃ শাক্ত হলেও, বদনরা ছিল বৈষ্ণব। কাজেই তাদের একজন গুরু বা গোসাই-ও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল বৃন্দাবন গোস্বামী; বাড়ি কাঞ্চনপুর থেকে অনেকখানি দূরে, আওগ্রামে। বছরে একবার তিনি শিষ্যবাড়ি আসতেন, যত না তাদের আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেন, তার চাইতে বেশি শিষ্যদের কাছ থেকে যতখানি পারেন টাকাটা সিকেটা আদায় করতেন সত্যি কথা বলতে কি, তিনি কোনো রকম উপদেশ-ই দিতেন না। শিষ্যের জীবনকালে তার জন্য তিনি একটি মাত্র কাজ করতেন। সেটি হল জীবনে একবার তার কানে কানে ফিসফিস করে কয়েকটা অর্থহীন কথা বলতেন, যেমন 'ক্লিং কৃষ্ণ', বা 'রিং ধুং' বা 'ধুং ফট'। সেগুলিকে নাকি বীজমন্ত্র বলে।

মনে মনেই হক, বা বিড় বিড় করেই হক, ঐ মন্ত্রটি রোজ ১০৮ বার জপ করতে হত।

বদনের বাড়িতে বছরে একবার যখন গোঁসাই আসতেন, বদন তাঁকে আট আনা দক্ষিণা দিত। নতুন করে কাউকে বীজমন্ত্র দেবার সময় তিনি আরো কিছু আশা করতেন। গুরুর কাজ আর পুরুতের কাজ কিন্তু এক ছিল না। অনেক সময় তাঁদের দুজনার মধ্যে চেনা-জানাও থাকত না। গুরু, পুরুত আর নাপিতের খরচ সব নিয়ে হয়তো সারা বছরে পড়ত তিন টাকা মতো। সেটুকু আর বদন দিতে পারবে না কেন।

তাহলে কথা হচ্ছে যে এত কম টাকায় ঐ তিনটি মানুষের-ই বা চলত কি করে? আসল ব্যাপার হল ওরা তো আর শুধু বদনের বাড়ির ব্যাপারেই আসত না, অনেক জায়গা থেকেই ওদের ডাক আসত। বদনের নাপিত হয়তো গ্রামের মধ্যে আরো একশো-জনের দাড়ি কামাত, কারণ সেকালে কোনো হিন্দু নিজের দাড়ি কামাত না। তেমনি বদনদের পুরুত-ও অনেক বাড়িতে পৌরহিত্য করতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ অবস্থাপন্নও ছিল, দিত খুব ভালো। তাছাড়া গুরুর শিষ্যরা শুধু কাঞ্চনপুরে নয়, আশে-পাশের একশোটা গ্রামে ছড়িয়ে থাকত। প্রত্যেকের কাছ থেকে তিনি বছরে একবার দক্ষিণা পেতেন। এঁরা কেউই খাওয়া-পরার জন্য জাত-ব্যবসার ওপর নির্ভর করতেন না। প্রত্যেকেরই কয়েক বিঘে জমিজমা ছিল; সেখানে তাঁরা লোক লাগিয়ে চাষ করাতেন। কাজেই এক রকম করে তাঁদের চলে যেত।

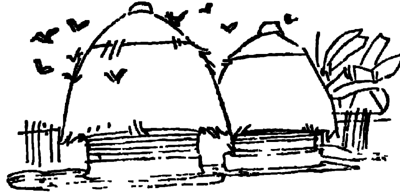
বাংলার গ্রামে চাষীরা ছাড়া, প্রায় সকলেই ধোপা দিয়ে কাপড় কাচাত। এই সব ধোপারাও বাপ-ঠাকুরদার আমোল থেকে এক্কেক বাড়ির কাজ করে আসত। তবে বদনের বাড়ির মেয়েরাই তাদের সব কাপড় কাচত। মাসে একবার ছিল ধোলাইয়ের দিন। বড় বড় হাঁড়িতে জলে গোরুর চোনা আর কলাগাছের ছাই—এতে খুব

ভালো ক্ষার হয়—মিশিয়ে, ময়লা কাপড় ভিজিয়ে রাখা হত। তারপর হাঁড়িসুদ্ধ উনুনে ফুটিয়ে নিয়ে, পুকুর পাড়ে একটা তক্তায় কিম্বা চ্যাপটা পাথরে আচ্ছা করে আছড়িয়ে, জলে ধুয়ে রোদে শুকনো হত। অবিশ্যি ব্যাপারবাড়িতে পরে যাবার খুব ভালো কাপড়-চোপড় থাকলে, সেগুলো ধোপাকে দিতেই হ'ত। আরেকটা কথাও মনে রাখা দরকার যে হিন্দুরা যে কাপড় পরে ঘুমোয়, তাকে বলে বাসি কাপড়। সে কাপড় অশুদ্ধ। তাই রোজ স্নানের সময় পরনের কাপড় কাচা হয়। গরীবদের হয়তো দুটি কাপড় থাকে না। কিন্তু সকলের গামছা থাকে। সেই গামছা পরে, কাপড়টি কেচে শুকিয়ে নিতে কোন অসুবিধা নেই। রোজ স্নান করে বাঙ্গালী চাষীরা, নিজেদের কাপড় কাচে। কাজেই স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে বাঙ্গালী চাষীদের মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চাষী পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

এদিকে আমাদের খুদে নায়ক তো রামরূপের পাঠশালায় ইস্তফা দিয়ে, প্রকৃতি-মায়ের বড় বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখাল। বর্ণমালা তালপাতা, কলাপাতা ইত্যাদিতে লেখার সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্ক রইল না। নামতার সুরের বদলে এখন সে ঝোপে-ঝাড়ে পাখির গানের সুর শুনত। যতদিন পাঠশালায় পড়ত, ততদিন তার সময় কি-ভাবে কাটত সে তো আমাদের জানাই আছে। এবার দেখা যাক গোবিন্দ বাড়ির রাখাল হয়ে তার দিন কেমন কাটছিল।

ভোরে কাক ডাকার আগে গোবিন্দ উঠে, মাচা থেকে খড় টেনে নামিয়ে, কালামানিকের সঙ্গে বসে মস্ত এক বঁটি দিয়ে সেগুলো কুচোত। তারপর খড়, জল আর খোল একসঙ্গে মিশিয়ে, উঠোনের কোণে খড়ের গাদার সামনে, মাটিতে বসানো চাড়িগুলোর মধ্যে ঢেলে দিত। গোরুদের খাবার সাজিয়ে দিয়ে, গোয়ালঘর থেকে গোরুগুলোকে বের করে এনে যার যার চাড়ির সামনে বেঁধে

দিত। গোরুরা অমনি খেতে শুরু করত আর গোবিন্দ গোয়ালঘরে ঢুকে, ঝুড়ি করে গোবর বের করে এনে উঠোনের এক কোণায় ঢিপি বাঁধে রাখত। তারপর গোয়ালঘরের সব আবর্জনা রান্নাঘরের



পিছনে ছাইগাদায় ফেলে দিত। এবার ঝাঁট দিয়ে, গোয়ালঘরটাকে পরিষ্কার তকতকে করে ফেলত। কোথাও জল জমে থাকলে, তার ওপর বেশ করে ছাই ছড়িয়ে দিত।

একটু পরেই গোরু দুইবার সময় হত। কিন্তু গোবিন্দ তখনো ছেলেমানুষ, এ কাজটা একা পারবে কেন। কিছুদিন পর্যন্ত ও শুধু বাছুরদের কান ধরে থাকত আর কালামানিক মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, হাঁটুর ফাঁকে দুধের বালতি চেপে ধরে, চ্যাঁ-চোঁ-গবর-গবর চ্যাঁ-চোঁ-গবর-গবর করে বেজায় তাড়াতাড়ি দুধ দুইয়ে ফেলত। দুধ দোয়া হলে, দুধের ভাঁড় আর একটা আধসেরী মাপ নিয়ে বামুন বাড়ি গিয়ে গোবিন্দ রোজ তাদের বরাদ্দ দুধ দিয়ে আসত। বাড়ি ফিরেই গোরু নিয়ে মাঠে যাবার জোগাড় করত। জোগাড় মানে ছোট্ট একটা মাটির ভাঁড়ে একটু তামাক নিত,—বলা বাহুল্য বারো বছর বয়সেই গোবিন্দ তামাক খেতে শিখেছিল—একটা বাঁশের চোঙায় একটু সরষের তেল নিত, একটা গামছায় কিছু মুড়ি বেঁধে নিত। তারপর গোরুর দড়ি খুলে, তাদের নিয়ে মস্ত এক দীঘির ধারে ঘাস-জমিতে ছেড়ে দিত। এর মধ্যে একদিন, সেখানে এক অশ্বত্থ-গাছের তলায় গোবিন্দর-ই মতো আরো চার পাঁচটি ছেলেও গোরু

ছেড়ে দিয়ে জটলা করছিল। ওকে দেখেই তারা বলে উঠল, "কিরে গোবি, কি ব্যাপার? আমরা ভাবলাম আজ বুঝি আর এলিই না!"

গোবিন্দ বলল, "ঐ একটু দেরি হয়ে গেল, ভাই। ভস্চাযি্যদের বাড়িতে দুধ দিতে গেলাম, তা অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখল। গিন্নী গেছিলেন চান করতে, বাড়িতে আর কেউ ছিল না যে দুধ নেবে।"

এক বন্ধু বলল, "মংলি আজকাল কত দুধ দেয় রে? আমার তো বিশ্বাস ছিল এবার দুধ দেওয়া বন্ধ করবে।"

গোবিন্দ বলল, "তার আর খুব দেরি নেই। তবে এখনো সকালে এক সের, বিকেলে এক সের দিচ্ছে।"

বন্ধু বলল, "ভারি লক্ষ্মী গোরু। জানিস, গোবি, মংলিকে তোর বাবা আমার বাবার কাছ থেকে কিনেছিল।"

গোবিন্দ বলল, "তাই নাকি? আমি-তো কই সে-কথা কখনো শুনিনি। কত দাম দিয়েছিল বাবা?"

বন্ধু বলল, "মাত্র দশ টাকা।"

গোবিন্দ বলল, "সে তো খুব সস্তা হল। খুব ভালো গোরু মংলি।"

"হ্যাঁ, খুবই সস্তা। বাবা প্রায় বিনি পয়সাতেই গোরুটা দিয়ে দিয়েছিল। জমিদারের খাজনা বাকি পড়েছিল কি না।"

আরেকটা ছেলে এই সময় বলে উঠল, "গ্যাখ্! গ্যাখ্! হনুমান আসছে! ওর হাতে ওটা কি রে, চটের থলির মতো?"

গোবিন্দ বলল, "আরে! এক থলি বড়ি দেখছি! কার বাড়ির চাল থেকে তুলে এনেছে কে জানে!"

অন্য বন্ধুটি বলল, "ঠিক তাই। ঐ গ্যাখ্ গাছে চড়ছে! এখন আমাদের মাথায় বড়ি ছুঁড়ে না মারলেই বাঁচা যায়!"

গোবিন্দ বলল, "তাহলে তো তোর খুসি হওয়া উচিত রে!

হনুমান হল রামের ভক্ত অনুচর। তোর মুণ্ডুটাই তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে!"

বন্ধু বলল, "বাঃ বাঃ বেড়ে বলেছে গোবিন্দ। দু'তিন বছর পাঠশালায় গিয়ে একেবারে পণ্ডিত বনে গেছে যে! তুই চিরজীবী হবিরে গোবি।"

গোবিন্দ বলল, "কি এমন বললাম যে অত খোঁটা দিচ্ছিস্, ভাই! আমি মোটেই নিজেকে তোদের চেয়ে পণ্ডিত মনে করি না।"

আরেকজন ছেলে বলে উঠল, "ভাখ্ ভাখ্, মা-হনুমান বুকের ওপর বাচ্চা ঝুলিয়ে কেমন আসছে!"

হঠাৎ একজন ছেলে চ্যাঁচাতে লাগল, "ওরে গোবি, তোদের মংলি যে পদ্ম পালের আখের ক্ষেতে নামল! সে দেখতে পেলে গাল দিয়ে তোর ভূত ভাগাবে!"

তাই শুনে মংলির উদ্দেশে গোবিন্দও চ্যাঁচাতে লাগল, "হেই! হেই! মংলি! যাসনি বলছি ওখানে, পাজি মেয়ে!"

গোবিন্দর বন্ধু বলল, "তোর কথা কি আর ও কানে তোলে! ঐ ভাখ্, ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে গেল বলে!"

গোবিন্দ অমনি সেদিকে ছুটল। খানিক বাদে গোরু নিয়ে ফিরেও এল। কিন্তু ক্ষেতের মালিক পদ্ম পাল ঐ সময়ে এসে উপস্থিত হওয়াতে খানিকটা গালি-ও খেতে হল।

তারপর ছেলেরা পাঁচজন মিলে হনুমানগুলোর দিকে মাটির ঢেলা ছুঁড়তে লাগল। হনুমানদের সঙ্গে ছিল পালের গোদা, যেমনি প্রকাণ্ড, তেমনি হিংস্র। ঢেল খেয়ে পালের গোদা গেল ক্ষেপে; ল্যাজটাকে তুলে মাথার ওপর দিয়ে প্রায় গোল করে আনল। তারপর হুপ্—হুপ্—হুপ্ করতে করতে ডাল থেকে ডালে লাফাতে লাগল। শেষে একটা ডালে বসে দাঁত খিঁচিয়ে বুকের ভেতর থেকে বিকট একটা খাকর! খাকর! খাকর! আওয়াজ করে ছেলেদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করল। কিন্তু ছেলেগুলো আরো মাটির ঢেলা

ছোড়াতে, রণে ভঙ্গ দিয়ে, গাছ থেকে নেমে দূরে আরেকটা গাছের দিকে ছুটল। মা-হনুমান-ও তার বাচ্চা নিয়ে পিছন পিছন ছুটল।

হনুমানরা গেল, গোবিন্দ আর তার বন্ধুরা যে যার গামছায় বাঁধা মুড়ি খেতে বসল। খাওয়ার পর তারা খানিক ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে বেড়াল: ফলের খোঁজে গাছে চড়ল। বৈঁচি পেড়ে খেল; চারদিকে বৈঁচি গাছের অন্ত ছিল না। টক টক করমচা পেড়ে খেল। তবে সবচেয়ে যে ফল পছন্দ ছিল, তার নাম ফলসা। প্রকাণ্ড এক ফলসা গাছ-ও ছিল ওখানে। ওরা সেই গাছ বেয়ে উঠে হনুমানের মতো ডালে ডালে বসে মিষ্টি ফলসা খেতে লাগল।

খানিক বাদে আবার নেমে এসে গোরুগুলোকে এক জায়গায় এনে জড়ো করল। ইতিমধ্যে তারাও এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর যে যার বাঁশের চোঙা থেকে সরষের তেল ঢেলে বেশ করে গায়ে মাখল। তারপর পুকুরে স্নান। পুকুরে নানা রকম জলজ গাছ; তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর দেখতে হল রক্তকমল, লাল পদ্মফুল। ছেলেগুলো মুঠো মুঠো নানা রকম পদ্মফুল তুলে, কোনোটার কোষ, কোনোটার বোঁটা খেল। ভোজ শেষ হলে, জল থেকে উঠে গামছা ছেড়ে আবার ধুতি পরে নিল। ধুতিগুলো রোদে মেলে দেওয়া হয়েছিল, ততক্ষণে শুকিয়েও গেছিল।

তারপর গোবিন্দ বলল, "আমি ভাই, ভাত খেতে বাড়ি গেলাম, আমার গোরুগুলো তোরা দেখিস্। আমার হয়তো ফিরতে দেরি হতে পারে। পুবের মাঠে বাপ-কাকার ভাত নিয়ে যেতে হবে। তবে আমার আগেই শম্ভু ফিরে আসবে, তখন তোরা তিনজন ভাত খেতে যাস্।" এই বলে গোবিন্দ আর সেই গল্প-বলা বুড়ির ছেলে শম্ভু বাড়ি চলে গেল। বাড়িতে ভাত খেয়ে, পুবের মাঠে গিয়ে বাপ-কাকাকে খাইয়ে, গোবিন্দ অশ্বত্থ-গাছের তলায় ফিরে এসে দেখল শম্ভু একা বসে আছে। বাকি তিনজন খেতে গেছে।

খানিক বাদে তারাও ফিরে এল। দুপুরটাও কাটল সকালের

মতো করেই—কখনো অন্য লোকের ক্ষেত পাছে নষ্ট করে তাই গোরুর পেছন পেছন দৌড়ে, কখনো গাছে চড়ে লাফালাফি করে, কখনো গান গেয়ে, কখনো বা হাডুডুডু খেলে। তবে বিকেলের আসল কাজ ছিল গোবর কুড়িয়ে যার যার ঝুড়ি বোঝাই করা। সেটি না করলে, বাড়ি ফিরে মা-বাপ, গুরুজন, মুনিব ইত্যাদির কাছে বকুনি খেতে হত।

ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছিল, দূরের তাল-গাছের মাথায় মাথায় তার শেষ রশ্মি লেগেছিল। এই হল গোধূলি; এই সময় গোরুর পাল ঘরে নিয়ে যেতে হয়।

রাখাল-ছেলেরা মাথায় একেক ঝুড়ি গোবর, ডান হাতে পাঁচন-বাড়ি নিয়ে, যে-যার গোরুর পালের পিছন পিছন চলল। কখনো তারা চেঁচিয়ে গোরুগুলোর চলার বেগ বাড়াবার চেষ্টা করছিল; কখনো বা যে-সব গোরু পথ ছেড়ে বে-পথে যাচ্ছিল, তাদের ডেকে ফেরাচ্ছিল। সারা পথ জুড়ে ওরা চলেছিল, একেক সারিতে কখনো চারটে কখনো পাঁচটে গোরু চলেছিল, পথ-ও যেমন কোথাও সরু কোথাও চওড়া। পথে জল দেওয়া হত না; চার দিক গোরুর খুরের ধুলোতে ধুলোময়। গাঁয়ের মেয়েরা কলসী ভরে জল নিয়ে ঘরে চলেছিল; তাদের সামনে দিয়ে পথ জুড়ে গোরুর পাল চলেছিল; মেয়েরা পথের ধারে সরে গিয়ে তাদের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিল।

এই ভাবে গোবিন্দ গোরুর পাল ঘরে আনল। ঘরে এনে তাদের গোয়ালে তুলে যার যার নিজের জায়গায় বেঁধে রাখল। তারপর খড়ের কুচি, খোল, জল দিয়ে মেখে ওদের খেতে দিল। কালামানিক এসে দুজনে মিলে কয়েকটা গোরু দুইল। গোয়ালের কোণে ঘুঁটের আগুন ধরিয়ে, মশা পিশু তাড়াবার জন্য গোবিন্দ খুব খানিকটা ধোঁয়া করল। তারপর সে রাতের মতো গোয়াল বন্ধ করে দিল।

হিন্দুরা জাত মানত বলে সকলের সঙ্গে সকলে সমান ভাবে মিশতে পারত না। আগুরীরা অন্য জাতের সঙ্গে খেত-ও না, তাদের



মেয়েও বিয়ে করত না। বাংলার ছত্রিশ জাতের হিন্দুদের এই একই অবস্থা। তবে খাওয়া-দাওয়া আর বিয়ে করা বাদ দিলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব আর সহানুভূতি ছিল। একজন আগুরীর সব চাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়তো গয়লা কিম্বা সদ্গোপের ছেলে। কিন্তু তারা একসঙ্গে খেতে বসত না। সায়েবরা এটা কল্পনাই করতে পারে না। একসঙ্গে না খেলে কি রকম বন্ধুত্ব হল, ওরা ভেবেই পায় না। গ্রাম-বাংলার চাষীদের আর নানারকম জাত-ব্যবসায়ীদের ছেলেদের মধ্যে চিরকালের মতো বন্ধুত্ব পাতানো কিছুই আশ্চর্য ছিল না। এ ধরনের বন্ধুত্ব ভারি নির্মল ; এতে স্বার্থের নাম-গন্ধও থাকত না। কোনো চাষীর ছেলে অন্য চাষীর ছেলের, কিম্বা কোনো কারিগরের ছেলের সঙ্গে চিরকালের মতো বন্ধুত্ব পাতালে, দুই দিকের মা-বাপ, আত্মীয়স্বজন সবাই জানত : দুজনে দুজনাকে ছোটখাটো কিছু উপহার দিত। বন্ধুত্বটাও পাকাপাকি হল। অনেকে বলত 'মিতালী পাতানো'।

তারপর থেকে তারা পরস্পরকে নাম ধরে না ডেকে, সর্বদা 'বন্ধু' বলে ডাকত, বাড়িতেও আর বাইরেও। অনেক সময়ই বাংলার চাষীর ছেলেদের তিনটি সমান অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকত। তাদের আবার আলাদা নাম ; একজন হল সঙ্গৎ, যাকে চলিত ভাষায় বলে স্যাঙাৎ ; একজন হল বন্ধু ; একজন হল মিতা ; তিনটি কথার এক-ই মানে, অর্থাৎ বন্ধু। সঙ্গৎ কিন্তু চিরকাল সঙ্গৎ-ই থাকত। তাকে কখনো বন্ধু বলা হত না। তেমনি বন্ধুর আর মিতার নাম-ও বদলাত না। এই নামের তফাতে কিন্তু বন্ধুত্বের কম বেশি বোঝাত না ; সবাই সমান। দুজনার এক নাম হলে সাধারণতঃ তারা পরস্পরকে 'মিতা' বলত। তবে এক নাম না হলেও 'মিতা' হতে পারত।

গোবিন্দর-ও এই রকম তিনজন বন্ধু ছিল, সবাই প্রায় সমবয়সী। গোবিন্দর সঙ্গতের নাম ছিল নন্দ, তার বাবা ছিল কাঞ্চনপুরের কামার, কুবের কর্মকার। কুবের মানুষটা ছিল রোগা লম্বা, কিন্তু ভারি

বলিষ্ঠ, জোরালো। কপালটা উঁচু, নাকটা বাঁকা, নাকের ওপর জোড়া ভুরু; কোটরে বসা চক-চকে চোখ। থেকে থেকেই সে নিচের ঠোঁট দিয়ে ওপরের ঠোঁটটা চেপে ধরত—সবাই বলত সেটা নাকি মনের জোরের প্রমাণ। কুবের বোধ হয় গ্রামের মধ্যে সব চাইতে পরিশ্রমী ছিল। কাঞ্চনপুরে আর কোনো কামার না থাকাতে,



ওর কাজের আর শেষ ছিল না। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কামারশালায় আগুন জ্বলত। থেকে থেকেই নেহাইয়ের ওপর আগুনের আঁচে লাল টকটকে বড় বড় লোহার টুকরো বসিয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে দরকার মতো আকার দেওয়া হত। কামারশালায় সর্বদা কাজের লোকের ভিড়। কাটারি, কাস্তে, লাঙ্গলের ফলা, কুড়ুল, কোদাল, সব কিছু মেরামত করাতে লোক আসত। একজন মেয়ে বঁটিতে দাঁত কাটাতে নিয়ে এল। পাঠশালার এক পোড়ো এল, হাতে একটু ইস্পাত নিয়ে; তাই দিয়ে তার ছুরিটার ধার ঠিক করে দিতে হবে। একদল চাষীর ছেলে বসে আছে তো বসেই আছে; কুবের তাদের জন্য বঁড়শী তৈরি করে দেবে বলেছে। কুবেরের ছেলে নন্দ বাপকে সাহায্য করত; দুজনার চেহারা অবিকল এক। নন্দর হাতের কাজ বড় ভালো ছিল। সবাই বলত নন্দ একদিন বর্ধমান জেলার সেরা কামার হয়ে উঠবে, প্রায় বিশ্বকর্মার সামিল হবে। নন্দর ষোল বছর বয়স; সে হল গোবিন্দর সঙ্গত: গোয়ালঘরের কাজ সেরে প্রায় রোজ সন্ধ্যায় গোবিন্দ কামারশালায় গিয়ে নন্দর সঙ্গে দেখা করত।

এই তো গেল গোবিন্দর সঙ্গতের কথা। গোবিন্দর বন্ধু হল

কপিল। কপিলের বাবা ছিল ছুতোর, নাম সাগর মিস্ত্রী। সাগর কখনো কলকাতায় যায়নি, তার কাজ ছিল গ্রামের প্রয়োজন মেটানো। কাজেই চেয়ার টেবিল সে তৈরি করত না। ও-সব আসবাব কয়েকজন সায়েবী কেতার শৌখীন ভদ্রলোক ছাড়া কেউ ব্যবহার করত না। কিন্তু সাগর চমৎকার খাট তৈরি করত। খাটের মাথার দিকটাতে সুন্দর কারিকুরি করা থাকত; খাসা বাক্স তৈরি করত, ছোট বড় নানা মাপের, নানা রকম কাঠ দিয়ে। কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি করত; রকমারি টুল বানাত। দরজা-জানলার চৌকাঠ, পাল্কি ইত্যাদি যা বানাত, সে-রকম জিনিস বর্ধমানেও পাওয়া যেত না। কি মিহি তার কাজ, প্রায় কলকাতার কপালিটোলার সমান।

কিন্তু যে-কাজে সাগর ছিল সব চাইতে ওস্তাদ সে হল ঠাকুর গড়ায়। কলকাতায় ঠাকুর গড়ে কুমোররা, কিন্তু কাঞ্চনপুরের ঠাকুর গড়ত ছুতোর মিস্ত্রীরা। তাই প্রত্যেক বছর পুজো-পার্বণে সাগরের ডাক পড়ত। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময়। সাগরের হাতে গড়া দুগ্‌গো ঠাকরুণের কোনো খুঁৎ, কেউ বের করুক তো দেখি। গ্রামের লোকে এর চাইতে নিখুঁত মাটির প্রতিমা ভাবতেই পারত না। কাঞ্চনপুরের জমিদার বাড়ির পুজোর জন্য সাগর যে মা-দুর্গা, তাঁর ছেলেমেয়ে, সঙ্গী সাথী বানাত, তাই দেখে সারা গাঁয়ের লোকের মুখে কথা সরত না। মেয়ে-বৌরা বলত শুধু নড়া-চড়া আর কথা বলা টুকুই বাকি, তাহলে আর জলজ্যান্ত দেব-দেবী হয়ে যেতে কিছু বাকি নেই! মূর্তিগুলির পেছনে চালচিত্রটি দেখে সকলে মুগ্ধ, এমন আঁকা তারা জন্মে দেখেনি।

কাঠের আসবাব আর মাটির প্রতিমা তৈরি আর চালচিত্রে রঙ দেওয়া ছাড়াও সাগরের আরো কেরামতি ছিল। ওর বাড়ির মেয়েরা চিঁড়ে তৈরি করে বিক্রি করত। অন্যান্য জেলায় কি হত বলতে পারছি না, কিন্তু বর্ধমানে, অন্ততঃ কাঞ্চনপুরে, ছুতোররাই সর্বদা চিঁড়ে তৈরি করত, বেচত। যদিও ছুতোরের কাজের সঙ্গে চিড়ের কি

সম্পর্ক সেটা বলা মুশ্‌কিল। বাংলার চাষীদের চিঁড়ে নইলে চলে না। দই দিয়ে গুড় দিয়ে তারা চিঁড়ে খাবে। শুকনো খোলায় চিঁড়ে ভেজে খাবে। বাংলার বদ্যিরা বলতেন এমন ভাল রুগীর পথ্য আর হয় না। গোবিন্দর বন্ধু কাপল যেমন ভালো কাঁঠাল-কাঠের পিঁড়ি বানাত, তেমনি খাসা দুর্গার গায়ে রঙ লাগাত আর তেমনি চমৎকার চিঁড়ে চ্যাপ্টা করত।

নন্দ আর কপিল ছাড়া গোবিন্দর আরেক বন্ধু ছিল। সে হল গোবিন্দর মিতা মদন, গ্রামের মুদী কাশী দত্তর ছেলে। বিলেতের মুদীরা নাকি চা, চিনি, মশলা, কফি, মদ, ফল ইত্যাদি বিক্রি করে। কলকাতার মুদীরাও মাঝে মাঝে কলা, নারকেল বেচে। কাশী দত্তর দোকানে কোনো রকম ফল-পাকুড় থাকত না। মদ-ও থাকত না। যদি কখনো সে মদ রাখার চেষ্টা করত, তাহলে গাঁয়ের লোকেরা নিশ্চয়ই ওকে একঘরে করত। তাছাড়া ওর জাত যেত। কফি জিনিসটার নাম-ও ও-গাঁয়ের কেউ শোনেনি। তবে কাশীর দোকানে মশলা পাওয়া যেত। চিনিও হয়তো থাকত বলে মনে হয়, কিন্তু গুড়ের আকারে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। চায়ের নাম হয়তো কাশী শুনেছিল, কিন্তু দোকানে রাখত না; কারণ গাঁয়ের কেউ চা খেত না, এমনকি জমিদার মশাই-ও না।

তাহলে কাশী দত্তর দোকানে থাকতটা কি? থাকত ধান, চাল, নানারকম ডাল, নুন, সরষের তেল, নারকেল তেল, আদা, হলুদ, তামাক, গোলমরিচ, ধনে, জিরে, পান, সুপুরি, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, জায়ফল, ঝোলো-গুড় ইত্যাদি। মদন দোকানে তার বাপকে সাহায্য করত। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় লোকের বাড়ি গিয়ে বাকির টাকা আদায় করত। এই ছেলে ছিল গোবিন্দর মিতা। কারণ যদিও তাকে সবাই মদন বলে ডাকত, ওর কুষ্ঠির নাম ছিল গোবিন্দ।

এরাই ছিল গোবিন্দর তিনটি প্রাণের বন্ধু। এদের সঙ্গেই ওর

নিত্য মেলামেশা : এদের কাছেই ওর মনের সব গোপন কথা, সব দুঃখের কথা গোবিন্দ বলত। ওরাও বলত। এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়াও, আরও তিনটি ছেলের সঙ্গে গোবিন্দর ভাব ছিল। একজন হল গঙ্গা নাপিতের ছেলে চতুর। কিছু দিন থেকে সেও লোকের চুল-দাড়ি কামানো ধরেছিল : যদিও তখন পর্যন্ত নাপিতগিরির সবচাইতে শক্ত কাজটিতে সে খুব দক্ষ হয়ে ওঠেনি। সে কাজটি হল লোকের নখ কাটা। তবু সকলেই বলত চতুর হল নাপিতকুলের যোগ্য বংশধর। চুল-দাড়ি কামানো ছাড়া, চতুর বাপের মত অন্য দিক দিয়েও অস্ত্র চালাতে শিখেছিল। সেকালের নাপিতরাই ফোড়া কাটা ইত্যাদি শল্য-চিকিৎসায় ওস্তাদ ছিল। এদিক দিয়ে চতুরের ভারি সুখ্যাতি শোনা যেত। এই অল্প বয়সে, এত কম অভিজ্ঞতা, তবু চতুর যেভাবে ফোড়া কাটত, দাঁত তুলত, কড়া কাটত, চাষীদের পায়ের তলা থেকে কাঁটা ওঠাত, হাড় সরে গেলে হাড় বসাত, তা দেখলে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকত না যে সময়কালে চতুর বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে

বাপের সঙ্গে সঙ্গে চতুর, জন্ম বিয়ে মরা, এই তিন ব্যাপারের ক্রিয়া-কর্মে পাকা হয়ে উঠেছিল। আগেই বলা হয়েছে নাপিত ছাড়া কোন হিন্দু ক্রিয়া-কর্মই সম্ভব নয়। লোকে বলত জানোয়ারের মধ্যে শেয়াল, পাখির মধ্যে কাক আর মানুষের মধ্যে নাপিত সব চেয়ে চালাক। চতুরের-ও এত বুদ্ধি ছিল যে যারা ওকে ভাল করে চিনত তারা সকলেই বলত যে পাঠশালায় না পড়লে কি হবে, চতুরের ক্ষুরেও যেমন ধার, বুদ্ধিতেও তেমন।

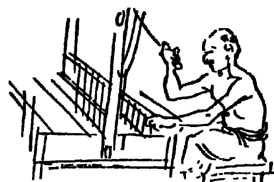
গোবিন্দর আরেক বন্ধু হল ময়রার ছেলে রসময়। বাংলার মধ্যবিত্তরা আর বড়লোকরা যত মিষ্টি খায়, পৃথিবীর আর কেউ তত খায় বলে তো জানি না। অন্য দেশের ছেলেপিলেরা টুকিটাকি মিষ্টি খায় বটে, কিন্তু বাংলায় পুরুষ মেয়ে ছেলেপুলে সবাই মিষ্টি খায়। এমন কি কোনো কোনো ভোজের ব্যাপারে আগাগোড়া মিষ্টি

ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কাজেই কাকের মতো এ রাজ্যে ময়রাও অগুন্তি। কাঞ্চনপুরও এক রকম মিষ্টির জন্য বিখ্যাত ছিল; সে-মিষ্টি বাংলার আর কোনো গ্রামে এত ভালো হত না। সেকালে বর্ধমানের ওলা, চন্দননগরের রসগোল্লা, মানকরের কদমা, খনিয়াখালির খইচুর, শান্তিপুরের মোয়া, বীরভূমের মোরব্বা, বিষ্ণুপুরের মতিচুর, অম্বিকার শুঁয়োভোলা-মণ্ডা যেমন বিখ্যাত ছিল, তেমনি ছিল কাঞ্চনপুরের খাজা। খাজাকে মিষ্টির রাজা বলা চলে। ওলা ছাড়া বর্ধমানের খাজার-ও খুব নামডাক ছিল, কিন্তু যারা ভেতরের খবর রাখত, তারা সবাই জানত যে বর্ধমানের খাজার কারিগররা সকলেই কাঞ্চনপুরের লোক। তাদের মধ্যে রসময়ের বাবাই ছিল সবার সেরা।

তবে বদন ছিল গরীব চাষী, স্ত্রীপুত্রের জন্য মিষ্টি কেনার পয়সা সে কোথায় পাবে? কাঁচা গুড় আর মুড়কি ছাড়া অন্য মিষ্টি খেত না ওরা। আর পালে-পার্বণে পাটালি। তবে ভাগিস গোবিন্দর সঙ্গে রসময়ের বন্ধুত্ব হয়েছিল, তার জন্য মাঝে মাঝেই ওকে যেরকম মিষ্টি বড়লোকেরা খেত, তার-ই কিছু কিছু উপহার দিত—বিশেষ করে মিষ্টির রাজা খাজাও দিত।

গোবিন্দর তৃতীয় বন্ধু হল তাঁতীর ছেলে বোকারাম। বোকারামের বাপকে দিয়েই আলঙ্গা নিজের হাতে কাটা সুতোয় গোবিন্দর প্রথম ধুতি বুনিয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত গোবিন্দ উদোম হয়েই ঘুরে বেড়াত। বিলেতের তাঁতীরা নাকি বড় বেশি চালাক, কিন্তু আবহমানকাল থেকেই বাংলার তাঁতীরা বোকামির জন্য খ্যাত। সে দিক দিয়ে এরা ছিল নাপিতদের ঠিক উল্টোটি। বোকারাম এত বেশি বোকা ছিল যে তার জন্য ওদের জাতের বদনাম হবার কোনো ভয় ছিল না। ওর বন্ধুরা বলত যে ভগবানের আসলে একটা গাধা বানাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে বোকারামকে বানিয়ে ফেলেছিলেন। মাথাটা নিরেট হলে কি হবে, ওর মনটা

ছিল বেজায় ভালো ; বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য করবার জন্য ও কি না করতে পারত। গোবিন্দ কখনো কোনো বিষয়ে ওর পরামর্শ চাইত না কারণ ওর বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর তার খুব আস্থা ছিল না ; কিন্তু এমন নির্মল খাঁটি মনের এমন সৎ আর সরল স্বভাবের যে অনেক মূল্য, সে কথা গোবিন্দ জানত।



মোটের ওপর গোবিন্দর বন্ধু নির্বাচন করার ক্ষমতার প্রশংসা করতে হয়। প্রত্যেকের-ই একটা না একটা মহৎ গুণ ছিল। নন্দর কি শক্তি, কি বলিষ্ঠতা, কি রকম খাটতে পারত : কপিল কি ভালো কারিগর, কেমন রুচি তার ; মদন ভারি বিচক্ষণ, চতুর ভারি বুদ্ধিমান, রসময় সদা প্রফুল্ল আর বোকারাম খাঁটি মানুষ।

এক গ্রীষ্মের দুপুরে কাঞ্চনপুরের লোকদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা দেখা গেল। সেদিন সকালে পদ্মলোচন পালের ছয় বছরের মেয়ে যাদুমণি অন্য ছোট মেয়েদের সঙ্গে খেলবে বলে তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল। ছোট ছেলেমেয়েরা রোজই সকালে নটা নাগাদ খেলা রেখে বাড়ি গিয়ে মুড়ি-মুড়কি কিম্বা দুধ খেত। যাদুমণিও রোজ ঐ সময় এসে খেয়ে যেত। সেদিন কিন্তু সে এল না। তার মা একটু ব্যস্ত হয়ে বড় মেয়েকে বলল, "হ্যাঁরে, যাদুমণি কোথায় ? সে তো খাবার খেতে এল না !" বড়-মেয়ে বলল, "ঘণ্টাখানেক আগেও তো দেখেছিলাম ; রাস্তায় খেলছে বোধ হয় অন্য মেয়েদের সঙ্গে।"

মা তখন সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল, "যাদুমণি ! ওলো যাদু ! খাবার খেয়ে যা রে !" কোনো উত্তর নেই। পথ দিয়ে

দু-একটা লোক যাচ্ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল যাদুমণিকে তারা কেউ দেখেনি। পদ্ম পাল চণ্ডীমণ্ডপে বসেছিল; স্ত্রীর গলা শুনে দরজার কাছে এসে সে বলল, "এত ব্যস্ত হবার কি আছে? কোথাও খেলতে গেছে নিশ্চয়, কামারশালায় কিম্বা বামুন বাড়িতে। আসবে'খন একটু বাদেই। তুমি ভেতরে যাও।" পদ্ম পালের স্ত্রী ভেতরে গেল বটে, কিন্তু কেমন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় মনটা তার ভারি হয়ে রইল। ভেতরে গিয়ে সে রান্নাবান্নায় আবার হাত দিল, কিন্তু সেদিকে তার মন ছিল না। শরীরটা রান্নাঘরে রইল বটে, মনটা গাঁয়ের আনাচে কানাচে মেয়েকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

বেলা প্রায় বারোটা বাজে তখনও যাদুমণি খেতে এল না। তার মা বেচারা ভাবনার চোটে দশবার রান্না ফেলে দোরগোড়ায় এসে পথে যাকে দেখেছে তাকেই জিজ্ঞাসা করেছে যাদুমণিকে দেখেছে কি না। আরো ঘণ্টাখানেক গেল। দুপুরের ভাত খাবার সময় হয়ে এল, তখনো মেয়েটার কোনো খবর নেই। এবার পদ্ম পাল নিজেও ভাবিত হয়ে পড়ল। ওর স্ত্রী বেচারির চোখ ভরা জল, বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকি পড়ছে, ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেছিল।

শেষটা আর থাকতে না পেরে, সে কেঁদে উঠল, "ওরে আমার যাদুমণিরে! মানিক আমার, ধন আমার! খেতে আসছিস না কেন? কোথায় গেলিরে মা?" কান্না শুনে পাড়ার ছেলে বুড়ো বুড়ি সবাই দৌড়ে এল। যাদুমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না, এই খবর শর-বনে আগুনের মতো গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল। ভাত খাবার কথা ভুলে সকলে মেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। পদ্ম পালের বিপদের সঙ্গে সকলের সহনাভূতি। বাঙালীদের এই রকম স্বভাব, তা যে যাই বলুক। প্রত্যেক রাস্তা, প্রত্যেক বাড়ি, ঝোপ-ঝাপ, আম বন, তেঁতুল-বাগান, কলা-বাগান, একেবারে গ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত দেখা হল। গাঁয়ের সব পুকুরের সব ঘাট দেখা হল। পদ্ম পালের বাড়ির

কাছের ছোট ছোট কয়েকটা পুকুরে জাল ফেলা হল। অনেক মাছ উঠল, কিন্তু যাত্নমণির দেহ উঠল না। গাঁয়ের লোকের সে কি দুঃখ। অনেকের সেদিন দুপুরের খাওয়া মাথায় উঠল, খুঁজে খুঁজে সব হয়রান হল। আবার দলে দলে সব নানা দিকে নতুন করে খুঁজতে বেরুল। জেলেরা তাদের সব চাইতে বড় জাল বের করে বলতে লাগল গ্রামের প্রত্যেকটি পুকুর দেখবে। অগুন্তি পুকুর, সব খোঁজা একদিনের কর্ম নয়। গাঁয়ের প্রত্যেকটি কোণা খোঁজা হল, কিন্তু সবই বৃথা। মেয়ের মা মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি করে কাঁদতে লাগল, কাটা পাঁঠার মতো ছট-ফট করতে লাগল। গ্রামের সীমানায় তেঁতুল গাছের পেছনে সূর্য ঢলে পড়ল ; তখন পর্যন্ত যাত্নমণির কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গ্রামসুদ্ধ সকলে আতঙ্কে অস্থির।

এদিকে এ বইয়ের নায়ক গোবিন্দ সামন্ত গোরু নিয়ে সারা দিন কাটিয়েছিল। গ্রামের সীমান্তে খানিকটা পতিত জমিতে সেদিন গোরুগুলো চরাচ্ছিল। দুপুরে অল্পক্ষণের জন্য ভাত খেতে বাড়ি এসে, গোবিন্দ পদ্ম পালের মেয়ে হারানোর কথা শুনে গেছিল। গোবিন্দ আর তার বন্ধুরা পদ্মকে বলত পদো পাল। পদো পালের আখের ক্ষেতেই মংলি একদিন ঢুকেছিল। গোবিন্দ যেখানে গোরু চরাচ্ছিল, তার কাছেই ওর বাবা আর কাকা ক্ষেতে কাজ করছিল। এর আগেও বলা হয়েছে বদনের জমিগুলো সব এক জায়গায় না হয়ে, নানা দিকে ছড়ানো ছিল।

সূর্য ডোবার সময় হলে গোবিন্দ গোরু নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল। সারি বেঁধে গোরুগুলো কৃষ্ণসাগরের উঁচু বাঁধে চড়ে, ওধার দিয়ে নেমে জলের কাছে গেল। একটা গোরু জল খেতে সামনের পা দুটি জলে ডুবিয়েই, যেন চমকে উঠে আবার পাড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। তার পরের গোরুটাও ঠিক সেইখানে নেমে, জল খাবার জন্ম মুখ নামিয়েই, আঁৎকে উঠে এক দৌড়ে পাড়িতে চড়ল। তাই দেখে গোবিন্দর মনে হল, নিশ্চয় অস্বাভাবিক কিছু দেখে গোরু দুটো

ভয় খেয়েছে, নইলে তেষ্টা পেয়েছে, তবু জল না খেয়েই ফিরে যাচ্ছে কেন।

গোবিন্দ-ও সেখানে নেমে দেখল পাড় থেকে কয়েক গজ দূরে, দামে জড়িয়ে একটা মড়া ভাসছে। বাপ কাকা পিছনেই ছিল, গোবিন্দ তাদের ডাক দিতেই. তারা ছুটে এসে ওর পাশে দাঁড়াল। ছোট্ট শরীর. মাথা-ভরা কালো চুল; ছোট মেয়ের দেহ সন্দেহ নেই। সে দেহ যে কার তা আর বলে দিতে হল না। যাদুমণিকে ওরা সকলেই অনেকবার দেখেছিল। খবর পেয়েই দেখতে দেখতে গাঁ সুদ্ধ সকলে এসে পুকুর-পাড়ে জড়ো হল। এখন মৃতদেহটাকে পাড়ে আনা যায় কি করে? কৃষ্ণসাগরকে সকলে শ্রদ্ধা ভয়ের সঙ্গে দেখত। স্নানের ঘাটে ছাড়া আর কোথাও পা ডোবাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। ঘাটগুলো অবশ্য সব ভাঙাচোরা। পুকুর-ধারে শত শত লোকের ভিড়। তার মধ্যে কারো এত সাহস ছিল না যে বলে, 'আমি গিয়ে ওকে তুলে আনছি।' কালামানিকের মতো সাহসী ও-গ্রামে কেউ ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে-ই জলে নেমে, সাঁতরে গিয়ে যাদুমণির মৃতদেহ ডাঙায় তুলে আনল। তাকে দেখে সকলে আর্তনাদ করে উঠল। আহা, ও যে যাদুমণি তাতে কোনো ভুল নেই। যাদুমণির দেহে প্রাণ ছিল না; কাপড় ছিল না; রূপোর গয়না কটিও ছিল না। তারি লোভে কে তাকে এমন নির্মম ভাবে মেরে রেখেছে!

মজার কথা হল, গাঁ সুদ্ধ সকলের মনে তখন যে প্রশ্ন উঠল, তার সঙ্গে হত্যাকারীর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সকলে ভাবছিল মৃতদেহ সেই রাত্রেই দাহ করা হবে কি না। সূর্য ওঠার আগেই মড়া পোড়াতে হয়, হিন্দুমাত্রেই এ-কথা বিশ্বাস করে। অনেক সময়ই প্রায় মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দাহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে পুলিসকে না জানিয়ে দাহ করা বে-আইনী কাজ হবে। সকলের মনে হল এ বিষয়ে জমিদারের বিধান নেওয়াই ভালো। এখন জমিদার

হলেন গোঁড়া হিন্দু, কাজেই তাঁর মতে তখনি দেহের সংকার হওয়া উচিত। কিন্তু ওদিকে আবার পুলিসের হাঙ্গামায় পড়লে তো মুশকিল। অগত্যা তিনি গ্রামের কাঁড়িদারকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "দেখ, আমার বাধ্য ও বিনীত প্রজা হিসাবে, এ বিষয়ে মন্ত্রেশ্বরের থানায় কিছু জানানো তোমার কর্তব্য হয় না।" কাঞ্চনপুর হল সাহাবাদ পরগণায়; তার বড় থানা ছিল মন্ত্রেশ্বরে। কাঁড়িদারের হাতে কিছু-মিছু দিতেই সে-ও ব্যাপারটা চেপে যেতে রাজি হয়ে গেল। সেই



রাত্রেই যাদুমণির ছোট দেহটি, কৃষ্ণসাগরের ধার থেকে তুলে অন্য একটা পুকুর পাড়ের শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ করা হল।

পরদিন সকাল থেকেই এই জঘন্য কাজের জন্য কে দায়ী, তাই নিয়ে গ্রামসুদ্ধ সকলে মাথা ঘামাতে লাগল।

এমন সময় এক বুড়ি এগিয়ে এসে বলল যে কাল সকালে এগারোটা নাগাদ বেজা বাগদী আর তার বোনের সঙ্গে যাদুমণিকে সে কৃষ্ণসাগরের দিকে যেতে দেখেছিল। দলে দলে লোক ছুটল বেজা বাগদীর কুঁড়ে ঘরে। অমনি তাকে আর তার বোনকে টেনে জমিদারের কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হল। গাঁয়ের লোক ক্ষেপেই ছিল; পথে যেতে বেজাকে আর তার বোনকে কিল, চড়, লাথি, ঘুষি মেরে তারা প্রায় আধমরা করে ফেলল। জমিদার মশাই বললেন ওরা যতক্ষণ না অপরাধ স্বীকার করে, ততক্ষণ ওদের পীড়ন করা হক। একটুক্ষণ বাঁশ লাগাতেই তারা অপরাধ স্বীকার করল। তারা বলল যাদুমণি রাস্তায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে খেলা করছিল।

সেখান থেকে তাকে আম খাওয়াবে বলে লোভ দেখিয়ে ওরা ভুলিয়ে কৃষ্ণসাগরে নিয়ে গিয়ে, ওর গয়না খুলে নিয়ে, গলা টিপে মেরে, দেহটাকে নলখাগড়ার বনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। গয়নাগুলো সব শুধু রুপোর ছিল, সোনাও নয়। বলাবাহুল্য, অপরাধ স্বীকার করতেই, রাগে অন্ধ হয়ে, গ্রামের লোকেরা তাদের বেদম মার দিয়ে প্রাণটা শুধু বাকি রেখেছিল।

তখন সমস্যা উঠল, এবার কি করা যায়? বেজাকে আর তার বোনকে পুলিসের হাতে জমা দেবার উপায় ছিল না। তা হলে পদ্ম পাল আর স্বয়ং জমিদার-মশাই থানায় খবর না দিয়ে মৃতদেহ দাহ করার জন্য বিপদে পড়বে। শেষ পর্যন্ত জমিদার স্থির করলেন খুনে দুটোকে গাঁ থেকে বের করে দেওয়া হক; আর কখনো যদি তারা এ-মুখো হয় তাহলে তাদের পুলিসের জিম্মা করে দেওয়া হবে এবং নির্ঘাৎ ফাঁসি যাবে।

তক্ষুণি ইঁট মেরে, জুতো মেরে, গাল দিয়ে, ওদের দুজনকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ফাঁড়িদারের তেমন টনটনে বিবেক-বুদ্ধি না থাকাতে, ব্যাপারটা পুলিসের বড় কর্মচারীদের কান অবধি পৌঁছল না।



৭

সপ্তাহে একদিনই হাট বসুক, কি দুদিন-ই বসুক, গ্রামের মানুষের ভারি সুবিধা হয়। খুব ছোট যে-সব গ্রামে মাত্র কয়েকঘর চাষী বাস করে, সেখানে দোকান-পাটের বালাই থাকে না। সেই সমস্ত গ্রামের লোকেরা তাদের যাবতীয় দরকারী জিনিস ঐ হাট থেকেই কেনে। আর শুধু তাই নয়, এই হাটের জন্যেই নানা গ্রামের মানুষরা পরস্পরকে চেনবার জানবার সুযোগ পায়। কাঞ্চনপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শনি-মঙ্গলবার হাট বসত। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্ববাংলায়, যে-সব প্রকাণ্ড হাট বসত, তার তুলনায় কিছু না হলেও, কাঞ্চনপুরের হাট কিন্তু নিতান্ত নগণ্য ছিল না। এখানেও দু-তিনশো লোক নিয়মিত সওদা করতে আসত। এ-হাটে অবিশ্যি কোনো চালা-ঘর ইত্যাদি ছিল না; হঠাৎ বৃষ্টি নামলে হাট ভেঙে যেত। বৃষ্টির হাত থেকে আশ্রয় বলতে কয়েকটা গাছ ছিল, তার মধ্যে বিশাল বট-গাছটির কথা তো আগেও বলা হয়েছে।

হাটের দিন গ্রামের প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকে কেউ না কেউ দরকারি জিনিসপত্র কিনতে হাটে যেত। কালামানিক আর গোবিন্দ দুজনেই নিয়ম করে হাটে যেত; তবে দুজনের উদ্দেশ্য ছিল আলাদা।

কালামানিক জিনিস বেচতে যেত আর আমাদের গল্পের নায়ক যেত কিনতে। বদনের নিয়ম ছিল তার মরাইতে এতখানি ধান জমা করে রাখবে, যাতে এক ফসল তোলার সময় থেকে আর এক ফসল তোলার সময় পর্যন্ত বাড়ির সকলের কুলিয়ে যায়। যদি বাড়িতে ধান কিছু থাকত, তাহলে সেটাকে ঢেঁকিতে ছেঁটে চাল বানিয়ে হাটে বিক্রি করা হত, বিশেষ করে যে সময় চালের দাম চড়ে যেত। তাছাড়া কালামানিক দূরের গ্রাম থেকে সস্তায় চাল কিনে, নিজেদের গ্রামে বেশি দামে বেচত। খুব বেশি আনতে পারত না, বড় জোর বলদের পিঠে চাপিয়ে বস্তা দুই চাল। গোবিন্দ হাট থেকে সংসারের জন্য নানা রকম দরকারি জিনিস কিনে আনত। সে জিনিস গ্রামের দোকানে পাওয়া গেলেও, হাটে আরো সস্তায় পেত। সপ্তাহের ঐ দুটি হাটকে কেউ মঙ্গলবারের হাট কি শনিবারের হাট বলত না। হাটের নামকরণ হত, দুই হাটের মধ্যে ক-দিন কাটে, তাই বুঝে। যেমন মঙ্গলবারের হাটকে বলা হত 'তিন দিনের হাট', কারণ শনিবারের হাট বসবে তিন দিন পরে। শনিবারের হাটকে বলা হত 'দু-দিনের হাট', কারণ দু দিন বাদেই আবার মঙ্গলবারের হাট বসবে। সাধারণতঃ তিন দিনের হাটে বেশি বেচা-কেনা হত ; এক দিন বেশি চালাতে হবে তো।

গোবিন্দর সঙ্গে একবার গিয়ে 'তিন দিনের হাট'টি দেখলে হয়। গাঁয়ের সীমানার কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতে, আম-বন, অশ্বত্থ আর তেঁতুল গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যেন লক্ষ লক্ষ মৌমাছির গুনগুনানি কানে এল। যতই এগোনো গেল, গুনগুন শব্দ ততই জোরে শোনাতে লাগল। শেষে যখন অকুস্থলে পৌঁছনো গেল, তখন কানে তালা লাগার জোগাড়। লণ্ডনের কিম্বা প্যারিসের যে সব রাস্তায় বড় বড় দোকান-পাট আছে, তার শব্দ-ও এর কাছে লাগে না। বেশির ভাগ হাটের চাইতে সেখানে লোক বেশি হলেও, তারা সবাই এক সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু গ্রামের হাটে যারা যায়, তাদের

মধ্যে প্রত্যেকটি লোক—তা সে জিনিস বেচতেই আসুক কিম্বা কিনতেই আসুক—এক সঙ্গে সমান জোরে চিৎকার করতে থাকে, যেন শত শত শ্রোতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে।

হাটে পৌঁছেই প্রথমেই যা চোখে পড়বে, সে হল ডাইনে বাঁয়ে এক গাদা টকটকে লাল, নতুন মাটির নানান মাপের, নানান আকারের হাঁড়িকুড়ি। এ জিনিসগুলো পাশের গাঁ থেকে এসেছে আর মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কারণ কাঞ্চনপুরে এক ঘর-ও কুমোর নেই।

পাঁচটি লম্বা সারি দিয়ে দোকানীরা বসেছে; বেশির ভাগ মাটিতে, কেউ কেউ চট পেতে; অল্প কয়জন নিচু কাঠের জল-চৌকিতে। জিনিসের ধরন বুঝে, হয় মাটিতে, নয় চটের থ'লতে বা ঝুড়িতে সব রাখা হয়েছে। একটা গোটা সারি ভরতি শাকসবজি তরি-তরকারি. এত বেশি জিনিস যে তাদের নাম করা দায়। বাঙালীরা সব রকম শাকসবজি খায়; বাদ দেয় শুধু বিষাক্ত জিনিষ আর যেগুলো খেতে অতি বদ্। অগুন্তি তরি-তরকারি: তার কারণ তো বোঝাই যাচ্ছে।

দুধ, দই, ঘি, মাছ ছাড়া বাঙালীরা সাধারণতঃ তরি-তরকারিই খায়। তরকারির মধ্যে কয়েকটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল। একজন মেয়ে এক ঝুড়ি টকটকে লাল মুলো এনেছে; তার প্রত্যেকটি দেড় হাত লম্বা হবে। একটা লোক বিরাট বিরাট লাউ কুমড়ো নিয়ে এসেছে। আরেকজন কাঁঠাল এনেছে, তার একেকটার ওজন প্রায় আধ মণ। কেউ কেউ বলে কাঁঠালের গন্ধ বড় বিশ্রী, কিন্তু এমন মিষ্টি আর পুষ্টিকর ফল কম আছে। আরেকটা তরকারিও আছে, তিন চার হাত লম্বা, সাপের মতো দেখতে। তার নাম চিচিঙ্গা। একটি চিচিঙ্গা ভালো করে রাঁধলে, তাই দিয়ে ভাত মেখেই এক বাড়ি লোকের দুপুরের কি রাতের খাওয়া হয়ে যায়। বিদেশী লোকরা যদি বাঙালীদের খাওয়ার রকম না জানে, তাহলে তারা হাটের এই

দিকটা দেখলে মনে করতে পারে বুঝি শাকসবজির, তরি-তরকারির প্রদর্শনী হচ্ছে।

দ্বিতীয় সারিতে মুদী-ময়রারা হাজার রকম সওদার জিনিস সাজিয়ে বসেছে। মশলাই বা কত রকম; রান্নার মশলা, পানে খাবার মশলা। যত রকম মিষ্টির কথা ভাবা যায়; গরীবের খাদ্য মুড়কি, পাটালি থেকে মিষ্টির রাজা খাজা পর্যন্ত। এই সারিতে গ্রামের ছেলেপিলের ভারি আনাগোনা। হাটের দিন দুই পাঠ-শালাই এক বেলার মতো বন্ধ থাকে। ছেলেগুলো ধুতির খুঁটে একটি পয়সা বেঁধে নিয়ে ময়রার দোকানের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে কোন মিষ্টিটা নেবে। সমস্যা বড়ই জটিল। এক পয়সার দৌড় সেকালে নেহাৎ কম ছিল না। এই এতগুলো মুড়কি কিম্বা ফুটকড়াই পাওয়া যেত; বেশ কতকগুলো কদমা পাওয়া যেত; মস্ত এক টুকরো খেজুরের পাটালি পাওয়া যেত।

তৃতীয় সারিতে প্রায় সবই কাপড়। জোলারা, তাঁতীরা, নিজেরা এসে বসত, তাদের হাতে বোনা ধুতি শাড়ি নিয়ে। খুব একটা বাহারে নয়, মোটা, কর্কশ; কিন্তু মজবুৎ, টেকসই। কাজেই চাষাদের আর শ্রমিকদের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। চতুর্থ সারিতে গ্রামে তৈরি যন্ত্রপাতি, লাঙ্গলের ফলা, কোদাল, কাস্তে, টাঙ্গি, বঁটি, কুড়ুল, ছুরি, কাটারি। ছুতোরের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, রান্না-ঘরের কাজ ইত্যাদির জন্য যত রকম যন্ত্রপাতি দরকার হতে পারে, সব পাওয়া যেত।

শেষের সারিতে চামড়ার তৈরি জিনিস; জুতো, অর্থাৎ চটি; সেকালে জুতো কেউ পরত না। চামড়ার ফালি, খেলনা, নানারকম খুচরা জিনিস।

এই পাঁচটি সারির বাইরে, বটতলার একধারে ধান-চাল বিক্রি হত; বলদের পিঠে চাপিয়ে সে-সব আনা হত। অন্য ধারে



মেছুনীরা অজস্র মাছ নিয়ে বসত ; খুদে পুঁটি থেকে বিশাল বোয়াল পর্যন্ত যত রকম মাছ হয়।

এত সবের মধ্যে লাল পাগড়ি পরা একটা লোককে দেখা গেল, তার হাতে মস্ত এক ঝুড়ি। তার সঙ্গে চলেছে কেরানীর মতো দেখতে একটা লোক। লাল পাগড়ি হল জমিদার মশাইয়ের চাকর। হাটের প্রত্যেক ব্যবসাদারের কাছ থেকে তোলা নিতে এসেছে। তোলা মানে ভাড়া। হাটের জায়গাটা জমিদারের সম্পত্তি ; তার জন্য তো আর কেউ খাজনা দেয় না ; তাই জমিদার মশাই প্রত্যেক হাটের দিনে প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে যার যা বিক্রির জিনিস থাকত, তার একটা ভাগ নিয়ে খাজনার অভাবটা পুষিয়ে নিতেন। দামী জিনিস হলে, যেমন কাপড় কিম্বা গয়না, তার বদলে কিছু নগদ পয়সা দিতে হত। এইভাবে জিনিস আদায় করে জমিদারের ন্যায্য খাজনার একশো গুণ লাভ হত। কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে মাসে মাসে খাজনা দেওয়ার চেয়ে হেটুরেরা এই নিয়মটাকেই বেশি পছন্দ করত।

একজন মুসলমানী চেহারার লোক দেখা গেল। লম্বা দাড়ি, মাথায় ছোট্ট গোল টুপি, হাতে বেঁটে লাঠি, সঙ্গে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কুলি। ও হল গ্রামের ফাঁড়িদার। ও-ও তোলা নিতে এসেছে। জমিদার মশাইকে দোকানদাররা যতখানি দিত, একে ততটা না হলেও, কিছু দিত। এ লোকটাকে চটাতে সবাই ভয় পেত।

এরা ছাড়াও, কয়েকটা ছেলে বামুন গুরুমশাইয়ের জন্য তোলা নিচ্ছিল। কিন্তু তাঁর ভাগটি ফাঁড়িদারের চেয়েও অনেক কম। আরেকটা লোককেও ঝুড়ি হাতে দোকানে দোকানে ঘুরতে দেখা গেল। এ লোকটা ব্রাহ্মণ, বারোয়ারি পুজোর চাঁদা তুলছে। প্রত্যেক বছর কাঞ্চনপুরে সবাই মিলে বারোয়ারি পুজো করত। তার খরচ মেটাবার জন্য ব্যবসাদাররা হাটের দিনে কিছু কিছু চাঁদা দিতে বাধ্য ছিল।

হাট বসত বেলা একটায়। বেলা চারটের সময় বেচা-কেনা সব চাইতে জমত। সে দিন-ও ঐ সময়ে ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনেই সমানে তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছিল; কান ঝালাপালা। কেউ কারো কথা শুনতেও পাচ্ছিল না, বুঝতেও পারছিল না। এমন সময় একজন সায়েব এসে, বট-গাছের তলায় দাঁড়ালেন। সায়েবের সঙ্গে বাবু-চেহারার একটা লোক আর ঝুলি বগলে একটা মজুর। তাঁকে দেখেই একদল লোক বেচা-কেনা বন্ধ করে, তাঁর কাছে ছুটে গেল। অমনি বাবু তার হাতের বইটি খুলে কি যেন পড়তে শুরু করে দিল। গোবিন্দ আর আরো অনেক লোক মন দিয়ে তাই শুনতে লাগল। কি সব বলছিল লোকটা, ভগবানের কথা; পাপের আর পাপ-মোচনের কথা; কে একজন এসে নাকি মানব-সন্তানদের উদ্ধার করবে। গোবিন্দ স্পষ্ট শুনতে পেল যীশুখৃষ্ট বলে কার কথা বলছে।

ঐ সায়েব হলেন চার্চ মিশনারি সোসাইটির প্রধান পাদ্রী। তিনি বর্ধমান জেলায় প্রচার-কার্য করতে এসে, ঘুরতে ঘুরতে সে-দিন দুপুরেই কাঞ্চনপুর পৌঁছেছিলেন। এখন হাটের সুবিধে পেয়ে যীশুর বাণী প্রচার করতে এসেছিলেন। গ্রামের লোকেরা যে-ভাবে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে, যে-ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করল, তার থেকেই বোঝা গেল লোকটি তাদের নেহাৎ অচেনা নয়। আসল ব্যাপার হল পাদ্রী সায়েবের আস্তানা ছিল বর্ধমান শহরের উপকণ্ঠে কানাই নাটশালা বলে একটা জায়গায়। কাঞ্চনপুর থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে। এর আগেও উনি অনেকবার এখনে এসে, হাটের মাঝখানে, কিম্বা শিবতলায় বক্তৃতা দিয়েছেন। গ্রামের মাঝখানে যেখানে দুটি শিবমন্দির ছিল, সে জায়গাটার নাম শিবতলা। মাঝে মাঝে উনি গ্রামের মাতব্বরদের বাড়ি গিয়ে দেখাও করতেন।

মানুষটি ভারি মিশুকে, অমায়িক; ব্যবহারে এতটুকু চাল বা দেমাক ছিল না: গ্রামের চাষী-মজুরদের সঙ্গে সমানে সমানে

মিশতেন; হাল-চালও ছিল অতি সাদাসিধে, জর্মানরা সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে। হিন্দুদের সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে উনি কখনো রেগে উঠতেন না, যদিও রেগে উঠবার যথেষ্ট কারণ হত, কারণ তাঁর প্রতিপক্ষরা আগডুম-বাগডুম যা-তা বাজে বকত। না থাকত তার কোনো মানে, না থাকত কোনো যুক্তি। উনি যখন এদিকে আসতেন, কারো অসুখ-বিসুখ হয়েছে শুনলে, অমনি গিয়ে তাকে ওষুধ দিতেন। বাংলা বলতেন প্রায় বাঙালীদের-ই মতো। জর্মানরা সাধারণতঃ ইংরেজদের চাইতে ভালো বাংলা বলে. যদিও মাঝে মাঝে ব-অক্ষর আর প-অক্ষর গুলিয়ে যায়। সে যাই হক, ঐ-সব কারণে কাঞ্চনপুরের লোকেরা সায়েবকে বেশ পছন্দই করত। এমন কি ছোট ছেলেরা তাঁর কাছে গিয়ে, কোটের পেছন দিকটা টেনে বলত "পাদ্রী সায়েব, সেলাম !"

এই মানুষটিই সেদিন কাঞ্চনপুরের হাটের প্রকাণ্ড বট-গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর সহকারী বাইবেল থেকে খানিকটা পাঠ করে. শ্রোতাদের কাছে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে শ্রোতার ভিড় বেজায় বেড়ে গেল। পাদ্রী সায়ের তখন বক্তৃতা দিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল বাইবেলে বর্ণিত যীশুর মুখের কথা : "যারা পরিশ্রান্ত, যারা কর্মভারে নত, তারা সকলে এসো আমার কাছে। আমি তোমাদের শান্তি দেব।"

পাদ্রী সায়েব মানুষের দুঃখ-কষ্টের এমন চমৎকার বর্ণনা দিচ্ছিলেন যে সে-সব চোখের সামনে যেন সবাই দেখতে পাচ্ছিল। তারপর গরীব দুঃখী শ্র'মকদের জন্য এতই মনের দুঃখ জানালেন যে মনে হল শ্রোতারা খুবই অভিভূত হয়ে পড়েছে। তার একটা কারণ হল তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ঐ রকম দুঃখ-কষ্টে মানুষ। ভারি আন্তরিকতার সঙ্গে পাদ্রী অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এখান থেকে ওখান থেকে শ্রোতারা সায় দিচ্ছিল "ঠিক ! পাদ্রী সায়েব যা যা বললেন, সব সত্যি।"

কিন্তু তারপর যখন বক্তৃতার শেষের দিকে বললেন ত্রাণকর্তা যীশু তাপিত মানুষদের অনন্ত শান্তি দান করবেন তখন শ্রোতারা ততটা খুসি হতে পারছিল না। বক্তৃতার শেষে আলোচনা হল। বামুন কায়েতরা তাতে যোগ দিল; সে-সব কথা এখানে বলে কাজ নেই। আলোচনার শেষে, বাংলায় খৃষ্টের বাণী লেখা কাগজ বিনি পয়সায় বিলি করা হল। সেই কাগজ নেবার জন্য ভিড়ের লোকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। এমনি তাদের আগ্রহ যে এ-ওর পা মাড়িয়ে তো দিলই, উপরন্তু পাদ্রী সায়েবকে আর তাঁর সহকারীকে পর্যন্ত ঠেলাঠেলি করে ফেলে দেয় আর কি। হট্টগোলের মধ্যে গোবিন্দ একটা কাগজ পেয়ে গেছিল। তাতে লেখা ছিল। "সত্য আশ্রয়"। সেটিকে—বাড়ি নিয়ে গিয়ে, মাঝে মাঝে বের করে সে পড়ত।

এদিকে সূর্য ডুবে যাওয়াতে সে দিনের মতো হাট ভেঙে গেল। জিনিসপত্র গুটিয়ে হেটুরেরা সবাই বাড়ি মুখো হল, কেউ কাঞ্চনপুরে, কেউ বা কাছাকাছি অন্য গ্রামে।

বাংলার গ্রামের মেয়েরা সর্বদাই এ-ওর বাড়ি গিয়ে গাল-গল্প করে, কিন্তু পুকুর-পাড়ের স্নানের ঘাটে গল্প যেমন জমে তেমন আর কোথাও নয়। সবাই রোজ পুকুরে স্নান করতে যায়; অনেকগুলি মেয়ে এক জায়গায় জড়ো হলে যা হয়, রাজ্যের কথা নিয়ে আলোচনা: ঘরকন্না, গ্রামের ব্যাপার, কিছু বাদ যায় না। কাঞ্চনপুরে অনেকগুলি বড় বড় চমৎকার দীঘি ছিল, সে-কথা তো বলাই হয়েছে। তবে সবগুলিতে স্নান করা হত না। দুটি পুকুরে অধিকাংশ মেয়েরা যেত, দক্ষিণে হংসসাগরে আর উত্তরে রায়দের পুকুরে। বদনের বাড়ি ছিল গাঁয়ের উত্তরদিকে, কাজেই ওদের বাড়ির মেয়েরা রায়দের পুকুরে স্নান করত। রায়দের মানে জমিদার মশাইদের; তাঁদের পদবী ছিল রায়।

পুকুরের দুটি ঘাট: একটি পুরুষদের, একটি মেয়েদের। ঘাট দুটি এমন ভাবে তৈরি যাতে পুরুষদের ঘাট থেকে মেয়েদের দেখা যায়



না। দুই ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ি জলের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে। জল ভারি গভীর। সিঁড়িগুলো দেয়াল দিয়ে ঘেরা; কিন্তু সে দেয়াল জলের নিচে। সিঁড়ির মাথায় মস্ত চাতাল। চাতাল ও বাঁধানো। জল থেকে উঠে সেখানে দাঁড়িয়ে লোকে গা মোছে, চুল মোছে, কেউ কেউ ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরে। অবশ্যি বেশির ভাগই ভিজে কাপড়ে বাড়ি গিয়ে কাপড় ছাড়ে, তা সে যতদূরেই হক না কেন। চাতালের দু পাশে দুটি উঁচু করে বাঁধানো তুলসী মঞ্চ।

রায়দের পুকুর-ঘাটে বেলা এগারোটা নাগাদ গেলে মেয়েদের কথা বার্তা বেশ শোনা যায়। তবে একটা মুশকিল আছে; ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের গল্প শুনবার চেষ্টা করলে গাল দিয়ে ওরা আমাদের ভূত ভাগিয়ে দেবে। বাঙালী মেয়েদের মতো গাল দিতে কেউ পারে না। কাজেই মেয়েরা ঘাটে আসবার ঘণ্টা দেড়-দুই আগে গিয়ে, চাতালের ওপারে বড় বেলগাছটার ডাল পাতার মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে।

এগারোটা বাজতেই একজন দুজন করে মেয়েরা আসতে আরম্ভ করে। বেশির ভাগ-ই সঙ্গে করে কাঁসা কি পেতলের কলসী আনে, কেউ কেউ মাটির কলসীও আনে। তাতে করে সবাই খাবার জল নিয়ে বাড়ি যায়। আপাততঃ কলসীগুলোকে চাতালের ওপর

নামিয়ে রাখে। বেশ করে তেল মেখে মুখগুলো সব চক-চক করছে। একেবারে সব চাইতে ছোট জাত ছাড়া, সব জাতের, সব অবস্থার, সব বয়সের মেয়েরা এসে জুটেছে। সত্তর বছরের এক বুড়িও আছে, তার চুলগুলো যেন শনের নুড়ি। সে কলসী আনেনি: জল-ভরা কলসী নিয়ে বাড়ি ফেরা তার কর্ম নয়। ত্রিশ চল্লিশ বছরের গিন্নীরা আছে, কুড়ি বছরের মেয়েরা আছে, আবার মিষ্টি মুখের ষোড়শীরাও আছে। বাংলায় বলে মেয়েদের ষোল বছর বয়স হলে, তাদের রূপ খোলে। বিলেতে আবার বলে সতেরো হলে তবে রূপ খোলে। কয়েকজন মেয়ে বাস্তবিক সুন্দরী: যেমন সুন্দর মুখের গড়ন, তেমনি দুধে-আলতায় গায়ের রঙ। বাঙালীদের চোখে মেমদের ফ্যাকফ্যাকে সাদা রঙের চাইতে এই ভালো। এই মেয়েদের অনেকেই যে রকম গা ভরা গয়না পরে এসেছে, তাই দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা গাঁয়ের সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে।

অনেক মেয়েই সঙ্গে করে কাগজে মুড়ে মিশি নিয়ে আসে। ঘাটে বসে আগে অনেকক্ষণ ধরে তাই দিয়ে দাঁত মাজে, তারপর কুলকুচি করে প্রায় পনেরো মিনিট। তারপর গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে পা পরিষ্কার করে। তারপর সব কাপড়-চোপড় পরেই সিঁড়ি বেয়ে জলে নামে। গলা-জলে দাঁড়িয়ে মেয়েরা গা রগড়ে, সারা গায়ের তেল তোলে। তারপর কতবার যে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে স্নান করে তার ঠিক নেই। মনে হয় স্নান করতে ওদের বেজায় ভালো লাগে। সবাই অবিশ্যি সব কাজ এক সঙ্গে করে না। কেউ আগে আসে। তারা স্নান সেরে, কলসী ভরে বাড়ি ফিরছে। আরেক দল সবে এসে দাঁত মাজছে, কেউ পা ঘষছে, কেউ গলা-জলে দাঁড়িয়ে আছে। আর অল্প কয়েকজন জপ করছে, তাদের ব্রাহ্মণী-ই বেশি। এই সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে সমানে ওদের কথা চলেছে। শ্রোতার-ও অভাব নেই। এগারোটা থেকে একটার মধ্যে যখনি যাবে, দেখবে ঘাটে অন্তত: কুড়িজন মেয়ে।

এক গিন্নী পা ঘষছে, আরেক গিন্নী বাড়ি যাবার জোগাড় করছে। প্রথম গিন্নী বলল, "এত শীগগির চলে যাচ্ছ কেন, ভাই ? তোমাকে তো আর রাঁধতে হবে না, তবে তাড়া কিসের ?

সে বলল, "না ভাই, আজ আমাকেই রাঁধতে হবে। বড় বৌয়ের শরীর খারাপ। কাল রাত থেকে অসুখে পড়েছে।"

"তা হক, বেশি কিছু তো আর রাঁধবে না। নাকি বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া আছে ?"

"না, না, খাওয়া-দাওয়া নয় সেরকম। তবে দেবগ্রাম থেকে আমার বোন এসেছে, ছেলে নিয়ে। জেলে মস্ত একটা রুই মাছ দিয়ে গেছে, সেটাকে রাঁধতে হবে তো।"

"তা হলে বাড়িতে অতিথি এসেছে বল। কি কি রাঁধবে ?"

"রাঁধব মাষ-কলাইয়ের ডাল, একটা নিরামিষ তরকারি, বড়ি ভাজা, মাছ ভাজা, সরষে মাছ, মাছের টক। আরেকটা জিনিস-ও করব ভাই ; বোনপোর ভারি পছন্দ ; আমড়া দিয়ে পোস্তোর অম্বল।"

"সেই বড়ি, সেই পোস্তো ! তোমরা বেনেরা ভাই, ঐ দুটো জিনিস বড্ড ভালোবাস। আমরা বামুনরা দুটোর একটাও খেতে ভালোবাসি না।"

"তোমরা বামুনরা বড়ি ভালোবাস না, কারণ বড়ি দিতে জান না। আমাদের বড়ি একবারটি খেলে, সাত মাসেও ভুলবে না। রোজ খেতে চাইবে। আর পোস্তো-বাটা দিয়ে যা তরকারি হয়, তার তুলনা নেই।"

"বল কি ভাই, তোমার বড়ির বর্ণনা শুনেই যে আমার জিবে জল আসছে। আমি যদি বামনী না হতাম, তো একবার তোমাদের বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতাম।"

"তাতে কি হয়েছে ভাই, বামুন হয়েও আমাদের বড়ি একবারটি চেখে দেখো। তাতে তোমার কিছু জাত যাবে না।" এই বলে কলসী কাঁখে বেনে-বৌ বাড়ি গেল।

আরেক বৌ গলা-জলে দাঁড়িয়ে ঘাটে বসা তার বন্ধুকে বলল, "ও গয়নাটা আবার কবে গড়ালি, সই ?"



'কোনটা, সই ? ও, এই ঝুমকোটার কথা বলছিস্? দুদিন হল পেয়েছি। নিধে স্যাকরা গড়েছে। তোর ভালো লাগছে ?"

"বাঃ, চমৎকার গড়েছে তো। তোর গয়নার আর শেষ নেই। মাথা থেকে পা পর্যন্ত গয়না দিয়ে মুড়ে আছিস! তোর কপাল খুব ভালো ; এমন স্বামী পেয়েছিস যার জীবনের প্রধান কাজ তোকে খুসি করা।"

"সে কি, সই, তোর স্বামীও তো ভারি ভালো মানুষ। সবাই বলে সে তোকে বড্ড ভালোবাসে।"

"ভালোবাসে! হা ভগবান! আমার দুঃখে শেয়াল-কুকুরে কাঁদে!"

"ও আবার কি? কি এমন দুঃখ তোর? ভাত কাপড়ের অভাব নেই। যখনকার যেটা পাচ্ছিস। তাছাড়া সবাই বলে সে তোকে বড্ড ভালোবাসে।"

"কাপড় দেয় সত্যি, কিন্তু সে তোর কাপড়ের ধারকাছেও যায় না। খেতেও দেয়, কিন্তু সে তো সব্বাই খায়, পথের কুকুরগুলোও। আর ভালবাসার কথাই যদি বলিস. শুকনো ভালোবাসা দিয়ে কি হয় রে? কিছু বলবার তো আর জো নেই! এ দুঃখ আমার কপালে লেখা আছে। না মলে আমার নিস্তার নেই। মলেই বাঁচব।"

"আচ্ছা, সই, মিছিমিছি এত মন খারাপ করছিস? গয়না দিয়ে কখনো স্বামীর ভালোবাসার মাপ হয়? কত মানুষ গয়না দিয়ে স্ত্রীর গা বোঝাই করে দেয়, কিন্তু তাকে এতটুকুও ভালোবাসে না।

কলকাতার বড়লোকরা শুনেছি অনেকে ঐ রকম। স্ত্রীদের গা ভরা গয়না, একেকটা মণি, তার নাম অবধি আমি জানি না। কিন্তু বাবুরা রাতে বাড়িতে থাকেন না। তাঁরা মেছুয়া-বাজারে ঘুমুতে যান। তোর স্বামী কি ভালো বল্ দিকিনি। আলো জ্বলল তো আর বাড়ির বার হবে না। কি রকম স্বভাব; তোকে মারে না ধরে না, বকে না পর্যন্ত। আবার কি চাস? গয়না দিতে পারে নি সত্যি। কিন্তু দিতে কি তার অনিচ্ছা? পারলে, নিশ্চয় দিত। গয়না দিয়ে ঘর ভরে দিত। মা-লক্ষ্মী এখনো মুখ তুলে চাননি। এই নিয়ে আর গজ গজ করিস নে, সই। এমন মনের মতো গুণের স্বামী পেইছিস বলে দেবতাকে ধন্যবাদ দে!"

"ন্যাখ বগলা, মনে হচ্ছে তুই আমার স্বামীর প্রেমে পড়েছিস! প্রজাপতি যদি তোর বরটাকে আমায় দিয়ে, আমারটা তোকে দিতেন, তাহলে কি ভালোই না হত।"

"ও কি কথা, সই? অমন ভাষা মুখে আনতে হয় না। ও ভারি বিশ্রী কথা। ভাগ্যদেবী তোকে যে স্বামী দিয়েছেন তাকে নিয়েই খুশি থাক্। এই নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করা মহাপাপ।"

"ভারি পণ্ডিত হয়েছিস দেখছি, বগলা। লিখতে পড়তে জানিস বলেই আমাকে এমন কথা শোনাচ্ছিস। মাপ কর্, সই, তোকে অসন্তুষ্ট করার আমার ইচ্ছা ছিল না। কি করব বল্, তাদের মতো আমিও যে মুখ্যুসুখ্যু!"

"আমিও কিছু পণ্ডিত নই, সই। আমার স্বামী আমাকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন ঠিক-ই, তবু অনেক বিষয়ে আমি তোর-ই মতো মুখ্যু। তবে গোটা কতক বই পড়ে এ-কথা শিখেছি যে বিবাহিত জীবনের সুখ কিছু গয়না-গাঁটির ওপর নির্ভর করে না। মনের মিল হলে তবে সুখ।"

"ঠিক বলছিস, ভাই বগলা। যা বললি তাই দিয়ে মনকে বোঝাবার চেষ্টা করব।"

ঠিক সেই সময় কাঁকালে একটা মাটির কলসী নিয়ে বদনের স্ত্রী সুন্দরী ঘাটে পৌঁছল। সে সময় যারা স্নান করছিল তাদের মধ্যে অনেকেই উঁচু জাতের, তাদের মান-সম্মানও বেশি। কাজেই সুন্দরী সিঁড়ির কিনারা দিয়ে জলে নামল। তাকে দেখে এক বুড়ি বলে উঠল, "কি গো মালতীর মা, শুনলাম নাকি তোমার ছেলে গোবিন্দর সঙ্গে পদ্ম পালের বড় মেয়ে ধনমণির বিয়ের কথা হচ্ছে? গুজবটা সত্যি নাকি?"

"হ্যাঁ কথাটা উঠেছে বটে, তবে এখনো পাকা হয় নি।"

"ভালো সম্বন্ধ, মা। ধনমণি ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। মা লক্ষ্মীর মতোই নরম-সরম।"

"বেশি প্রশংসা কর না, মাসি, চোখ লাগলে দেবতারা তুলে নেবেন। প্রজাপতি গিট বাঁধলে বিয়ে হবেই নইলে কিছুতেই হবে না।"

"অত ভাবনার কি আছে, মেয়ে? পদ্ম পালের তো তোমার ছেলেকে ভারি পছন্দ। আমার বিশ্বাস এ বিয়ে হবেই।"

"তোমাদের আশীর্বাদে তাই যেন হয়, মাসি!"

সুন্দরী এ কথা বলার পর পুকুর ঘাটে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। অনেকগুলো গলা এক সঙ্গে শোনা গেল, "দেখ, দেখ! জমিদার মশায়ের মেয়ে হেমাঙ্গিনী আসছে।" গাঁ থেকে ঘাটে আসবার পথের দিকে সকলের চোখ। বছর ষোল বয়সের ভারি রূপসী এক মেয়েকে ঘাটের দিকে আসতে দেখা গেল। মাথায় কাপড় নেই। সারা গা গয়নায় ঢাকা. বেশ মোটাসোটা গড়ন; হাতির ছানার মতো হেলে দুলে চলেছে, সেকালের সংস্কৃত কবিরা একেই বলতেন গজেন্দ্রগামিনী: পায়ের নূপুর ঝমুঝুমু করে বাজছে।

কয়েক বছর হল বর্ধমান জেলার-ই অন্য দিকের এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হয়েছে। এবার বাপের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে সে। কাঁখে কলসী নেই; সঙ্গে দুই দাসী; মেয়েকে দেখে মনে হয় রাজকন্যের মতো দেমাক। ঘাটে এক বুড়ি ছিল,

গলায় মোটা বিছে-হার, নিশ্চয় কোনো পদস্থ বড়লোকের বাড়ির কেউ; সে ডেকে বলল, "কি গো হেমাঙ্গিনী, তোমাদের দালানে বসে তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছিল, ঐ লোকটা কে? ঘাটে আসবার সময় দেখে এলাম।"

হেমাঙ্গিনী বলল, "ও হল মস্তেশ্বরের দারোগা।"

বুড়ি তো অবাক্! "দারোগা! সে আবার এখানে এসেছে কি করতে? কই, আমি তো কোনো খুনের বা ডাকাতির কথা শুনিনি।"

"খুনের কথা শোননি? পদ্ম পালের মেজ-মেয়ে যাদুমণির কথা ভুলে গেলে নাকি?"

"সে তো অনেক দিন আগের কথা। কোন কালে চুকে-বুকে গেছে।"

"চুকে যায়নি। চাপা দেওয়া হয়েছিল। এখন শুনছি আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।"

"তা তোমার বাবা দারোগাকে কি বললেন?"

"কি বলেছেন ঠিক জানি না। তবে তার মুখ বন্ধ করবার জন্য কিছু টাকা দিয়েছেন।"

এ-কথা শুনে মেয়েরা সেই পুরনো ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে বসল। কেউ বলল টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করাই উচিত, আবার কেউ বলল সেটা খুব অন্যায় হয়।

বাঙালী মেয়েরা এক জায়গায় জড়ো হলেই তাদের এই ধরনের আলোচনা হয়ে থাকে। এ ছাড়া আলোচনার আরো বিষয়-বস্তুও আছে। যেমন—স্বামীদের দুর্ব্যবহার, সতীনদের ঝগড়া, সৎমাদের অকথ্য অত্যাচার, গাঁয়ের মেয়েদের রূপ ইত্যাদি। এই ধরনের রাজ্যের কথাবার্তা সেরে মেয়েরা একে একে ঘাট ছেড়ে বাড়ি চলল। প্রায় সকলের গায়ের কাপড় ভিজে চুপ্‌চুড়, কাঁখে কলসী।

যারা বেল গাছের ডালে লুকিয়ে বসে মেয়েদের কথা শুনছিল, এইবার তাদের গাছ থেকে নেমে চম্পট দিতে হয়, কারণ এখন কেউ

নেই। যারা আরো পরে স্নান করতে আসবে তাদের সামনে ধরা পড়ে গেলে শেষটা না ঝাঁটার বাড়ি খেতে হয়।

এ গল্প পড়তে পড়তে অনেকের হয়তো বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। এ আবার কেমন ধারা গল্প যে কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনা তো ঘটছেই না, ঘটনা বলতেই বিশেষ কিছু নেই। তবে একটা কথা মনে রাখা উচিত : আমাদের দেশে, বিশেষ করে চাষীর ঘরে, একটা পনেরো ষোল বছরের ছেলের জীবনে কি এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে থাকে? অবিশ্যি নানা জনের নানা রোমাঞ্চকর ব্যাপার এক সঙ্গে জুড়ে, গোবিন্দর জীবন-কাহিনী বলে চালানো যেত। তা হলে গল্পটা একটা সম্ভাব্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত বটে, কিন্তু একটা সত্যিকার মানুষের বাস্তব জীবন-কাহিনী হত না। আসলে সেইটেই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। বাঙলার যে-কোনো গাঁয়ের সাধারণ একজন চাষীর ছেলের জীবন কথাই বলা হচ্ছে।

মালতীর বিয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে সে একবারই তার বাপের বাড়িতে এসেছিল, সেই যেবার আহুরীকে ভূতে পেয়েছিল। এবার একটু মালতীর কথাই হক। বিয়ের দু দিন পরেই সে বরের সঙ্গে দুর্গানগরে চলে গেছিল। সেখানে শ্বশুর, শাশুড়ী আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন তাকে খুব আদর করে ঘরে তুলেছিল। কেশব সেনের বাড়িতে মহোচ্ছব লেগে গেছিল। আত্মীয়-বন্ধুরা রোজ রোজ এসে ভোজ খেয়ে যেত। আবার মাধবের আত্মীয়-স্বজনরাও তাদের নেমন্তন্ন করে খুব খাওয়াত।

ছোট একটা গ্রাম দুর্গানগর, কাঞ্চনপুরের পুবে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে। কাছেই ভাগীরথী নদী, সায়েবদের মানচিত্রে তাকে হুগলী নদী বলা হত। দক্ষিণপল্লী বলে একটা বড় গ্রাম বেশি দূরে নয়। সেখানে ভারি পয়সাওয়ালা এক জমিদার ছিলেন। অন্য দিকে নীলডাঙা বলে একটা জায়গা, সেখানে নীলের কারখানা ছিল। ওখানকার লোকদের বেশির ভাগই সদ্গোপ কিম্বা আগুরী। তারা

চাষ-বাস করে খেত। অবিশ্যি কয়েক ঘর বামুন আর অন্য জাতের লোক-ও ছিল। এ সমস্ত জায়গাই দক্ষিণ পল্লীর ধনী বাঁড়ুয্যেদের জমিদারির এলাকার মধ্যে পড়ত।

গ্রামটার সে-রকম কোনো বিশেষত্ব ছিল না। আম-বন, ধান ক্ষেত, ঘন বাঁশ ঝাড়, বিশাল সব বট অশ্বত্থ গাছ, যেমন গ্রাম-বাংলার সব জায়গায় দেখা যায়। তবে বদনদের গ্রামের চাইতে এখানে দু রকম গাছ অনেক বেশি চোখে পড়ত। সে দুটি হল খেজুর গাছ আর কাঠাল গাছ প্রথমটি থেকে প্রচুর রস আর গুড় পাওয়া যেত। দ্বিতীয়টির পুষ্টিকর মিষ্টি ফল খেয়ে গরীব লোকে বাঁচত। যদিও কেউ কেউ কাঁঠালের গন্ধের নিন্দা করত। তাছাড়া এখানে এমন একটি জিনসের চাষ হত, যেটা বদনদের গ্রামের লোকেরা চোখেও দেখেনি। সেটি হল নীল! নীলডাঙার কারখানায় নীল তৈরি হত; তার মালিক হলেন একজন সায়েব। এই দুর্গানগরে বিয়ের পর মালতী এসে মাত্র সাত দিন থেকে, আবার বাপের বাড়িতে ফিরে গেছিল।

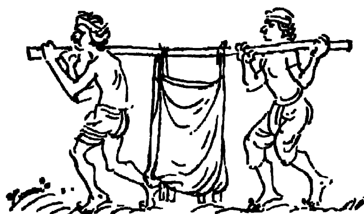
বিদেশী লোকে এ-কথা শুনে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবে। বিয়ের পরেই বৌ কেন বাপের বাড়ি যাবে? তবে মনে রাখতে হবে বৌটির বয়স ছিল মাত্র এগারো। সংসারের নানান্ কর্তব্যের ভার নেবার পক্ষে নেহাৎ-ই ছোট। তাই এ-দেশের একটা নিয়ম-ই ছিল বিয়ের পর কয়েকদিন শ্বশুরবাড়িতে থেকে আবার বাপের বাড়ি গিয়ে অন্ততঃ বছর খানেক, এমন কি অবস্থা বিশেষে কখনো কখনো দু-তিন বছর-ও থেকে আসত। তবে মাঝে মধ্যে এক-আধবার শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরেও যেত। বেচারি ছেলেমানুষ বৌয়ের পক্ষে সে ছিল মহা শাস্তি। একটা অচেনা লোকের বাড়ির চাইতে—তা হক সে তার বিয়ে-করা বরের বাড়ি—সে যে নিজের বাপের বাড়িটাই বেশি পছন্দ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? শ্বশুরবাড়িতে অষ্টপ্রহর ঘোমটা টেনে বৌ সেজে থাকতে হত। কিন্তু বাপের বাড়িতে খালি মাথায় শুধু ঘরে নয়, পথে-ঘাটেও, ঘুরে বেড়ানো যেত।

তবে বিয়ের পর বাপের বাড়িতে ফিরে এলে, মালতীকে আর বাপ-কাকার ভাত নিয়ে, কিম্বা গোরু নিয়ে, মাঠে পাঠানো হত না। এখন সে অন্যদের বাড়ির বৌ; ও-সব কাজ না করাই ভালো মনে হত। তবে বাড়িতেও মেলা কাজ ছিল। আলঙ্গা ঘরকন্নার কাজ ভালোই জানত, তা ওরা যতই গরীব হক। সে এবার মালতীকে রাঁধা-বাড়া, ধান ভানা, খৈ-মুড়ি ভাজা, কাপড় কাচা, ঘুঁটে দেওয়া ইত্যাদি চাষীর বৌয়ের যত কাজ, সব শিখিয়ে দিল।

বিয়ের পর এক বছর কেটে গেলে, দুর্গানগর থেকে লোক এসে বলে গেল মাধবের মা-বাবার বড় ইচ্ছা মালতী এবার শ্বশুর-ঘর করুক। এত তাড়াতাড়ি মেয়ে পাঠাতে আলঙ্গার আর সুন্দরীর খুব আপত্তি ছিল। বদনেরও সেই মত। কাজেই লোকটিকে এই বলে বিদায় দেওয়া হল যে অল্প দিন পরেই মেয়েকে পাঠানো হবে। সেই অল্প দিন বাড়তে বাড়তে যখন অনেক দিন হয়ে গেল, তখন দুর্গানগর থেকে ডুলি আর দুই বেহারা নিয়ে একজন মেয়েমানুষ মালতীকে নিতে এল। বদন বুঝল এবার না পাঠিয়ে উপায় নেই।

যাত্রার দিন স্থির করবার জন্য জ্যোতিষী মশাইকে ডাকা হল। এদিকে অন্য যোগাড়-যন্ত্র শুরু হয়ে গেল; দেখতে দেখতে যাবার দিন এসে গেল। দোরগোড়ায় ডুলি দাঁড়াল। মালতী ভালো কাপড় আর গয়না পরে তৈরি হল। সঙ্গে সঙ্গে আলঙ্গা, আদুরী আর সুন্দরী মড়া-কান্না জুড়ে দিল। তবে মালতীর কান্না সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠল। সে বড় করুণ দৃশ্য; কিন্তু যেতে তো হবেই। দুই ষণ্ডা বেহারা মালতীকে সুদ্ধ ডুলি কাঁধে তুলল। মেয়েমানুষটি পাশে পাশে চলল। মালতী তারস্বরে চ্যাঁচাতে লাগল, "ও মা! ও বাবা! মা গো! বাবা গো! আমাকে এরা কোথায় নিয়ে চলল!" যে-পথে ডুলি চলল, সবাই মালতীর কান্না শুনে বলাবলি করতে লাগল, "ছাখ্! ছাখ্! বদন সামন্তর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে!" গাঁ

ছেড়ে ডুলি ধান-ক্ষেতে নামল, তবু চিৎকার থামল না। তবে ক্রমে আওয়াজটা কমে এল। মালতী ডুকরে না কেঁদে, এবার ফোঁপানি, গুমরানি, গোঙানি আর ফোঁশ ফোঁশানি ধরল।



দুপুরে একটা গ্রামের সীমানায় পৌঁছে ডুলি নামিয়ে, বেহারারা একটু মুড়ি আর দেনো মদ খেয়ে নিল। মালতী উপোস করে রইল। বদনের বাপ ঠাকুরদার আমোলে গ্রাম বাংলায় দেনো মদ পাওয়া দায় ছিল, কিন্তু পরে ইংরেজ শাসনের দয়ায় প্রায় সব গ্রামেই ঐ জিনিসটি অল্প বিস্তর পাওয়া যেত। এই ভাবে না খেয়ে, কেঁদে-কঁকিয়ে, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মালতী তো দুর্গানগরে তার শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছল। মাধবের মা-বাবা তাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা। মাধব অবিশ্যি কোনো কথাই বলল না, কারণ সব চাইতে ভালোবাসার মানুষদের সামনেও অল্প বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলাটা সেখানে খুবই অসভ্যতা এবং নিন্দার কথা বলে মনে করা হত।

শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছবার সময় মালতীর যে রকম মনের অবস্থা, তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সেখানে মন বসতে তার অনেক সময় লেগেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম দিকের মাস দুই, রোজ রাতে স্বামীর সঙ্গে একা ঘরে মালতী তার মা-বাবার জন্য কেঁদে-কেটে একাকার করত। মাধবের স্নেহ মমতা আর সহানুভূতির ফলেই শেষ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়িতে তার মন বসেছিল।

এখানে কেশবের, তার পরিবারের আর কাজকর্মের বিষয় কিছু বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তার দশ বিঘা লাখরাজ জমি ছিল,

লোকে তাকে একজন সম্ভ্রান্ত চাষী বলেই জানত। মুসলমান রাজত্বের সময়, ওর কোনো পূর্বপুরুষ এ জায়গায় মোড়ল হয়েছিল; জমিটা সেই সময় পাওয়া। তা ছাড়া কেশবের আরো কুড়ি বিঘা জমি ছিল, তার জন্য জমিদারকে খাজনা দিতে হত। বদনের চাইতে তার অবস্থা অনেকটা ভালো বলতে হবে, কারণ বদনের এক কাঠাও লাখরাজ সম্পত্তি ছিল না। তবে কেশবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। তার একটা কারণ তার বয়স হয়েছিল; তাছাড়া একটা পুরনো জ্বরে সে মাঝে-মাঝেই ভুগত। কাজেই জমি চাষ করবার জন্য তাকে লোক রাখতে হয়েছিল। মাধব তখনো ছেলেমানুষ, সে একা অতটা পেরে উঠবে কেন। এতে ভারি অসুবিধার সৃষ্টি হত। লাখরাজ সম্পত্তির মালিক হওয়ার সুখটা মাটি হয়ে যেত।

কেশবের পরিবার বলতে ঐ স্ত্রী, একমাত্র ছেলে মাধব আর একটি মেয়ে। তার অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল আর অল্প দিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতেই থাকত। সেই মেয়ের নাম কাদম্বিনী। নামটিও যেমন, গায়ের রঙটিও মেঘের মতো কালো; কিন্তু তার ব্যবহার যেমন ভালো, মনটিও তেমনি স্নেহশীল। মা, বাবা, ভাইকে সে বড়ই ভালোবাসত। সংসারের অনেক কাজ কাদম্বিনীই করত। ওর অমন কোমল অমায়িক স্বভাবের জন্য পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই ওকে ভালোবাসত।

কেশবের স্ত্রী, অর্থাৎ মাধবের মা হল বাড়ির গিন্নী। তার সম্বন্ধে আরেকটু বেশি করে বলতে হয়। রোগা প্যাকাটির মতো শরীর, মাথায় প্রায় টাক পড়ে গেছিল। বাঙালী মেয়েদের সাধারণতঃ মাথা ভরা চমৎকার কালো চুল থাকে, কেশবের স্ত্রী তার ব্যতিক্রম। তার ওপর চোখ ট্যারা, নাক থ্যাঁদা। যেমন চেহারা, তেমনি মেজাজ। তবে মানুষটা একটুও কুড়ে ছিল না। সারা দিন চরকি বাজির মতো ঘুরে ফিরে কাজ করে যেত। কিন্তু বেজায় বদ্-মেজাজি।

থেকে থেকেই কেশবের গিন্নী পাড়ার প্রত্যেকটি মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া

করত ; অকারণে বা সামান্য কারণে মাধবকে বেজায় বকত ; লোকের সামনেই স্বামীর সঙ্গে তর্ক করত আর রাতে শুতে গিয়ে বকাবকি করে বেচারার ভূত ভাগাত। মাসের মধ্যে পনেরো দিন রাগারাগি করে দুপুরে ভাত খেত না। স্বামীর সঙ্গে আগের রাতে ঝগড়া হলে, পর দিন দুপুরে উপোস করত। তবে রাতে লুকিয়ে ভাত খেত কি না সেটা বলতে পারছি না। গাঁয়ের অনেকে ওকে রায়-বাঘিনী বলত। বাস্তবিক-ই মেয়েমানুষ তো ছিল না, স্রেফ বাঘিনী। গাঁয়ের ছোট ছেলেরা নিজেদের মধ্যে ওকে বলত 'খেঁকি'। কারণ যদিও কথাটা বলা উচিত নয়, ঠিক নেড়ি কুত্তোর মতো দিন রাত দাঁত বের করে খ্যাঁক-খ্যাঁক করত। এমন মানুষের অন্নপ্রাশনের সময় কেন যে তার নাম রাখা হয়েছিল সুধামুখী, সে কথা কে বলবে। এ নিশ্চয়ই ওদের জ্যোতিষী মশায়ের কাজ। তিনি নিশ্চয়ই গণনা করে টের পেয়েছিলেন যে এ মেয়ের জন্মক্ষণে সূর্য চাঁদ গ্রহ তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, তাই ব্যঙ্গ করে ঐ নাম রেখেছিলেন।

এই সুধামুখীটি মালতীর জীবনে একটা যন্ত্রণার মতো ছিল। প্রথম কিছুদিন ওর সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছিল ; কিন্তু মানুষের স্বভাব যায় না মলেও, ক্রমে ক্রমে বদ মেজাজ প্রকাশ পেতে লাগল আর মালতী বেচারির অশান্তির শেষ রইল না। যাই করুক মালতী, শাশুড়ী সর্বদা বিরক্ত। মালতীর ঘুঁটে ত্যাড়াবাঁকা, মালতীর রান্না মুখে দেওয়া যায় না, মালতীর চলাফেরা ছোটলোকের মতো, মেয়েমানুষের মতো না হেঁটে, চলে যেন একটা ব্যাটাছেলে। মালতীর গলার আওয়াজ শোনা যায় না, মনে হয় যেন সাপ হিশ্ হিশ করছে। মালতীকে কিছু বললে তার মুখে একটা বিশ্রী দেমাকি ঢ্যাটা হাসি দেখা যায়। এই রকম সব মন্তব্য করত সুধামুখী। কাদম্বিনীর মতো একজন মিষ্টি স্বভাবের ননদিনী কাছে না থাকলে, মালতীর জীবন অসহ্য হয়ে উঠত। এই বিধবা ননদটি মালতীকে সুবুদ্ধি দিত, সান্ত্বনা দিত, সমব্যথী বন্ধুর মতো ব্যবহার করত।

প্রথম প্রথম মনে হত সময়ের সঙ্গে মালতীর অবস্থার উন্নতি হবে। মোটেই তা হল না। কেশবের সেই পুরনো জ্বরটা জাঁকিয়ে এল; এবার কেশবের জীবনের অবসান হল। তাতে সুধামুখীর মন-মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। এমনিতেই মানুষটা বদ্-মেজাজি, তার ওপর স্বামী মারা যাওয়াতে ওর সাংসারিক সুখ সব ঘুচল; ফলে মেজাজ আরো খিঁচড়ে গেল। আগের চাইতেও সুধামুখী আরও বেশি খেঁকি হয়ে উঠল। গ্রামের লোকে বলত, খেঁকি কুকুর এবার বাঘিনী হয়ে উঠেছে! তবু তার চিরদিনের সমব্যথী কাদম্বিনীর আদরে মালতী সব সহ্য করে গেল। সাধারণতঃ হিন্দু ছেলেরা মাকে ভারি ভক্তি করে; মায়ের খিটখিটে স্বভাব সত্ত্বেও মাধব তাকে বড় শ্রদ্ধা করত। স্ত্রীকেও সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত; তার জন্যেও ওর বড় সহানুভূতি। তবু কোনো উপায় ছিল না; যার কোনো ওষুধ নেই, তা সইজেই হবে। খুন করাও যেমন মাধবের পক্ষে অসম্ভব ছিল, মাকে ছেড়ে আলাদা হওয়াও তেমনি অসম্ভব। সে হবার নয়। গাঁয়ের লোকে কি বলবে? সারা বর্ধমান জেলার উগ্র-ক্ষত্রিয় সমাজ কি বলবে? নিশ্চয় বলবে, "ঐ দেখ, মাধবটার কোনো কর্তব্যজ্ঞান নেই! একেবারে যাকে বলে কুপুত্র! বৌয়ের হুকুমে মাকে ছাড়ল, যে মা স্বয়ং ভগবতীর সমান! যে দেবী তাকে জন্ম দিয়েছে, তার চাইতে শেষটা বৌ-ই বড় হল! ছি! ছি!" এইভাবে চিন্তা করাই হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক। কাজেই মায়ের কাছ থেকে কোনো দিনও আলদা হওয়ার চিন্তা মাধব মন থেকে দূর করে দিল। যে অবস্থার ওপর কারো কোনো হাত নেই, তা মেনে নিতেই হয়, এই সব বলে সে স্ত্রীকে বোঝাতে লাগল।

একদিন রাতের বেলায় ঘরে ঢুকে মাধব দেখে মালতী বিছানার পাশে বসে কেঁদে ভাসাচ্ছে। মাধব ব্যাকুল হয়ে উঠল, "কি হয়েছে বল, মানিক? কাঁদছ কেন?" মালতী কোনো উত্তর না দিয়ে কেঁদেই চলল। মাধব বলল, "বল, রানী, তোমার কিসের দুঃখ?

মনের কথা আমার কাছে খুলে বল। আমি কি তোমার প্রাণের পতি নই ? তোমার শরীরের এখন এই অবস্থা, এ-সময়ে বেশি কান্নাকাটি করতে নেই। তার ফল মন্দ হতে পারে। বল কি হয়েছে।"

মালতীর দম আটকে আসছিল; কোনমতে বলল, "ওগো আমার আর বাঁচার ইচ্ছা নেই। জীবন একটা বোঝার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মলেই জ্বালা জুড়োয়। হাড়ে বাতাস লাগে, শান্তি পাই। ভগবান আমাকে নিচ্ছেন না কেন ?" এই বলে কান্নায় মালতী ভেঙে পড়ল।

মাধব ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে, হাঁটুতে গোজা মুখখানি তুলে ধরে আদর করে বলল, 'বল, সোনা, আমাকে সব কথা বল। যত মন্দ কথাই হক, আমাকে খুলে বল। এ অবস্থায় তোমার কান্নাকাটি করা ভালো না। শুনেছি তাতে অমঙ্গল হয়।"

মালতী বলল, "ভগবান আমার এ অবস্থা না করলেই ভালো হত। নিজের জীবনটাই অসহ্য হয়ে উঠেছে, আবার একটা ছোট ছেলে কোলে নিয়ে আনন্দ করব কি করে ? ভগবান, তুমি আমাকে তুলে নাও!"

"কিন্তু এত দুঃখের কি কারণ ঘটেছে, সে-কথা বলছ না কেন ? তুমি আমার চোখের মণি, আমাকে সব বল।"

"কি আবার বলব ? আমার মাথা আর মুণ্ডু ! হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেলাম ! আজ দুপুরে তুমি মাঠে গেলে পর, শাশুড়ী ঠাকরুণ আমার গালে চড় মেরেছেন।"

"মা তোমাকে চড় মেরেছে ? তাই কি সম্ভব ! হায় বিধাতা ! আমার কপালে এ কি লিখেছ ! এত যন্ত্রণাও সইতে হবে ! কিন্তু মা তোমাকে মারল কেন ?"

"কেন মারলেন ? জানতো আজ একাদশী, মা ভাতটাত খাবেন না। তাঁর জন্য একটু দুধ জ্বাল দিতে বসিয়েছিলাম। দুধ বসিয়ে, আমাকে কি একটা আনতে ভাঁড়ার ঘরে যেতে হল। সেখান

থেকে ফেরবার আগেই দুধ উথলে, কড়াই থেকে খানিকটা পড়ে গেল। উঠোন থেকে তাই দেখে, শাশুড়ী আমাকে বকাবকি গালাগালি করতে লাগলেন। আমি শুধু বলেছিলাম, 'মা, আমাকে বকছেন কেন? ইচ্ছে করে তো আর করিনি!' শাশুড়ী তাতে রেগে উঠে, রান্নাঘরে ঢুকে আমার গালে চড় মেরে বললেন, 'মুখোমুখি কথা বলতে শিখেছিস, পাজি মেয়ে। জানিস না শাশুড়ী হল দেবতা!" মাধব বলল, "এ কি যন্ত্রণা! আরো কি কপালে আছে কে জানে! কিন্তু তোমাকে মারা ভারি অন্যায়। মাকে বলতে হবে।"

"বলে কি হবে? তুমি কি ভেবেছ যে তুমি বললেই ওঁর স্বভাব বদলাবে? কয়লার রঙ যায় না ধুলেও, মানুষের স্বভাব যায় না মলেও। ও বদ-মেজাজ সারবার নয়। একেবারে হাড়ে হাড়ে বদ-মেজাজ!"

"তাহলে কি করা যায় বল মালতী?"

"আমি কি বলব? যা বলব তা তো আর করবে না। আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে ওঁকে এ-বাড়ি থেকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতাম।"

"ছি! ছি! ও-কথা মুখে এনো না, মালতী। যে মা আমাকে জন্ম দিয়েছে, দেবতাদের চাইতেও যাকে বেশি মান্য করা উচিত, সেই মা-কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব? মায়ের আগে বৌকে বসাব? এমন চিন্তাও পাপ! বৌকে ত্যাগ করলে পাপ হয় না, কিন্তু মাকে ত্যাগ করা মহাপাপ!"

মালতী বলল, "তা হলে সায়েবরা কেন বিয়ে করলেই আলাদা থাকে? ঘাটে স্নান করতে গিয়ে বামুনদিদির কাছে শুনে এলাম। কে যেন নীলের কারখানায় কাজ করে, তার কাছে উনি শুনেছেন। আমার তো মনে হয় নিয়মটা খুব ভালো। তা হলে শাশুড়ী-বৌয়ের ঝগড়া বন্ধ হয়।"

"হায় কপাল! এ কি সর্বনাশের কথা! সায়েবদের নিয়ম!

হ্যাঁ গা, সায়েবদের নিয়মের সঙ্গে আমাদের কি ? তবে কি আমাকে সায়েব হতে হবে আর তুমি হবে বিবি! পাগল হলে নাকি ? এ-সব কথা তোমার মাথায় কে ঢুকিয়েছে বল তো ?"

"কিন্তু আমাদের স্বজাতির মধ্যেও তো কেউ কেউ আছে, যারা মায়ের কাছ থেকে আলাদা থাকে। দক্ষিণ পাড়ার ছিদাম পাল আছে। সে তার মাকে কিছু উপোস করিয়ে রাখে না, তাকে খেতে পরতে দেয়। কিন্তু তার আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তুমিও তাই করতে পার না কেন ?"

"আচ্ছা, ঐ হতভাগা নিজের মাকে আলাদা করে দিয়ে কি সুনামটা কিনেছে শুনি ? সবাই তাকে গাল দেয় না ? বলে না ওকে কুপুত্র, ছেলে নামের অযোগ্য ? এ হতে পারে না। আর কখনো মার কাছ থেকে আলাদা হবার কথা বল না—ও-কথা মুখে আনাও পাপ। যে ছেলে মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে বৌয়ের সঙ্গে থাকে, তার মরাই ভালো। সে মলে পর তার হাড় থেকে দুব্বো ঘাস গজাবে, তার আত্মা নরকে গিয়ে পচবে। না, না, আলাদা হওয়া-টওয়া কিছুতেই চলবে না। মাকে আমি বুঝিয়ে বলব আর তুমিও একটু চেষ্টা করে বনিবনা করে নাও। এ তোমার-ও দোষ নয়, মায়ের-ও দোষ নয়, যা কপালে লেখা আছে তা'তো হবেই। বিধির বিধান থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।"

মাধবের ঐ শেষ যুক্তিটির কোনো উত্তর খুঁজে পেল না মালতী। কপালে যা লেখা আছে তা মেনে নিতেই হবে। মালতীর মন হতাশায় ভরে গেল। কি আর করে বেচারি ? পরদিন যেই একটু সুযোগ পেল অমনি মাধব মাকে বোঝাতে বসল। তাকে নরম গলায় বলল, বৌকে মারাটা ভালো দেখায় না, বিশেষতঃ এই সময়। সঙ্গে সঙ্গে সুধামুখীর মুখ দিয়ে অমৃত ঝরে পড়তে লাগল, "অমনি লক্ষ্মীছাড়ি গিয়ে লাগিয়েছে বুঝি ? বিয়ের সময় বলিনি আমি কাঞ্চনপুর অতি খারাপ জায়গা, ওখানে কখনো বিয়ে

করতে হয় না! বিশেষতঃ ঐ পাজি সামন্তদের বাড়িতে! তা তোমার বাবার যেমন বুদ্ধি! আমার মত না নিয়েই অমনি কথা দিয়ে এল! বৌ বুঝি এখন আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চায়? আর তুমিও তেমনি কুপুত্র! বৌয়ের নফর! রোজ রাতে বৌয়ের লাথি খাও! তুমি এসেছ মাকে বকতে! মুখপোড়া মেয়ে কোথাকার! হারামযাদী! দেখতে মানুষ, কিন্তু মনে মনে রাক্ষসী! মুখে ঝাঁটা মারো! আর অমনি আমার কুপুত্র এলেন বৌয়ের হুকুমে মাকে শিক্ষা দিতে! বলি বৌ তোকে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচেছে বুঝি! আর এই মা-টা দশ মাস তোকে পেটে ধরেনি, তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় তোকে জন্ম দেয় নি? হারামযাদীকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দে। ওর চেয়ে ঢের ভালো বৌ এনে দেব। এমন নেমক-হারমীকে ঝাঁটা মেরে বিদেয় করে দে।"

এই মধুর বন্যা আর অমৃতের ঝড়ের মুখ থেকে মাধব পালিয়ে বাঁচল। একবার-ও দু ঠোঁট ফাঁক না করে, মাঠে গিয়ে ভগবানের দেওয়া খোলা বাতাসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রান্নাঘর থেকে কাদম্বিনী সব কথাই শুনেছিল। সে মালতীকে সান্ত্বনা দিতে লাগল, বোঝাতে লাগল গুরুজনদের কথা মেনে নেওয়াই ভালো; ভাগ্যের বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না।

সুধামুখী কিন্তু এত বিষ ঝেড়েও ঠাণ্ডা হল না। অনেকক্ষণ ধরে বিড়বিড় করে কি সব বকতে লাগল; মাটিতে আঙুল মটকাতে লাগল; উত্তেজনার চোটে বাড়িময় দাপিয়ে বেড়িয়ে আর দুমদাম করে দরজা বন্ধ করে, ঝনঝন করে মাটিতে বাসনপত্র আছড়ে, মনে ঝাল ঝাড়তে লাগল। মনে হচ্ছিল সে একেবারে ক্ষেপে গেছে। তাতে মালতী আর কাদম্বিনী এতটুকু আশ্চর্য হল না; এ-সব দেখে দেখে তাদের অভ্যাস হয়ে গেছিল। সেদিন সুধামুখী মালতীর সঙ্গে একটাও কথা বলল না; নিজের মেয়ের দিকেও হাঁড়িমুখে তাকিয়ে রইল; মায়ের ধারণা কাদম্বিনীর মালতীর জন্যে

যত সহানুভূতি। পরদিন সুধামুখীর ভ্রূকুটি একটু কম মনে হল; এইভাবে দিন কেটে যেতে লাগল।

যথাসময়ে মালতীর সুন্দর একটি ছেলে হল। মাধব ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব, কাজেই সে তার স্ত্রীকে একমাস আঁতুড় ঘরে বন্ধ থাকতে দিল না। তার বদলে হরির লুটের ব্যবস্থা করল। বৈষ্ণবদের মধ্যে এই নিয়মের প্রচলন ছিল। যে-দিন ছেলে হল সেই দিন-ই, কিম্বা ছেলে যদি রাতে জন্মায় তো তার পরদিন, ছেলের মা উঠে স্নান করে, হরিরলুট দিয়ে, ঘরকন্নার কাজে লেগে যায়, যেন কিছুই হয়নি। বদ্যিরা আর কবিরাজরা বলতেন এতে প্রসূতির বিপদ হতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবরা বলে বিপদ হয় শুধু অবিশ্বাসীদের। হরির ওপর বিশ্বাস থাকলে হরিই প্রসূতিকে রক্ষা করেন, যদি সে হরির লুট দেয়। দুর্গানগরে খবর রটে গেল মাধবের বাড়িতে হরির লুট হবে। সন্ধ্যার দিকে যথাসময়ে দলে দলে ছেলেরা এসে মাধবের বাড়ির খোলা উঠোনে জড়ো হল। মাধব এক ঝুড়ি মিষ্টি নিয়ে ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগল। ছেলেরা মুখে হরিবোল দিয়ে, কাড়াকাড়ি করে মিষ্টি খেয়ে, মহা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল। এই হল হরির লুট। আশ্চর্যের বিষয় যে এমন বেহিসাবী ব্যবহারেও মালতীর কোনো ক্ষতি হল না।

যথাসময়ে ছেলের নাম রাখা হল যাদব। কেশবের ছেলে মাধব, মাধবের ছেলে যাদব। হিন্দুরা নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে রাখতে বড় ভালোবাসে।



ধানের জয়

সায়েবরা ধানকে বলে 'প্যাডি'। কথাটা যে কোত্থেকে এল তা অনেকেই জানে না। আসলে মালয়-দেশে ধানকে বলে 'পাডি'। বাংলায় কেউ ও-কথা ব্যবহার করে না; সবাই বলে ধান; সংস্কৃতে বলে ধান্য। পর্তুগীজরাই সম্ভবতঃ মালয় দ্বীপ থেকে 'পাডি' কথাটির আমদানি করেছিল। ধান আমাদের প্রধান খাদ্য। মনে হয় আর্যরা এদেশে আসবার আগেও এখানকার লোকে ভাত খেত। পুরনো লাতিন গ্রীকে ধানকে বলা হয়েছে 'ওরাইজা'। সম্ভবতঃ তার থেকেই ইংরিজি 'রাইস' এসেছে। অনেকের মতে গ্রীক 'ওরাইজা' তামিল 'অরিসি' থেকে নেওয়া। সে যাই হক গে, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি দরকার? তার চাইতে বাংলার ধান-চাষের কথাই শোনা যাক।

ধান বোনার আর ধান কাটার সময় হিসেবে বাংলায় তিন রকম ধান হয়: আউশ, আমন আর বোরো। আউশ কথাটা এসেছে আশু থেকে। আশু মানে শীঘ্র। এ ধান চোত-বোশেখে বোনা হয়, ভাদ্র মাসে কাটা হয়। আশু ধানের চাল বেশ মোটা; বড়লোকেরা আর মধ্যবিত্তরা এ চাল খায় না। চাষীরাই খায়; কিন্তু পরিমাণে খুব বেশী হয় না বলে, শুধু আশু ধানে ওদেরও চলে না। আশু ধান হয় শুধু উঁচু জমিতে যে জায়গা বর্ষার জলে ডুবে যায় না।

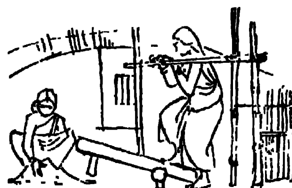
আমন ধান পাকে হেমন্ত কালে। 'আমন' কথাটাও 'হেমন্ত' শব্দ থাকতে এসে থাকতে পারে। এটাই হল বছরের প্রধান ফসল। জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ায় কিম্বা শেষে বোনা হয়, পাকে গিয়ে অঘ্রাণ-পৌষে। নানা রকম মিহি মোটা ধান হয় এ-সময়। সব অবস্থার লোকের সারা বছরের সংস্থান হয়। বোরো ধান লাগানো হয় মাঘ ফাল্গুনে, কাটা হয় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে। শুকনো সময়ের ধান; নিচু জলা জমিতেই এর চাষ হয়। কাঞ্চনপুরে আর বর্ধমান জেলার অন্যান্য জায়গাতেও খুব বেশি বোরো ধানের চাষ হয় না। এখানকার জমি উঁচু, শুকনো, বোরোর অযোগ্য।

সময়ের হিসাবে এই তিনরকম ধান হলেও, এক আমন ধানেরই অজস্র জাত। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বলে একজন বিজ্ঞ বাঙ্গালী ভারতের কৃষিকর্ম নিয়ে একখানি তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা লিখেছিলেন, তাতে শুধু ২৪-পরগণাতেই উৎপন্ন ১১৯ রকম ধানের নাম দেওয়া আছে। সীলনে (এখন যার নাম শ্রীলঙ্কা) নাকি ১৬০ রকম ধানের চাষ হয়। বাংলার সব জেলায় কিন্তু একই রকম ধানের ফলন হয় না। একেক জায়গার চাষীরা কতকগুলো বিশেষ জাতের ধানের চাষ করে থাকে। যেমন পূর্ব-বাংলায় বাখরগঞ্জে বালাম চালের চাষ হয়। বালাম একেবারে আটপৌরে চাল। দিনাজপুর রংপুর অঞ্চলে মিহি চালের ধান চাষ করা হয়। কাঞ্চনপুর আর বর্ধমানে যে সব ধানের চাষ হয়, তার মধ্যে আছে: নোনা, বাঙোটা, কালিয়া, বেনাফুলি, রামশালি, চিনিসর্করা, সূর্যমুখী, দাদখানি, আলম-বাদশাহী, রাঁধুনী-পাগল। ঐ শেষেরটির এমনি সুগন্ধ আর চাল-ও এমনি মিহি যে রাঁধতে রাঁধতে রাঁধুনীর নাকি পাগল হবার জোগাড়!

ধান চাষের কোনো অদ্ভুত নিয়ম নেই। প্রথমে লাঙল দেওয়া হয়; তারপর মাটির ঢেলাগুলোকে মই দিয়ে ভেঙে সমান করা হয়; তারপর হাতে করে বীজ-ধান বোনা হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই বীজের কল বেরোয়, কচি পাতা বেরোয়। আষাঢ়ে বর্ষা নামার আগে

পর্যন্ত কচি ধান-গাছে খুব যত্ন করে সেচ দিতে হয়। ভগবানের দয়ায় প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি পড়লে তবে সেচের ভাবনা ঘোচে। সেচের ভাবনা ঘুচলেও, চাষীর ভাবনা ঘোচেনা। বৃষ্টি কম হলে, ধান-গাছ শুকিয়ে যায়। বড় বেশি বৃষ্টি হলে ধান-গাছ ডুবে পচে যায়। গাছগুলি শেকড় নামিয়ে, মাটিতে বেশ করে গেড়ে বসবার আগেই বর্ষা নামলে ফসলের ক্ষতি হয়। আসল কথা হল, বর্ষার আগে গাছগুলো খানিকটা বড় হয়ে গেলে, অনেকখানি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যেমন ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে, গাছও তর-তর করে বাড়তে থাকে। বাখরগঞ্জ, যশোর, এ-সব হল ভিজে মাটির দেশ। সেখানকার ধান-গাছ অনেক সময় দশ-বারো ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। বর্ষার শেষে ধানের বোঁটা ঝুঁকে পড়ে; ঐ অবস্থায় কার্তিকের শিশির খায়। তারপর অঘ্রাণে ধানে কাস্তে পড়ে।

ঢেঁকির সাহায্যে ধানের বাইরের খোসা ছাড়ানো হলে, তবে চাল তৈরি হল। সব জাতের চালই দু রকম হয়: সিদ্ধ আর আতপ। সিদ্ধ চালের ধান আগে খানিকটা সেদ্ধ করে, শুকিয়ে, তবে ছাঁটা হয়। আতপ চালের ধান সেদ্ধ হয় না, রোদে শুকিয়ে ঢেঁকিতে ছাঁটা হয়। শতকরা নিরেনব্বুই জন বাঙালী সেদ্ধ চাল বেশি পছন্দ করে। এ চাল সস্তা আর এতে তত পেট গরম হয় না: আতপ দেবতার ভোগে লাগে; গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা আর বিধবারা খায়; আবার



সায়েবরাও খায়। দেবতা, ব্রাহ্মণ, বিধবা, এরা আতপ খায়; কারণ সেদ্ধ হয় না বলে এ চাল শুদ্ধ আর সায়েবরা আতপ খায়

কারণ চালটা দেখতে সাদা আর পুষ্টিকর বেশি। এই তো গেল ধানের রহস্য।

অগ্রাণের গোড়ার দিকে নবান্নের উৎসব হয়। এই সময় মাঠে প্রথম ধান পাকলে, মানুষে সে-ধান মুখে দেবার আগে, দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা হয়। তখনো আসল ফসল কাটার সময় হতে এক মাস দেরি থাকে। এ-ধান বিশেষ করে এই নবান্ন উৎসবের জন্যেই আগে থাকতে আলাদা করে লাগানো হয়। আসল ফসল তখনো সোনালী রঙ ধরে মাঠে মাঠে শোভা পাচ্ছে। সোনালী হলেও, সে ধান কাটার যোগ্য হতে কিছু বাকি আছে। সারা বাংলায়, বিশেষ করে চাষীদের ঘরে, এ বড় আনন্দের দিন।

গোবিন্দ আজ গোরু নিয়ে মাঠে যাবে না। ওর বাবা-কাকা ক্ষেতে যাবে না। সমস্ত গ্রাম-বাংলায় চব্বিশ ঘণ্টার জন্য চাষের কাজ বন্ধ থাকবে। ভোর থেকে দেখা যাচ্ছে পথে-ঘাটে, ঘরে-ঘরে লোকে হাসছে, গল্প করছে, আয়েস করছে আর বসে তামাক টানছে। সবাই বেশ সকাল সকাল স্নান সেরে নিয়েছে, কারণ জ্যোতিষীদের মতে বেলা সাড়ে দশটা হল ভোগের সব চাইতে শুভ-মুহূর্ত। স্নান না করে তো আর কেউ প্রসাদ খাবে না।

আলঙ্গা, সুন্দরী আর আদুরী সব কিছুর আয়োজন করেছে। বড় ঘরের এক কোণে একটা ঝুড়িতে খানিকটা নতুন ধানের চাল রয়েছে মানুষ বা পশু সে চাল এখনো মুখে দেয়নি।

ঐ যে বড় হাঁড়িটি, ওটি দুধে ভরতি। আরেকটি ঝুড়িতে সময়কার যত রসাল ফল-মূল কুটে রাখা হয়েছে। পুরুত-ঠাকুর রামধন চক্রবর্তী সবে এসে পৌঁছেছেন ; লগ্ন হয়ে এল বলে। বড় একটা পাত্রে তিনি নতুন আতপ চাল, দুধ, ফল-মূল এক সঙ্গে মাখলেন। অনেকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। শাঁখ বাজালেন। দেবতারা বোধ হয় টের পেলেন খাবার তৈরি এবং নিশ্চয় অদৃশ্যভাবে দলে দলে এসে উপস্থিত হলেন। শাঁখ বাজিয়ে পুরুৎ-ঠাকুর দেবতাদের ভোগ



নিবেদন করলেন। তারপর পঞ্চ ভূতকে, মানব জাতির আদি পুরুষদের, সত্যযুগের মুণি ঋষিদের আর সবার শেষে বদনের নিজের পূর্বপুরুষদের ভোগের ভাগ দেওয়া হল।

বদন কিম্বা তার বাড়ির লোকরা নবান্ন মুখে দেবার আগে, আরো অন্য অতিথিদের-ও দিতে হবে। গাই-বলদকে নবান্ন দেওয়া হল। তাদের সাহায্য না পেলে, চাষীরা কোথায় ধান পেত? তাছাড়া আরো জীবজন্তু আছে; মহাদেবের প্রিয় শেয়ালদের কিছু দিতে হবে; আকাশের পাখিদেরও না দিলে চলবে না। পুরুত গোবিন্দকে বললেন শেয়ালদের জন্য ঝোপের মধ্যে কলাপাতায় করে খানিকটা নবান্ন রেখে আসতে। পাখিদের জন্যেও পাঁচিলের ওপর খানিকটা রাখতে। মাছদের জন্য পুকুরে এক মুঠো ফেলা হল। দেয়ালের কোণে একটা গর্তের কাছে ইঁদুর, পিঁপড়ে, পোকা-মাকড়দের জন্য কিছু দেওয়া হল। স্বর্গ মর্ত্য পাতালের সব দেবতাদের, সব রকম পশু পাখিদের, এইভাবে খাইয়ে দাইয়ে, বদন কালামানিক আর গোবিন্দ পাশাপাশি আসনপিঁড়ি হয়ে বসে কৃতজ্ঞ মনে ভগবানের এই অজস্র দানের ভাগ খেল। তারপর সবার শেষে, ভগবানের শেষ, এবং শ্রেষ্ঠ কীর্তি যে বাড়ির মেয়েরা তারা খেল। এইভাবে নবান্নের ধর্মানুষ্ঠানটি শেষ হল।

তারপর যা হল সেটা আরো মজাদার। সেদিনের দুপুরের খাওয়াটি একটা ভোজ-বিশেষ না হলে কি করে চলে? আলঙ্গা তার চমৎকার আয়োজন-ও করেছিল। বদনরা ছিল বৈষ্ণব, কাজেই মাংস ডিম তাদের বারণ। মদটদ কোনো হিন্দুই খেত না। অতএব ভোজের বিশেষত্বটা কোথায় সেটা সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে। কি কি খাওয়া হল বলি। প্রথমে ভাত, ভাত ছাড়া কখনো বাঙালীর খাওয়া হয়? তারপর ডাল। তারপর সরষের তেলে ভাজা দু তিন রকম তরকারি। তারপর উচ্ছে-বেগুন পটল আলু পানিফল দিয়ে ভাজা শুক্তো। তারপর একটা পাঁচ-

মিশেলী তরকারি। তারপর মাছের ঝাল, তারপর মাছের অম্বল। আর সবার শেষে সব চাইতে ভালো জিনিসটি অর্থাৎ পায়েস।

বাঙালী চাষীর কাছে একেই মনে হয় মহা ভোজ। সায়েবরা হয়তো এ ভোজের ফিরিস্তি শুনে হেসে কুটিপাটি হবে, কিন্তু এ-কথাও সবাইকে মানতেই হবে যে পুষ্টির দিক থেকে কিঞ্চিৎ কম হলেও, এ ধরনের খাওয়া ইউরোপের ভোজনবিলাসীদের গুরুপাক খাওয়া আর মদ্যপানের চেয়ে ঢের কম অনিষ্টকর। সে যাই হক, মেয়েরা রান্নাঘরে থাকুক, আমরা গিয়ে দেখে আসি পথে ঘাটে আর গাঁয়ের নানা জায়গায় পুরুষরা কি করছে।

এক জায়গায় দুটি আম-বাগানের মধ্যিখানে অনেকখানি ঘাস জমি। সেখানে শতখানেক ছেলে বুড়ো আমোদ করছিল। আমাদের গল্পের নায়ক তার বাবা কাকার সঙ্গে, তাদের মধ্যে জুটল। বেশির ভাগই নানা জাতের চাষী, তা ছাড়া অনেক কারিগরও ছিল। গোবিন্দর সব বন্ধুরাই ওখানে হাজির হয়েছিল। কামারের ছেলে নন্দ, ছুতোরের ছেলে কপিল, ময়রার ছেলে রসময়, মুদীর ছেলে মদন, নাপিতের ছেলে চতুর আর তাঁতীর ছেলে বোকারাম। সকলেরই ভারি ফূর্তি দেখা গেল। আনন্দের চোটে চিৎকার, হাততালি,হো হো হাসি। একদল ডাণ্ডাগুলি খেলছিল; দু ফুট লম্বা বাবুল কাঠের ডাণ্ডা, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা ঐ কাঠেরই মোটা গুলি। গোবিন্দর বন্ধু আর মিতা এই দলে ছিল, কাজেই সে ও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। দেখতে দেখতে গুলি ঠেঙিয়ে সব চেয়ে দূরে মেরে, আবার গুলিটা ফিরে এলে তাকে ঠিক পিটিয়ে, গোবিন্দ বেশ নাম কিনল। বদনের বয়স হয়েছিল; সে এ সমস্ত খেলা ধুলোয় যোগ না দিয়ে, আরো কজন বয়স্ক চাষীদের সঙ্গে গাছ তলায় বসে তামাক খেতে লাগল। কিন্তু ডাণ্ডা গুলিতে ছেলের বাহাদুরি দেখে সে আর কিছুতেই মনের খুসি চেপে রাখতে পারছিল না। দুম দাম করে আকাশে গুলি উড়তে লাগল। হঠাৎ একটা ছেলের কপালে লাগল। বুড়োরা:

অমনি তার কাছে ছুটে গেল। চামড়া কেটে রক্ত পড়ছিল। ছেলেটার বাড়ির লোকরা তাকে নিয়ে চলে গেল, কিন্তু মহা ফুর্তির সঙ্গে খেলা সমানে চলতে লাগল।

একটু দূরেই একদল ছেলে হাডু-গুডু খেলছিল। অন্য জেলায় এই খেলাকে বলে হাডু-ডুডু। যতক্ষণ দম রাখা যায় খেলোয়াড়রা 'হাডু-গুডু! হাডু-গুডু!' বলতে থাকে বলেই বোধ হয় ঐ নাম হয়েছে। আর তো কোনো মানে ভেবে পাচ্ছি না ছেলে-ছোকরাদের খেলা; অনেকটা নকল যুদ্ধের মতো। মাঝখানে একটা দাগ কেটে, বন্দুক কামান কিছু লাগে না। একটা লাঠি পর্যন্ত নয়। নইলে বাঙালী যোদ্ধা কিসের? খেলা শুরু হলে এক দলের একজন খেলোয়াড় দাগটি পার হয়ে শত্রুদের এলাকায় হানা দেয়। শত্রুদলের কাউকে ছুঁয়ে সে যদি ধরা না পড়ে, নিজেদের এলাকায় ফিরে আসতে পারে, তা হলে যাকে সে ছুঁয়েছিল সে 'মোর' হয়ে গেল; অর্থাৎ খেলা থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে হবে। এখন মুশ্‌কিল হল যে ঐ হানাদারকে একবারও দম না ছেড়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে আসতে হবে; যদি তা না পারে, তাহলে সেই হয়ে যায় 'মোর'। যে দলের সব খেলোয়াড় আগে 'মোর' হয়, সে দল হারল। 'মোর' কথাটার মানে মরা।

অন্য দিকে গাছতলায় কুস্তি খেলা চলেছিল। এখানে ছেলে-ছোকরা নয়, জোয়ান মদ্দরা খেলায় মেতেছিল। কালামানিকের এখানে খুব নাম ডাক। খেলার জায়গার মধ্যিখানে কালামানিকের সঙ্গে প্রায় ওরই সমান ষণ্ডা এক খেলোয়াড়ের কুস্তি চলেছিল। পরস্পরের কোমর জাপটে ধরে এ ওকে মাটিতে শুইয়ে দেবার চেষ্টা চলেছিল। দুজনেই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল, কে জেতে তার ঠিক কি। একবার মনে হচ্ছিল এই বুঝি কালামানিক মাটিতে পড়ল, আবার মনে হচ্ছিল অন্য খেলোয়াড়টি পড়ল! শেষটা সবাই জয়ধ্বনি দিতে লাগল। কালামানিক সেই লোকটিকে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে!

নবান্নের দিন এই ভাবে গাঁয়ের ছেলে বুড়ো দুপুরের গরমে আর বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ায়, গাছতলায় কিম্বা পুকুর পাড়ে কিম্বা খোলা মাঠে নানা রকম খেলায় মেতে আমোদ করে। সন্ধ্যে হলে খেলা ভেঙে যায়, সবাই বাড়ি যায়। বাড়িতে তাদের মা বোন, বৌরা ভালো ভালো জিনিস রেঁধে তাদের জন্যেই বসে আছে।

নবান্নের এক মাস পরে ফসল কাটা হয়। তখন চাষীদের ঘরে ঘরে কি আনন্দ। সব ধান এক সঙ্গে কেটে ফেলার দরকার হয়। বদন তাই তার যে সমস্ত বন্ধুদের জমি ওর-ই জমির লাগোয়া, তাদের সকলের সাহায্য নিত। এদের মধ্যে সবার আগে পদ্মলোচন পালের নাম করতে হয়। পদ্মর মেজ মেয়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে বদনের পরিবারের ওপর ওর ভারি টান। গোবিন্দ মেয়ের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিল; কালামানিক জল থেকে তুলে এনেছিল; টান হবে না কেন? ধান-কাটার দিন বন্ধুরা সকলে দড়ি, কাস্তে, বলদ ইত্যাদি নিয়ে কাজে লেগে গেল। তিনজনের হাতে কাস্তে, বদনের, কালামানিকের আর পদ্মর। বাঁ হাতে ধান-গাছের গোছা ধরে, উবু হয়ে বসে, ডান হাতে ওরা কাস্তে চালাচ্ছিল। সঙ্গে আরো লোকজন ছিল, তারা কাটা ধান গাছের আঁটি বাঁধছিল। তারপর অনেকগুলি আঁটি এক সঙ্গে বলদের পিঠে বোঝাই করে বাড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়া।

কালামানিকের গায়ে অসুরের মতো বল; সে সব চাইতে বেশি ধান কেটে ফেলছিল। প্রকাণ্ড একটা হাত দিয়ে এক রাশি ধান-গাছ ধরে, ঠোঁট দুটো কামড়ে প্রায় মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে, ঝপাঝপ ধান কেটে যাচ্ছিল সে। কাস্তে থেকে মশ্—মশ্—মশ্ শব্দ বেরোচ্ছিল; তার সঙ্গে থেকে থেকে কালামানিকের নাকের অন্ধকার গুহার মতো দুই মস্ত মস্ত ফুটো থেকে একটা হুঁঃ! হুঁঃ! শব্দ মিলে দিব্যি সঙ্গীত তৈরি হচ্ছিল।

কাটা ধান বস্তাবন্দী করে বলদের পিঠে চাপানো হচ্ছিল।

গোবিন্দর কাজ হল বলদ নিয়ে বাড়িতে ধান পৌঁছে দেওয়া। বাড়িতে আরো কজন চাষী-বন্ধু অপেক্ষা করেছিল, ধান-গাছের আঁটিগুলোকে গাদা করে রাখতে হবে। ফসল কাটার কদিন গোবিন্দকে যে কতবার ধান নিয়ে মাঠ থেকে বাড়ি আবার বলদ নিয়ে বাড়ি থেকে মাঠে, যাওয়া-আসা করতে হয়েছিল তার হিসাব কে রাখে। তবে অন্যদের চেয়ে ওর কাজ কম ছিল, কারণ কাটা ধান আঁটি বাঁধা হবে, বস্তায় ভরা হবে, তবে তো বলদের পিঠে তোলা হবে। কাজেই মাঝে মাঝে কাজের মধ্যে ফাঁক পড়ছিল। সেই সময়টা গোবিন্দ তামাক খেয়ে, কিম্বা যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ক্ষেত থেকে পড়ে-থাকা ধান কুড়োতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে কাটাচ্ছিল। সেকালের ইহুদী চাষীদের মতো হিন্দু চাষীরাও ফসল কেটে আঁটি বেঁধে তোলার সময়, যে-সব ধানের শীষ মাটিতে পড়ে যায়, সেগুলিকে তুলে না নিয়ে ছেলেমেয়েদের জন্য ফেলে রাখে। তারাও সারা দিন ধরে যা কুড়োয়, তাই নিয়ে মুদীর দোকানে গিয়ে, তার বদলে তেলে ভাজা নরম নরম মটর কলাই নিয়ে আসে। ফসল কাটার সময় মুদীর দোকানে ঐ জিনিসটির আবির্ভাব দেখা যায়।

ছোট ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে হাসিখুসি একটি মেয়ে ছিল; তার সঙ্গে গোবিন্দ বেশি গল্প করছিল। এই মেয়ের নাম ধনমণি; সে হল পদ্ম পালের বড় মেয়ে। মাত্র এগারো বছর বয়স। গোবিন্দ গামছায় বেঁধে মুড়ি-মুড়কি এনে থেকে থেকেই এক মুঠো নিয়ে নিজের মুখে ফেলছিল, আবার ধনমণিকেও দিচ্ছিল। তাছাড়া ওর ছোট্ট ঝুড়িটাও ধানের শীষ দিয়ে ভরে দিচ্ছিল। অবস্থাপন্ন চাষীদের ছেলেমেয়েরাও ধান কুড়োতে আসত; তাতে কেউ কোনো লজ্জার কারণ দেখত না। যারা ধান কাটছিল, আঁটি বাঁধছিল, আর অন্যান্য কাজ করছিল, তাদের সকলের জন্য দুপুরবেলা গোবিন্দ ভাত নিয়ে এল। মাঠের কাছেই এক বড়-গাছের তলায় খাওয়া-দাওয়া

হল। সকলের সেকি ফুর্তি। ধনমণিও তার বাপের পাশে বসে পেট ভরে খেয়ে দেয়ে, গোবিন্দ যখন বলদ বোঝাই করে আবার রওনা দিল তার সঙ্গে নিজেদের বাড়ি গেল।

বদনের ধান কাটা হল; বাড়ির উঠোনে ধানের আঁটি গাদা করা হল। তারপর আগে থেকেই যেমন কথা ছিল, বদন গেল পাড়া-পড়শীদের ধান কাটায় সাহায্য করতে। সকলের ধান কাটা হয়ে গেলে, আছড়াই মাড়াইয়ের কাজ শুরু হল। বর্ধমানের চাষীরা এ কাজের জন্য কোনো যন্ত্রপাতি বা লাঠি-সোঁটা ব্যবহার করে না। প্রথমে একটা মোটা তক্তাকে আড়ভাবে বসিয়ে তারপর ধানের আঁটি দু হাতে ধরে, গায়ের জোরে তার ওপর আছড়ায়। বার বার আছড়ানোর ফলে সমস্ত ধানের দানা বোঁটা থেকে খুলে আসে। এর পরেও যদি কিছু ধানের দানা বাকি থেকে যায়, সমস্ত খড়গুলো এক সঙ্গে করে, উঠোনের মাটিতে বিছিয়ে বলদ দিয়ে মাড়ানো হয়। ইহুদীরাও এই নিয়ম পালন করত। তবে একটা তফাৎ ছিল। এখানকার গোরুর মুখ এই সময় বেঁধে রাখা হয়, পাছে খড় খেয়ে ফেলে। ইহুদীরা তা করত না।

এই মাড়ান দেওয়া খড়কে গোছা করে বাঁধা হয়। তাকে বলা হয় 'লোট'। বোধ হয় সবটা লট-পট হয়ে যায় বলে ঐ নাম হয়েছে। সাধারণ খড়ের চাইতে এর দাম বেশি। ঘর ছাইবার জন্য এই খড় ব্যবহার হয়। সে যাই হক, এর পর ধানগুলো গোলায় তোলা হয়, খড় গাদা করে রাখা হয়।

ফসল-কাটার কিছু দিন পরেই আরেকটি উৎসব। এ-উৎসবে চাষীরা খুব আনন্দ করে। উৎসবের নাম পিঠে সংক্রান্তি বা পৌষ পার্বণ, পৌষ মাসের শেষ দিনে, অর্থাৎ ইংরিজি জানুয়ারির মাঝামাঝি, বাংলার ঘরে ঘরে হিন্দু মেয়েরা পিঠে পুলি তৈরি করে। তিন দিন ধরে উৎসব চলে। প্রথম দিন খুব ভোরে আলজা, সুন্দরী আর আহুরী স্নান সেরে, মুগ, কলাই, বরবটির বিচি ইত্যাদি সেদ্ধ করে বেটে রাখে।

চালের গুঁড়ি আগে থাকতেই করা থাকে। নারকেল কোরা হয়; তারপর গুড় দিয়ে পাক দিয়ে নারকেলের পুর তৈরি হয়। কেউ কেউ ক্ষীরের পুরও করে। এই সব উপকরণ দিয়ে, নানা রকম পিঠে গড়ে ভাজা হয়। কোনোটাকে বা দুধে ফুটিয়ে নিয়ে দুধ-পুলি করা হয়। গরীব মানুষরা অত দুধ ক্ষীর কোথায় পাবে? তারা অনেক সময় নলেন গুড় দিয়ে পিঠে খায়।

আরেক রকম পিঠেও হয়। তাকে বলে আস্কে পিঠে। এগুলো মাপে একটু বড় হয়। চালের গুঁড়ি আর কলাই-বাটা দিয়ে গোলা করে, শুকনো খোলায় হাতায় করে ঢেলে, বাটি চাপা দিয়ে, জলে ভাজতে হয়। আস্কে দু রকম হয়। শুকনো আর নরম। শুকনো আস্কে ঝোলা গুড় দিয়ে খেতে হয়। নরম আস্কে দুধে বা ক্ষীরে জ্বাল দিয়ে নেয়। আরেক রকম খুব পাৎলা পিঠে আছে, তাকে বলে সরু-চাকলি। এ জিনিসটি সকলেই খুব ভালোবাসে।

আলঙ্গা রাশি রাশি পিঠে করেছিল: বাড়িসুদ্ধ সকলে সাধ মিটিয়ে খেয়েছিল। মা-ষষ্ঠীর জন্য বেড়ালের আকারে প্রকাণ্ড একটা পিঠে ভেজেছিল আলঙ্গা। শৌখীন লোকরা হয়তো এইসব আটপৌরে মিষ্টি পছন্দ করে না আর সত্যি কথা বলতে কি, পিঠেগুলো হয়তো ততটা উপকারীও নয়; কিন্তু চাষীদের বাড়ির লোকরা পিঠে খেতে খুব ভালোবাসে আর পিঠে খেয়ে তাদের কোনো অনিষ্টও হয় না।

নবান্ন-উৎসবের মতো পৌষ-পার্বণেও গাঁয়ের ছেলেরা নানা রকম খেলাধূলো করে। বলতে ভুলে গেছি যে উৎসবের প্রথম দিন সন্ধ্যা বেলায় কাঞ্চনপুরের ছেলেরা দল বেঁধে সুর করে পৌষ মাসের ছড়া গায়। সে-সব ছড়ায় পৌষ মাসের গুণগান করা হয়েছে আর সেই সঙ্গে বছরে বছরে পৌষ যেন ফিরে আসে, এই প্রার্থনাও আছে।

এর আগেই বলা হয়েছে যে কাঞ্চনপুরের স্নানের ঘাটে কিছুদিন থেকে পদ্ম পালের মেয়ের সঙ্গে আমাদের গল্পের নায়ক গোবিন্দের বিয়ে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তাই বলে যে ধান কাটার সময়

লেখক মশাই ইচ্ছে করে ধনমণির সঙ্গে গোবিন্দর দেখা-শুনো করিয়ে দিয়েছেন, সে-কথা ঠিক নয়। লেখকের সে-রকম কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। বিয়ের সম্বন্ধের কথা ছেলে-মেয়ে কেউ-ই জানত না। দুই পক্ষের বাপ-মারা যে তাদের বিয়ের সম্বন্ধ করছে, এমন কথা তাদের স্বপ্নেও মনে হয়নি। এমন কি গোবিন্দ যদি সে-কথা শুনত, তাহলে সে ধনমণির সঙ্গে কথাও বলত না, কাছেও যেত না। আর ধনমণি নিজে যদি শুনত, তাহলে গোবিন্দর কাছ থেকে অনেকখানি তফাৎ রেখে চলত। বিয়ের ব্যাপারে বাঙালীদের এই রকম মনের ভাব।

ইউরোপের মতো মেলামেশা করে বিয়ে ঠিক করা দূরে থাকুক, গ্রাম-বাংলায় যদি কোনো ছেলে-মেয়ের মা-বাবা তাদের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করে থাকে, তাহলে ছেলে-মেয়ে এক সঙ্গে বেড়ালে কিম্বা কথা বললে, সকলে তাদের অভদ্র বেয়াড়া বলে নিন্দে করবে। অবিশ্যি গোবিন্দর মনে ধনমণির প্রতি বন্ধুত্বের চেয়ে একটু বেশি টান ছিল না, এ-কথা আমি হলপ্ করে বলতে পারছি না। তবে ধনমণির যে গোবিন্দর প্রতি কোনো দুর্বলতাই ছিল না, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই আসল ব্যাপার হল বিয়ের সম্বন্ধের কথা ওরা কেউ-ই জানত না

আলঙ্গার এখন বয়স হয়েছে, মরবার আগে নাতির বিয়ে দেখার তার ভারি শখ। আর সব বাঙালী মা-দের মতোই সুন্দরীও ভাবত ছেলের বৌ ঘরে এল, নাতি কোলে করতে পারলাম-এর চাইতে সুখের কথা আর কি হতে পারে? বদন-ও যে এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিল, তা নয়। সব মা-বাপের মতো, বিশেষ করে সব হিন্দু মা-বাপের মতো, বদনেরও ইচ্ছা হত চোখ বুজবার আগে ছেলেমেয়ে সংসারে গুছিয়ে বসুক। গোবিন্দর জন্য একজন উপযুক্ত পাত্রী খুঁজতে গিয়ে, পদ্ম পালের মেয়ের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পদ্ম পালের-ও মোটেই আপত্তি ছিল না। ফসল-কাটার আগেই সম্বন্ধ এক রকম ঠিক হয়ে ছিল, শুধু পাকা কথা হওয়াটুকু বাকি ছিল।

ঘরে ফসল উঠল; তারপর পৌষ পার্বণের পিঠেও খাওয়া হল।

তারপর সম্বন্ধটা বিধিমতে পাকা করা হল। ফাল্গুনের একটা শুভদিনে বিয়ের তারিখ ঠিক হল। ফাল্গুন হল বিয়ের মাস। এখানে আরেকটা বিয়ের বর্ণনা দিতে পাঠককে বিরক্ত করে তুলবনা, যদিও তাতে কোনো দোষ হত না, কারণ বাংলা হল বিয়ের দেশ। যাই হক, মালতী মাধবের বিয়েতে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল, গোবিন্দর বিয়েতেও সে সব হল। সেই উলু দেওয়া, সেই হলুদ মাখা, সেই ঢাকের বাদ্যি, সেই কলা-গাছের চারদিকে ঘোরা, গোবিন্দ বেচারার পিঠে সেই দুম-দাম কিল, সেই মঙ্গল-কামনা, মেয়েদের সেই হাসি-ঠাট্টা, বাসর-ঘরের সেই একই দৃশ্য, সেই খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদ। এবার আমোদ-আহ্লদটা একটু বেশি করেই হয়েছিল কারণ একই গ্রামের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হচ্ছে; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই সেখানে উপস্থিত আর সবাই সবার চেনা।

গোবিন্দর সব আত্মীয়রা এসেছিল। তাদের মধ্যে ছিল দুর্গা-নগর থেকে মালতী আর মাধব, তাদের ছেলে যাদব আর মালতীর ননদ কাদম্বিনী। বিয়ের কদিন ধরে সব চাইতে কাজের চাপ পড়েছিল বদন, আলঙ্গা আর সুন্দরীর ওপর। তাদের হাজার রকম কাজ। কাজের লোক বলতে ওদের পরেই গঙ্গা নাপিত আর রামধন মিশ্র পুরুতঠাকুরের নাম করতে হয়। গঙ্গা করল ছোটখাটো কাজগুলো আর রামধন করলেন বড় আর সম্মানিত কাজগুলো। গুরুঠাকুর আসতে পারলেন না, কারণ, ঐ সময় তিনি অন্য দিকে শিষ্যবাড়ি টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর বদলে তিনি প্রেমভক্ত বৈরাগীকে পাঠিয়েছিলেন। বিয়েতে উপস্থিত থাকা ছাড়াও এই লোকটির নিজের কিছু মতলব ছিল। সে কথা পরে জানা গেছিল।

বলা বাহুল্য, গোবিন্দর সঙ্গত, বন্ধু, মিতা আর বাকি তিন সঙ্গীও রোজ এসে হাজিরা দিত আর রোজ পাত পাড়ত। রামরূপ গুরু-মশাইও লাঠি বগলে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে তাঁর প্রাক্তন ছাত্রকে

আশীর্বাদ করে গেলেন। এক টাকা প্রণামীও পেলেন। তাছাড়া সেই যে রূপার মা, যার হাতে গোবিন্দ জন্মেছিল, তার অকপট আনন্দের কথা না বললে অন্যায় হবে। বিয়ের আগে পরে দশ দিন ধরে বুড়ি বাড়ি গেল না। বদনের বাড়িতে খেল শুল আর প্রাণ দিয়ে গতর খাটাল। তবে জাতে ছোট হওয়াতে যতটা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল, ততটা পারেনি। তবু সে হাজার বার বর-কনেকে আশীর্বাদ করেছিল আর আলঙ্গার সৌভাগ্যের তারিফ করেছিল।

আলঙ্গাকে রূপার মা বলেছিল:

"সব মেয়ের চেয়ে তোমার-ই ভাগ্য ভালো। ছেলে হলেই লোকে বলে এ মেয়ের ভাগ্য ভালো। সে কথা বাদ দাও, তুমি তোমার নাতির বিয়েও দেখলে, নাতনির ছেলের মুখও দেখলে। আর জন্মে নিশ্চয় অনেক পুণ্যি করেছিলে, নইলে এত সৌভাগ্য হয় না। কথায় বলে না, 'নাতির নাতি, স্বর্গে বাতি'।"

আলঙ্গা বলল, "সবে তো নাতনির ছেলে দেখলাম, কাজেই কথাটা এখনো ফলেনি। তবে দেবতাদের অনেক দয়া যে আমাকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন।

"তুমি পুণ্যবতী; মা-লক্ষ্মীর সঙ্গে তোমার কোনো তফাৎ নেই।"

"কেমনধারা পুণ্যবতী? তাই যদি হতাম, তাহলে জীবনে কি এত কষ্টও পেতাম?"

"কষ্ট কোথায়? তুমি সাক্ষাৎ রাণীর মতো। রাণীদের চেয়েও তোমার কপাল ভালো। কজন রাণী নাতির ছেলে দেখে যায়?"

"কি যে বল, রূপার মা! আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলে গয়ারাম সাপের কামড়ে মল, আবার বলছ, ভাগ্যবতী! নিশ্চয় অনেক পাপ করেছিলাম, নইলে এমন সর্বনাশ হয় কখনো? দেবতারা নিশ্চয়ই আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন। হায় রে গয়া, আমার সোনার চাঁদ, আমার হারানো মাণিক! কোথায় আছিস রে তুই? বুড়ো মাকে ফেলে কোথায় গেলি, বাপ!"

রূপার মা অপ্রস্তুত, "দেখ গিন্নীমা, গোবিন্দর বিয়ের দিন ওসব অলুক্ষুণে কথা চিন্তা কর না। গোবিন্দকে কোলে নিয়ে তোমার আবার দুঃখ কিসের ? ভগবান ওকে বাঁচিয়ে রাখুন। ওর কত ছেলে-মেয়ে হবে দেখো, তখন আনন্দে তোমার বুক ভরে যাবে।"

"ঠিক বলেছ, রূপার মা। কিন্তু আমার গয়াকে সাপে খেল, তাকে আমি কি করে ভুলি বল ! দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে !"

"দেখ গিন্নীমা, ও-সব দুঃখের কথা এখন বাদ দাও। গোবিন্দর বিয়েতে আনন্দ কর। ওদের আশীর্বাদ কর, ওর জন্যই তোমার মন থেকে সব বিষাদ দূর হয়ে যাবে।"

আলঙ্গা বলল, "তাই হক। ভগবানের দয়ায় গোবিন্দ আমার চিরজীবী হক, সম্পূর্ণ সুখী হক। তবে আমার কপালে আর সুখ লেখা নেই। মলে পরে তবে আমি সুখী হব। হাড়ে বাতাস লাগবে। যা চেয়েছিলাম তা এবার হয়ে গেল, গোবিন্দর বিয়ে দেখলাম। এই চোখ দিয়ে তার বৌ দেখলাম। আর আমার কোন বাসনা নেই। এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব। এবার তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, কোনো তীর্থস্থানে গিয়ে এই দুঃখের জীবন শেষ করি।"

"ও-কথা বল না, গিন্নীমা। ও-সব চিন্তা মন থেকে দূর কর। এবার উঠে আমোদ-আহ্লাদে যোগ দাও দিকি। গোবিন্দর ছেলে না দেখে যাবে কোথায় ?"

ঠিক সেই সময় বদন দৈবাৎ সেখানে এসে উপস্থিত ; দুই বুড়িতে কথা বলছে, কিন্তু মায়ের গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। বদন বলল, "ও কি মা ! তুমি কাঁদছ ? সবাই আনন্দ করছে আর তুমি কাঁদছ ?"

আলঙ্গা বলল, "বাবা, ও হল সুখের হাসি, আবার দুঃখেরও হাসি।" বদনকে বলে দিতে হল না যে গয়ারামের অকাল মৃত্যুর জন্য মায়ের চোখে জল। কাজেই সে বলল, "দেখ মা, এমন আনন্দের দিনে আর দুঃখের কথা দিয়ে মন ভরে রেখো না। গয়ার

চাল ফুরিয়েছিল, তাই সে মরল। ওর পরমায়ু শেষ হয়ে গেল, ও চলে গেল। কপালের লিখন কে খণ্ডাতে পারে বল? কাজেই শোক করে কোনো লাভ নেই। তাছাড়া তোমার গোবিন্দ আছে। তার সুখে তুমিও সুখী হও। এক গোবিন্দর মধ্যে সাত গয়া ফিরে পাবে। এবার ওঠ মা, আমার সঙ্গে এসো। কত মেয়ে-বৌ আমোদ করতে এসেছে, ওদের সঙ্গে কথা বল। এসো, গোবিন্দর বৌয়ের চাঁদমুখখানি দেখ।"

এই বলে মায়ের হাত ধরে বদন তাকে যেখানে একদল মেয়ে আমোদ-আহ্লাদ করছিল সেখানে নিয়ে গেল।

বর্ধমান জেলার সমস্ত অবস্থাপন্ন চাষীদের মতো, বদনেরও একটা আখের ক্ষেত ছিল। ধান ঘরে তুলতে না তুলতে, আখ কাটার সময় হয়ে গেল। তবে আখ পাকলেই কেটে ফেলার নিয়ম ছিল না। কিছুদিন রাখা হত, রসটা জমলে তবে কাটা হত। কাজেই ধান কাটার মাসখানেক পরে আখ কাটা হত। অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষের দিকে। অন্ততঃ কাঞ্চনপুরের লোকেরা তাই কাটত।

বাঙালী চাষীদের কাছে আখের অনেক দাম। তেমনি ধানের চাইতে আখের যত্নও বেশি নিতে হয়, খাটতেও হয় বেশি। এদেশের আখের রসের পৃথিবীময় চাহিদা। দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও ফরমায়েস আসত। আখের বিষয়ে দু চার কথা বললে দোষ হবে না।

গত বছর আখ কাটার সময়, বদন আখ-গাছের মাথাগুলো কেটে, নিজের বাড়ির পুকুর ধারে লালনপালনের জন্য লাগিয়ে রেখেছিল। ক্ষেতের মাটি তৈরি হলে, এই কলমগুলো তুলে সেখানে লাগানো হয়েছিল। ধান-ক্ষেতের ওপরে ওপরে লাঙল দিলেই প্রচুর ফসল হয়, কিন্তু আখ-ক্ষেতের বেলা অন্য রকম। আখের জমিতে অনেক-বার খুব যত্ন করে লাঙল দিতে হয়। ফাল্গুনের শেষের দিকের

মধ্যেই, মাটি উল্টে দিতে হয়। তারপর তিনচারবার লাঙ্গল তো লাগেই. কখনো বা আরো বেশি দরকার হয়। তারপর সার দিতে হয়। গোবরের সঙ্গে ভাঙা দেয়ালের সুরকি আর খোল মিশিয়ে সারটি তৈরি হয়। তারপর আরেকবার লাঙ্গল দেওয়া দরকার। মাটিতে ঢেলা থাকলে সেগুলো ভেঙে দিয়ে, সমস্ত ক্ষেতটার ওপর বলদের সাহায্যে মই টেনে মাটিটাকে সমান মোলায়েম করে দিতে হয়। তারপর মাঠ জুড়ে লম্বা লম্বা সমান্তরাল আলির মতো করে দিতে হয়, তাদের মাঝে মাঝে একটা করে লম্বা খাঁজ। এই খাঁজের মধ্যে এক হাত দূরে দূরে আখ-গাছগুলো লাগাতে হয়। মাপবার সময় হাতের মুঠো বন্ধ রাখতে হয়। লাগাবার সময় প্রত্যেকটি কলমের গোড়ার চারদিকে খানিকটা খোলের গুঁড়ো সার দিতে হয়। বৃষ্টি নামার অনেক আগে আখ-গাছ লাগানো হয়, কাজেই কাছাকাছি কোনো পুকুর থেকে ছোট নালা কেটে জল এনে মাটি ভেজা রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। নালা থেকে বালতি করে জল তুলে ক্ষেতময় ছড়াতে হয়। পনেরো দিন ধরে রোজ এইভাবে জল দিতে হয়। আরো গোবর আর খোল দেওয়ার দরকার হয়। এবার গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ে দিতে হয়। তারপর নতুন করে নালার জল আরো চার-পাঁচ দিন ধরে দিতে হয়। যখন সমস্ত জলটা মাটিতে শুষে নেয়. তখন আলির মাটিগুলো ভেঙে নিয়ে প্রত্যেকটি গাছের চারিদিকে আলবালের মতো করে দিতে হয়। এই হল প্রথম পর্যায়।

যদি দেখা যায় কলম থেকে শেকড় নামেনি, পাতা বেরোয় নি, তাহলে বারে বারে সার দিতে, জল দিতে হবে, যতদিন না শেকড় গজায়। গাছটার বাড় যখন দু-ফুটের মতো হয়, তখন বাড়তি পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে. বাকি পাতা গাছের চারিধারে জড়িয়ে বেঁধে দিতে হয় এই সময়ে ক্ষেত থেকে আগাছা তুলে ফেলতে হয়। গাছ শুকনো মনে হলে, আরও জল দেওয়া দরকার। ততদিনে বর্ষা নেমে যায়,

আকাশ থেকে অঝোর ধারায় জল পড়ে; নালা করে আর জল দেবার দরকার থাকে না। এখন চাষীর প্রধান কাজ হল আগাছা সাফ করে দেওয়া আর গাছগুলোর ওপর নজর রাখা। নজর রাখা এইজন্য দরকার যে আখ-গাছে এক বিশেষ জাতের পোকা ধরে, চাষীর এত খাটুনি সব ব্যর্থ করে দেয়। তাছাড়া ক্ষেত পাহারা দিতে হয়, যাতে রাতে শেয়াল এসে না আখ খায়। মানুষের মতো শেয়ালরাও আখ চিবিয়ে মিষ্টি রসটি খেতে ভালবাসে। এইভাবে অনেক যত্ন করে কাঞ্চনপুরের চাষীরা আখের চাষ করত।

ওখানে তিন রকম আখের চাষ হত, পুরী, কাজুলে আর বোম্বাই। শেষেরটা দেখতে কালো মতো আর পুরী কাজুলের চাইতে অনেকটা লম্বা আর মজবুত। তবে কাঞ্চনপুরে এ আখ খুব বেশি হত না, তার একটা কারণ এর জন্য অনেক বেশি ভিজে মাটির দরকার। কাঞ্চনপুরের জমি উঁচু আর শুকনো। আরেকটা কারণ হল যে চাষীদের বিশ্বাস বোম্বাইয়ের রস সব চাইতে বেশি হলেও, মিষ্টত্ব অনেক কম। কাজুলে রঙ গায় বেগুনি, তার রস নাকি সব চাইতে মিষ্টি। মুশ্‌কিল হল এ আখ আপনা থেকেই ফেটে যায়, হয়তো রসের আধিক্যে; অমনি ওতে রাজ্যের পোকা-মাকড় লাগে। এর চাষ বেশি করে করলে মজুরি পোষায় না।

কাজেই সব চাইতে বেশি চাষ হত পুরীর। এর রঙটা সাদার সঙ্গে ফিকে হলুদ মেশানো লম্বায় হয় সাড়ে তিন থেকে চার হাত। কাঞ্চনপুরে পুরী ছাড়া অন্য আখের বিশেষ চাষ-ই হত না।

মধুর ফাল্গুন মাসে একদিন ভোর বেলায় দেখা গেল বদন, কালামানিক, গোবিন্দ, গোবিন্দর শ্বশুর পদ্ম পাল আর বদনের বন্ধু কিম্বা প্রতিবেশী দশ-বারোজন চাষী বদনের আখের ক্ষেতে আর তার চারপাশে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ কাস্তে দিয়ে আখ-গাছ কাটছে। কেউ আখের গায়ে জড়ানো শুকনো পাতাগুলো খুলে ফেলে, আখের বোঁটার আগাটা কেটে আলাদা করে রাখছে। কেউ

কেউ আবার তৈরি আখ-গাছগুলোকে আখ-শালে নিয়ে যাচ্ছে। আখ-শাল হল ক্ষেতের কাছেই তখনকার মতো তৈরি করে নেওয়া একটা মাটির ঘর। আখের রস বের করা হলে, সেখানে নিয়ে গিয়ে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হয়। আখ-শালে আছে প্রকাণ্ড উনুন, বিশাল বিশাল মাটির হাঁড়া চাপিয়ে আখের রসে জ্বাল দেওয়া হয়। অনেক সময়ই ঘর বলতে সেরকম কিছু থাকে না; বাঁশের খুঁটির ওপর একটা খড়ের চাল বসানো, এই হল আখ-শাল। মাঝে মাঝে তাও থাকে না: আম কিম্বা অন্য বড় গাছের তলায় উনুন তৈরি করে আখের রস জ্বাল দেওয়া হয়।

যে চালা-ঘরে রস জ্বাল দেওয়া হয়, তার ঠিক বাইরেই থাকে আখ চিপে রস বের করবার যন্ত্র। প্রকাণ্ড দুটো কাঠের বেলনার মতো জিনিস, তাদের সারা গায়ে খাঁজ কাটা, দু'দিকেই চাকা লাগানো। চাকা বলতে ঠিক চাকা নয়, কারণ তাদের বেড়গুলো নেই, আছে শুধু পাখিগুলো। এই বেলনা দুটো এত কাছাকাছি বসানো যে মধ্যিখানে সামান্য একটু ফাঁক থাকে। সেই, ফাঁকের মধ্যে আখ ঢুকিয়ে দিয়ে, বেলনা ঘোরালেই চাপ খেয়ে, আখ পিষে যায় আর রসটা পড়ে তলায় রাখা একটা মস্ত মাটির পাত্রে। দুপাশে দুটি লোক দাঁড়িয়ে ফাঁকের মধ্যে ক্রমাগত আখ ঢোকায় আর চারজন লোক অনবরত বেলনা ঘুরিয়ে যায়। বেলনা দুটি খুব কাছাকাছি বসানো থাকে বলে, মধ্যিখানে আখ ঢুকিয়ে চাকা ঘোরাতে দস্তুর মতো হাতের জোর দরকার। কাজেই এই কাজের জন্য বলিষ্ঠ লোকের দরকার হয়। সারা গাঁয়ে আখের চাকা ঘোরাতে কালামানিকের মতো ওস্তাদ আর একজন-ও ছিল না।

বদনের আখ-শালে কালামানিককে দেখা গেল, লম্বা লম্বা দুই পা মধ্যিখানের খানাটার দু পাশে গেড়ে বসিয়ে, প্রায় অমানুষিক শক্তি দিয়ে চাকা ঘোরাচ্ছে। কখনো জোর দেবার সময় দুই ঠোঁট একসঙ্গে চিপে ধরছে, কখনো ঠোঁট ফাঁক করে সঙ্গীদের হাত চালাতে

উৎসাহ দিচ্ছে! এত দিনে আমাদের গোবিন্দও লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল; সে-ও চাকা ঘোরাতে ব্যস্ত ছিল। বদন আর পদ্ম বেলনার ফাঁকে আখ গুঁজছিল। সে কাজও খুব সহজ নয়। সত্যি কথা বলতে কি, এই কাজেরই বিপদ সব চাইতে বেশি, কারণ দুই বেলনার মাঝখানে পড়ে আঙুল চটকে যাবার বড় ভয়।

এরপর পাত্র থেকে রসটা ঢেলে নিয়ে জ্বালে বসানো হয়। তলায় গনগনে আগুন রাখতে হয়। তাই দু পাশে দুজন বসে শুকনো আখের পাতা ইত্যাদি উনুনে পুরতে থাকে। যারা বসে জ্বাল দিচ্ছে, তাদের হাতের কাছে একজন করে লোক দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের কাজ হল বড় বড় কাঠের হাতা দিয়ে ফুটন্ত রসটা ক্রমাগত নাড়া আর গ্যাঁজ জমলে, সেটা তুলে ফেলা। আখ-শাল আর আখ-মাড়াইয়ের কলটাকে বদনের সম্পত্তি মনে করলে ভুল হবে। কাঞ্চনপুরের উত্তর পাড়ায় আর পুবের পাড়ায় যত চাষীর আখের ক্ষেত ছিল, আখ-শাল আর রসের কলটা তাদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি। একের পর এক, তাদের সকলের আখ থেকে এখানে গুড়, ঝোলাগুড় তৈরি হয়। বাঙালী চাষীরা চিনি তৈরী করে না। চিনি তৈরি করা হল গিয়ে ময়রাদের কাজ।

গাঁয়ের দক্ষিণ অঞ্চলেও এই রকম আরেকটি আখ-শাল তৈরি করা হয়েছিল। সেখানেও দক্ষিণ পাড়ার আর পশ্চিম পাড়ার চাষীদের আখের রস করে, জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হত। এখানে বলে রাখা উচিত যে আখ-শাল প্রতিষ্ঠার সময় একটা রীতিমতো অনুষ্ঠান করা হত। বদনের আখের কল বসাবার সময়, ওদের পারিবারিক পুরুত-ঠাকুর রামধন মিশ্র এসে কল শুদ্ধ করেছিলেন। দুই দেবতার বিশেষ পুজো হয়েছিল: লক্ষ্মীর আর অগ্নিদেবের। লক্ষ্মী ঠাকুরুণকে যত না তাঁর অতীতের দানের কথা বলা হয়েছিল, তার চাইতেও বেশি করে ভবিষ্যতের দানের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। আর অগ্নিকে অনুনয় বিনয় করা হয়েছিল যেন আখ শালে আগুন ধরে না

যায়। মাঝে মাঝেই যারা আগুন দেখার ভার নিত, তাদের অসাবধানতার জন্য আখ-সাল পুড়ে ছাই হয়ে যেত।

আগেই বলা হয়েছে যে আখের কলের বেলনা দুটি খুব কাছাকাছি বসানো থাকে। তার ফলে কল চালালেই সে যে কি সাংঘাতিক আওয়াজ হয় সে আর কহতব্য নয়। পাড়া-প্রতিবেশীর কানে তালা লেগে যায়; এমনকি এক ক্রোশ-দেড় ক্রোশ দূর থেকেও শোনা যায়। তিন চার সপ্তাহ ধরে, কি দিনে কি রাতে—রাতেও আখের কলের থামা নেই—কাঞ্চনপুরের বাসিন্দাদের ঐ অপরূপ সঙ্গীত উপভোগ করতে হয়। এক বিদেশী কবি লিখেছেন—নরকের ফটক খুললে কর্কশ একটা হড়-হড় ঘস-ঘস শব্দ হয়। এ-ও ঠিক সেই রকম।

এই অসুবিধাটা সত্ত্বেও, গাঁয়ের আখ-শালের সুবিধা কত। ধান কাটার সময় মাঠে গ্রামে যে উৎসব লেগে যায়, তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আখ-শালে তার চেয়েও বেশি আনন্দের দৃশ্য দেখা যায়। প্রত্যেক দিন গাঁয়ের প্রত্যেকটি ছোট ছেলেমেয়ে আখ-শালে হাজির হয়। প্রত্যেককে এক টুকরো আখ দেওয়া হয়; তাদের প্রতি চাষীদের বড় স্নেহ। রোজ ছোটদের আর বামুনদের গোছা গোছা আখ দান করা হয়। দিয়ে চাষীরা নিজেরাও ভারি খুসি। ওদের বিশ্বাস এর ফলে আসছে বছর মা লক্ষ্মী আরো ফসল দেবেন। যে সব কিপটে কনজুষ চাষীরা আখ-শাল থেকে ছোটদের আর বামুনদের খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়, গাঁ-সুদ্ধ সকলে তাদের গালি দেয়।

আর শুধু আখ-ই নয়, বাটি হাতে ছেলেপুলে দাঁড়ালেই তাদের বাটি ভরে ফুটন্ত রস দেওয়া হয়। প্রায়ই বেগুন কি অন্য তরকারি রসের হাঁড়ায় ফুটিয়ে নিয়ে, মহা তৃপ্তির সঙ্গে ছেলেরা খায়। সারাদিন তারা দলে বলে আখ-শালার চারদিকে ঘোরাঘুরি করে। পাঠশালা তখন মাথায় ওঠে; দু-চার জনের বেশি সেদিক মাড়ায় না।



৯

এতক্ষণে বদনের আর তার পরিবারের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করা গেছে, কিন্তু বাঙালীদের পারিবারিক আর সামাজিক জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে তাদের ধর্ম—এ নিয়ম থেকে চাষীরা আর শ্রমিকরাও বাদ যায় না। অতএব তাদের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে আরও কিছু না বলাটা অন্যায় হবে। বাঙালী হিন্দুদের দুটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ যেমন শাক্ত আর বৈষ্ণব। যদিও হিন্দুরা বলে যে কৃষ্ণ হলেন বিষ্ণুর অবতার মাত্র, বাঙালী বৈষ্ণবরা তাঁকে, ভগবানের অংশ মনে না করে বরং পূর্ণ ব্রহ্ম বলেই পূজো করে। অর্থাৎ মানুষের আকারে তাঁকে স্বয়ং ভগবান বলেই মনে করে। বাঙালী বৈষ্ণবরা চৈতন্যদেবের ভক্ত ; তাকে তারা মূর্ত ভগবান বা কৃষ্ণের অবতার বলে বিশ্বাস করে। চৈতন্যদেবের আর তাঁর দুই শিষ্য নিত্যানন্দের আর অদ্বৈতানন্দের মানুষের মাপে মাটির মূর্তি গড়ে, তাতে রঙ দিয়ে, তার পূজো করে। কাঞ্চনপুর গ্রামের-ই শত শত লোক শ্যামসুন্দর নাম দিয়ে চৈতন্যদেবের প্রমাণ মাপের মাটির মূর্তির উপাসনা করে। তবে বাঙালী বৈষ্ণবদের প্রধান উপাস্য দেবতা হলেন মথুরার কাছে বৃন্দাবনের রাখাল-ছেলে কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রিয়া রাধা ছিলেন ষোলশো গোপিনীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনিও প্রায় কৃষ্ণের সমানই ভক্তি পান। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা হল বৈষ্ণবদের

নিত্য ধ্যানের বিষয়। এমন কোনো ধর্মপরায়ণ বৈষ্ণব নেই যে রোজ তুলসী মালায় অন্ততঃ একশো আটবার কৃষ্ণ নাম না জপে। বারে বারে কৃষ্ণের নাম জপাকেই হরিনাম করা বলে। বুড়ো-বুড়িরা সবাই সেকালে হরিনাম করত আর বিশেষ করে বিধবারা। আলঙ্গা দিনে দুবার নিয়ম করে করত, একবার দুপুরে খাবার আগে, একবার সন্ধ্যাবেলায়। এই বলে হরিনাম জপ করতে হয়:

হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ! হরে হরে! হরে রাম! হরে রাম! রাম রাম! হরে হরে!

আহ্লীরও মাঝে মাঝে জপ করত; তবে আলঙ্গার মতো নিয়মিত নয়।

তীর্থ ভ্রমণ হল বৈষ্ণব ধর্মাচারের আরেকটা দিক। বৈষ্ণবদের কাছে সব চাইতে পবিত্র তিনটি তীর্থস্থান হল মথুরার কাছে কৃষ্ণের বাল্য-লীলার ভূমি বৃন্দাবন: পুরীর জগন্নাথের মন্দির আর গুজরাটের দ্বারকা, এক সময় কৃষ্ণ যেখানে বাস করতেন। কিন্তু বর্ধমান জেলার মধ্যেই তিনটি পবিত্র তীর্থস্থান আছে। সেগুলি হল, চৈতন্যের বাসস্থান নবদ্বীপ: তারপর অম্বিকা, যেখানে নিত্যানন্দ কিছুকাল ছিলেন আর অগ্রদ্বীপ বলে একটি জায়গা, সেখানে গোপী-নাথের মন্দির আছে।

গোবিন্দর বিয়ের সময় থেকেই আলঙ্গার মনে হত তার সাংসারিক সুখের পালা শেষ হয়েছে। নতুন করে আর কোনো সুখের আশা তার ছিল না। এবার সংসারের বন্ধন কাটিয়ে, বাকী জীবনটা পুজো-আচ্চা আর তীর্থ-দর্শন করে কাটালেই ভালো। আলঙ্গা স্থির করল আগে বর্ধমান জেলার পবিত্র জায়গাগুলো দেখবে। তারপর সুযোগ বুঝে সংকটময় লম্বা পথ পার হয়ে, জগন্নাথ দর্শন করবে। আহ্লীর-ও বড় ইচ্ছা শাশুড়ীর সঙ্গে যায়। সে বলতে আরম্ভ করল যে বিধবা মানুষের বেঁচে থাকার কোনো সাংসারিক উদ্দেশ্য থাকে না। কারণ তার-ও ইচ্ছা বাকি জীবনটা তীর্থ করে কাটায়। এ-কথা

কতখানি সত্যি, সে বিষয়ে বদনের আর কালামানিকের মনে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও, তাদের মনে হল আদুরীর ধর্ম-পথে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না। অতএব তারাও মত দিল, বিশেষতঃ মা যখন সঙ্গে থাকছে।

শেষে একদিন গ্রামের আরো দুজন মেয়ের সঙ্গে আলঙ্গা, আদুরী তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ল। তাদের ইচ্ছা ছিল প্রথমে অম্বিকায় যাবে, তারপর দুর্গানগরে গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করবে। অম্বিকা থেকে দুর্গানগর বেশি দূর নয়। তারপর যাবে নবদ্বীপ ; সেখান থেকে অগ্রদ্বীপ হয়ে সোজা বাড়ি ফিরবে। যাত্রিনীরা প্রত্যেকে একটি করে পুঁটলিতে বেঁধে দু-একখানি কাপড়, একটু চাল, এক ভাঁড় সরষের তেল, একটা পেতলের থালা সঙ্গে নিল। এই নিয়ে ওরা দু-দিনে অম্বিকা পৌছল। প্রথমে গোঁসাই বাড়ি গিয়ে শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করে ওরা গাছতলায় নিত্যানন্দের পদচিহ্নের পুজো করল। সকলে মিলে পুণ্য ভাগীরথীর জলে স্নান করল। তারপর চার ক্রোশ দূরে দুর্গানগরে বিনা ক্লেশে পৌঁছে গেল। ঠাকুমা এসেছে বলে মালতী আহ্লাদে আটখানা। তাদের আদর-যত্ন করতে সে আর কিছু বাকি রাখল না। সেখানে দু-দিন থেকে, আলঙ্গারা বাংলার বৈষ্ণব-ধর্মের জন্মস্থান নবদ্বীপে পৌছল। সেখানে দেখবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। স্থানীয় লোকেরা বলল চৈতন্যদেবের বসতবাটী এখন নদীর গর্ভে। ভাগীরথী তার পথ বদলে পুরনো শহরের অনেকখানি গ্রাস করেছে।

নবদ্বীপ থেকে ওরা অগ্রদ্বীপে গেল। সেখানে 'মহোৎসব' শুরু হয়ে গেছিল। দেশের নানান জায়গা থেকে দলে দলে বৈষ্ণব এসে অগ্রদ্বীপে জড়ো হয়েছিল। বৈরাগী, বাউল, নাগা, নেড়া-নেড়ির দল, যে-যার অদ্ভুত সাজে। দিন রাত খোল, মৃদঙ্গ, করতালের শব্দ। গাঁয়ের পথে পথে তারা সব মহা ফুর্তিতে গোপীনাথের গুণকীর্তন করে বেড়াচ্ছিল। নেচে নেচে সবাই খ্যাপা হয়ে উঠছিল।

রাধাকৃষ্ণের নাম ধরে ডেকে ডেকে তাদের গলা ভেঙে যাচ্ছিল ; মুখে ফেনা উঠছিল ; ধর্ম-ভাবের চোটে তারা ডিগবাজি খাচ্ছিল। স্ত্রী-পুরুষ বিচার না রেখে, সব একসঙ্গে লাফাচ্ছিল। খ্যাপার মতো হাত-পা ছোঁড়ায় মেয়েরা যেন পুরুষদের-ও ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। বেদম বাজানোর চোটে কত মৃদঙ্গ, করতাল যে ফেটে চৌচীর হল, তার ঠিক নেই। হয়তো পঞ্চাশ হাজার তীর্থ-যাত্রী সেসময় ওখানে জুটেছিল ; তাদের উল্লাসের কোনো সীমানা ছিল না। আলঙ্গা আর আহুরী আনন্দ রাখবার জায়গা পাচ্ছিল না। তাদের মনে হচ্ছিল বুঝি সটাং বৈকুণ্ঠে চলে এসেছে।

বেশ কিছু দিন ধরে 'মহোচ্ছব' চলল। তার মধ্যে এক দিন আলঙ্গা, আহুরী আর তাদের দুই সঙ্গিনী নানান ভোলের বৈষ্ণব ভিক্ষুকদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, একটা বিশেষ দলকে লক্ষ্য করল। এদের গান-বাজনা অন্যদের চেয়ে আরো উন্মত্ত। এদের মধ্যে বিশেষ করে একটা মানুষের দিকে সকলে তাকিয়েছিল। তার কারণ হল এই লোকটির করতালের শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল আর নাচের ঢংটিও উন্মাদ পাগলের মতো। একটা কোপনি ছাড়া তার গায়ে কোনো কাপড় ছিল না ; মাথায় একটা লাঙ্গ মোচার মতো টুপি আর গলায় তিন ছড়া তুলসীর মালা। লোকটা বে-দম নাচছিল, গাইছিল, চেঁচাচ্ছিল। এই ঝপাৎ করে মাটিতে পড়ছিল, এই লাফিয়ে উঠে অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গি করছিল যেন দশায় পেয়েছে। লোকটা এমন কাণ্ড লাগিয়েছিল যে যারা বোষ্টমদের হাল-চাল জানত না, ওকে দেখে তাদের মনে হতে পারত যে লোকটা স্রেফ পাগল। তবে বোষ্টম যতই খ্যাপা হয়, লোকে তাকে ততই ভক্তি করে।

দর্শকদের চমৎকৃত করবার জন্য তো সে এই রকম সং-এর খেলা দেখাচ্ছিল, এমন সময় আহুরীর চোখের ওপর তার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ধপাস্ করে সে মাটিতে শুয়ে পড়ল, যেন,

একেবারে জ্ঞান হারিয়েছে! মুখ দিয়ে ফেণা উঠতে লাগল, শরীরটা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, বঁড়শী গিললে মাছের যেমন হয়। তার বন্ধুরা অমনি রব ওঠাল, "ওকে দশায় পেয়েছে!" মাটিতে যখন সে সটাং শুল, তখন আলঙ্গা আর আহুরী ওকে চিনতে পারল। আরে, এ তো সেই প্রেমভক্ত বৈরাগী, বদনদের বাড়ি থেকে কতবার ভিক্ষা নিয়ে গেছে। গোবিন্দর বিয়ের সময় গুরুঠাকুরের প্রতিনিধি হয়ে এই তো এসেছিল।

সঙ্গীরা প্রেমভক্তকে তুলে ধরে, তার মুখে একটু জল দিল। তখনো দশা ছাড়েনি, কাজেই সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "কি দেখলে? কি দেখলে?"

প্রেমভক্ত বলল, "দেখলাম গোপীনাথজীকে। তিনি বললেন এখানে দর্শকদের মধ্যে একজন মেয়ে আছেন, তিনি একদিন ভিক্ষু বোষ্টমীদের মধ্যে গৌরবে অতুলনীয়া হবেন।"

তারপর প্রেমভক্ত বলল, "গোপীনাথজী সেই মেয়েকে চিনিয়েও দিয়েছেন। অল্পবয়সী বিধবা সে; আরো তিনজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সে মহোচ্ছবে এসেছে; এ জায়গার উত্তর-পূব কোণে গাছ-তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে।" অমনি সবার চোখ সেদিকে ফিরল। ঠিক-ই তো! ঐ যে উত্তর-পূব কোণের গাছতলায় চারজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে; তাদের মধ্যে একজন একটি অল্পবয়সী বিধবা বটেই তো!

তখন ঐ বোষ্টম দলের পাণ্ডা আহুরীর কাছে গিয়ে তাকে প্রেম-ভক্তের কথা জানিয়ে বলল যে এ হেন অবস্থায় তার একমাত্র করণীয় হল ভেক্ নিয়ে, বোষ্টমী বনে, ঐ বৈরাগীদের দলে যোগ দেওয়া।

কি যে করা উচিত আলঙ্গা ভেবে পেল না। সরল গাঁয়ের মানুষ, তার একবারও মনে হল না যে এর মধ্যে কোনো বুজরুকি আছে। অথচ আহুরী তাদের বাড়ির বৌ, তার নিজের এত আদরের মানুষ,

তাকে ছেড়ে দিতেও মন চাইছিল না। এদিকে অন্য বোষ্টমরা এগিয়ে এসে আহুরীর কানে মধু ঢালতে লাগল। সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে, আহুরী ভেক্ নিতে রাজি হয়ে গেল।

ধর্ম-কর্মে তো দেরি করা চলে না; সঙ্গে সঙ্গে আহুরীকে বিধিমতে বোষ্টম দলে দীক্ষা দেওয়া হল। পুরুষ বৈরাগীদের কোনো রকম কামনা বাসনা থাকে না, কাজেই তারা বিয়েও করে না। আর বোষ্টমীরা তো দেবকন্যাদের সমান, তাদের আবার বিয়ে-থা কিসের। অথচ ভক্ত বৈরাগীদের একজন করে সঙ্গিনীর দরকার হয়, যার সাহায্য নিয়ে তাদের সাধন-ভজন চলে। এই পবিত্র উদ্দেশ্যে আহুরীকে শিক্ষা-দীক্ষার জন্য প্রেমভক্তর জিম্বা করে দেওয়া হল। যাহোক, তার জন্যই তো আহুরীর ভেক্ নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

আলঙ্গা বেচারি খাঁটি বৈষ্ণবী হলেও, তার বাড়ির একজনের এ-রকম সর্বনাশ হওয়াতে, সে তো কেঁদে ভাসাল। বিষণ্ণ মনে পরদিন সকালে, সঙ্গিনী দুজনকে নিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল। কাঞ্চনপুরে পৌঁছে, নিজেদের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আলঙ্গা মড়া-কান্না জুড়ে দিল। "ওরে আহুরী! তুই কোথায় গেলি!" সেই কান্না শুনে সুন্দরী আর ধনমণি দৌড়ে এল। তারপর আহুরীর শোচনীয় পরিণামের কথা শুনে, তারাও আলঙ্গার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিলাপ করতে লাগল।

এর পর একদিন বদন মাঠ থেকে ফিরলে পর, আলঙ্গা বলল, "এক্ষুণি সেথুয়া এসেছিল। সে বলে গেল পরশুদিন ভোরে রওনা হবার জন্য আমাকে তৈরি থাকতে হবে। সে দিন ভারি শুভদিন। এ-গ্রামের আর আশপাশের গ্রামের যাত্রীরা সবাই রওনা হবে।"

বদন বলল, "তাহলে নিতান্ত যাবে বলেই মন ঠিক করে ফেলেছ মা? আমার মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল। শ্রীক্ষেত্র এখান থেকে কত দূরে। যেতে আসতে থাকতে তোমার চার মাস লেগে যাবে।

কি লম্বা পথ, মা, কি কষ্টকর যাত্রা। আমাদের কপালে যে কি আছে তা ভেবেও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।"

এই বলে আধবুড়ো চাষী ছেলেমানুষের মতো হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে আলঙ্গা বলল, "কাঁদিস্ নে, বাবা বদন। আমি ধর্মকর্ম করতে যাচ্ছি, ফুর্তি করতে তো আর যাচ্ছি না। পথে আমাকে দেবতারা রক্ষা করবেন, জগন্নাথ আমাকে দেখবেন। মন খারাপ করিস্ নে, বাপ। তাছাড়া, তুই তো জানিস্ই কপালে যা লেখা আছে, তা হবেই। বিধির লিখন কে খণ্ডাবে?"

ঠিক সেই মুহূর্তে কালামানিক আর গোবিন্দ এসে বদনকে কাঁদতে দেখে, বেজায় অবাক হয়ে গেল। কারণটা শুনে, কালামানিক বলল, "মা, তুমি গেলে আমিও যাব। পথে যদি রোগে ধরে, কে তোমার মুখে জল দেবে? একা যাবে কি করে?"

আলঙ্গা বলল, "কি যে বলিস্, বাবা, আমি তো আর একা যাচ্ছি না। তোরা তো জানিস্ যে এই কাঞ্চনপুর থেকেই ছজন মেয়েমানুষ যাচ্ছে। তারা আমাকে দেখবে। সেথুয়াও আমাকে দেখবে।"

কালামানিক বলল, "সেথুয়াকে তো শত শত লোককে দেখতে হবে। আর ঐ যে ছজন মেয়েমানুষের কথা বলছ, তাদের কে দেখে তারি ঠিক নেই! আমি তোমার সঙ্গে যাই, মা।"

"আচ্ছা, তুই কি করে আমার সঙ্গে যাবি বল্? তুই গেলে, মাঠে চাষ করবে কে? বদনের তো বয়স হয়েছে, সে-রকম গতরও নেই। গোবিন্দ ছেলেমানুষ। তুই আমার সাত রাজার ধন রে মানিক, এই সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছিস্ তুই। তুই গেলে এদের চলবে কি করে? না রে বাপ, আমার সঙ্গে তোর আসা হয় না। আমার মহাপ্রভু আছেন, তিনিই আমাকে দেখবেন।"

এবার গোবিন্দও ওদের কথাবার্তার মধ্যে যোগ দিয়ে বলল, "আচ্ছা, ঠাকুমা, তোমার যাবার কি এমন দরকার? এই বাড়িতে

বসেই তো জগন্নাথের পূজো করতে পার। মানুষের মন-ই হল দেবতার মন্দির। ভগবানের পূজো করবার জন্য দূরে গিয়ে কি লাভ তাতো ভেবে পাচ্ছি না। মনের মধ্যে ভগবানের পূজো করলেই হল।"

আলঙ্গা বলল, "যা যা, তুই মহা পণ্ডিত হয়েছিস। খোঁড়ামশায়ের সঙ্গে গল্প করে আর বর্ধমানের পাদ্রী সায়েবের দেওয়া বই পড়ে, তোর দেখছি ভারি বুদ্ধি খুলেছে। আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। আমার মতে শ্রীক্ষেত্র গেলে খুব পুণ্যি হয়।"

তার উত্তরে গোবিন্দ বলল, "তা হয়। যাদের টাকাকড়ি আছে, তাদের পক্ষে তীর্থযাত্রা খুব ভালো। কিন্তু ঠাকুমা, তুমি কি বলে আমার মায়ের ঘাড়ে সংসারের সব ভার চাপিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তে রওনা দিচ্ছ? বৌ তো ছেলেমানুষ।"

"তা জানি, গোবিন্দ। কিন্তু বাড়ির কাজ আমি প্রায় কিছুই করি না। সব তোর মা-বৌ করে। আমি খাই আর ঘুমোই, ব্যস্, আর কিছু না। সোনার বৌ হয়েছে তোর গোবিন্দ। দিন রাত খাটে। মানুষের দেহে সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী। আরে, ও অত কাজের মেয়ে বলেই তো আমি তীর্থে যেতে সাহস পাচ্ছি। তারপর আমার নিরাপত্তার কথাই যদি বলিস্, জগন্নাথ আমাকে রক্ষা করবেন। আর বাধা দিস্ নে। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি, আর নড়চড় নেই। যাবার জন্য আমি এখন পাগল।"

বাস্তবিক হিন্দু বুড়িদের এক ধরনের পাগলামিতেই পেয়ে বসে। তারই জোরে তারা পথের ক্লেশ অসুবিধা তুচ্ছ করে, দূর দূর দেশে তীর্থ করতে যাবার শক্তি পায়।

অনেক দিন ধরেই সেখুয়াটি আলঙ্গার কাছে যাওয়া-আসা করছিল। এসে তার কাছে পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরের মহিমার ব্যাখ্যানা করত; ঐ সব পুণ্যস্থানে গেলে আত্মার কত মঙ্গল হয় সে-সব কথা বলত। আলঙ্গার কল্পনাতে একেবারে আগুন জ্বলে উঠত। তার

সঙ্কল্প অটল; সে যাবেই। রোজ রাতে সে হাত-কাটা ভগবানের মহিমার স্বপ্ন দেখত। এখন আর কারো সাধ্য ছিল না তার যাওয়া বন্ধ করে।

যাত্রার শুভদিনে ভোর হতে না হতেই, সূর্য ওঠার অনেক আগে, সেথুয়া এসে বদনের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিল, "জগন্নাথজী কি জয়!" বাড়ির লোকরা অবিশ্যি অনেক আগেই উঠে পড়েছিল আর উত্তেজনার চোটে আলঙ্গার চোখে ঘুমই আসেনি। একটা পুঁটলি করে কিছু চাল, খান দুই কাপড়, একটা থালা-ঘটি বেঁধে নিয়ে, কোমরের কষিতে কিছু টাকাকড়ি বেঁধে, প্রিয়জনদের কাছে সে বিদায় নিল। সুন্দরী আর ধনমণিকে বুকে জড়িয়ে চুমো খেয়ে, সকলের মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করল আলঙ্গা। অমনি সবার চোখে জল এল; সুন্দরী আর ধনমণি চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল, যেন আলঙ্গার সঙ্গে চির-কালের মতো ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। কান্নায় আলঙ্গার-ও গলা বন্ধ হয়ে আসছিল, অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত সে বলল, "শ্রীহরি! শ্রীহরি।" সেথুয়া ডাক দিল, "জগন্নাথজী কি জয়।" সঙ্গে সঙ্গে দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। আলঙ্গা আর ফিরে তাকাল না; সেটা বড় অলুক্ষুণে কাজ।

বলা বাহুল্য, জগন্নাথ দেবের কাছে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী যেমন সারা পথ পায়ে হেঁটে যায়, আলঙ্গারাও তেমনি চলল। ওদের মৎলব ছিল রোজ দশ-পনেরো ক্রোশ, কিম্বা তার চেয়েও বেশি হেঁটে, কোনো চটিতে কিম্বা আড্ডাতে রাত কাটাবে। ও-সব জায়গায় চাল ডাল নুন তেল মুড়ি গুড় ইত্যাদি বাঙালীদের নিত্য দরকারের জিনিস কিনতে পাওয়া যেত। একেকটা চটিতে রাতে শত শত যাত্রী এসে উঠত। চালাঘরে তাদের সকলের জায়গা হত না; কাজেই বেশির ভাগ লোক গাছতলায় কিম্বা খোলা আকাশের নিচে শুয়ে রাত কাটাত। এর থেকে সহজেই আন্দাজ করা যায় যে সারা দিন পায়ে হাঁটার ঐ ধকলের ওপর সারা রাত খোলা আকাশের নিচে পড়ে

থাকার ফলে যাত্রীদের অনেকেরই ব্যারাম হত। অনেকে পথেই মরত, তাদের আর পুরীর মাটিতে পা দেওয়া ঘটত না।

আলঙ্গার পুরী যাত্রার সব ঘটনার ফিরিস্তি দেওয়া আমাদের ইচ্ছা নয়, মোটামুটি যাত্রার পর্যায়গুলো বলে যাব। সেথুয়ার সঙ্গে আলঙ্গা আর কাঞ্চনপুরের বাকি ছয়জন যাত্রিনী বর্ধমান হয়ে, সেখান থেকে মেদিনীপুর, চন্দ্রকণা, ক্ষীরপাই পার হয়ে গেল। আরও শত শত—শত শত কেন, বরং হাজার হাজার—নতুন যাত্রির সঙ্গে দেখা হল। এরা বাংলা, বিহার, আর উত্তর-পশ্চিমের নানান্ জায়গা থেকে এসেছিল। সকলের গন্তব্যস্থান জগন্নাথের মন্দির।

মেদিনীপুর থেকেই আলঙ্গার কষ্ট শুরু হল। পনেরো ক্রোশ হাঁটার পর, রোজ রাতের রান্নায় সাহায্য করতে হত। দিনের মধ্যে ঐ একবার-ই খাওয়া। তারপর খোলা আকাশের নিচে মাটিতে শোয়া। ভোরের ঘণ্টা দুই আগেই উঠে আবার যাত্রা শুরু আর রাতের আগে বিরাম নেই। দিনের পর দিন এই ক্লান্তিকর পথ-চলা; রাতের পর রাত মাটিতে শুয়ে ঘুমোনো। মেদিনীপুর থেকে যাত্রীরা নারায়ণগড় গেল; তারপর ছত্রপাল, সেখান থেকে পাটনা জলেশ্বর; তারপর রাজঘাট, সেখানে সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান। রাজঘাট থেকে বালেশ্বর, সেখানকার নানান্ মন্দির দর্শন করে, পঞ্চগড় হয়ে ভদ্রক। ভদ্রকের কাছে বৈতরণী, ব্রাহ্মণী আর মহানদী পার হতে হল। তারপর কটক, সেখান থেকে বিন্ধ্যপর্বতের শাখা দেখা যায়। তারপর গোপীনাথ প্রসাদ, বলবন্ত, শ্রীরামচন্দ্র সসনা, হকিকৃষ্ণপুর হয়ে, তবে পুরী পৌঁছনো গেল। সব নগরীর শ্রেষ্ঠ নগর, শ্রীক্ষেত্র।

এখানে বলা দরকার পুরীকে কেন এত পুণ্যস্থান বলে মনে করা হয়; জগন্নাথের পুরনো কাহিনীও সকলের জানা উচিত। অনেক কাল আগে ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে একজন ভারি ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন।



নানারকম কৃচ্ছ্রসাধন সহ দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর, বিষ্ণু তাঁকে আদেশ করলেন জগন্নাথের একটি মূর্তি গড়ে, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্থি রাখতে হবে। দ্বাপর যুগে একজন শিকারীর তীর লেগে দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। কোনো এক ভক্ত একটি বাক্সে যত্ন করে তাঁর অস্থি তুলে রেখেছিল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন জানতে চাইলেন জগন্নাথের মূর্তি কে গড়বে। যাকে-তাকে দিয়ে তো এমন পবিত্র কাজ হবে না। বিষ্ণু বললেন, মূর্তি গড়বেন বিশ্বকর্মা। ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্মার ধ্যান করতে লাগলেন। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "মূর্তি আমি গড়ে দেব, কিন্তু যতদিন কাজ করব, কেউ যেন আমাকে ব্যাঘাত না করে। তা হলে আমি তখুনি কাজ ফেলে উঠে চলে যাব। শুনে ইন্দ্রদ্যুম্ন কৃতার্থ হলেন।" আর সব কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

এক রাতে বিশ্বকর্মা নীলাচলে অপূর্ব এক মন্দির গড়লেন। তারপর ধীরে-সুস্থে জগন্নাথের মূর্তি গড়তে বসলেন। যেখানে মূর্তি গড়া হচ্ছিল, সেখানে সকলের যাওয়া কিম্বা দেখবার চেষ্টা করা বারণ ছিল। বিশ্বকর্মা জলটুকু গ্রহণ করবার জন্যেও সেখান থেকে বেরোলেন না। পনেরো দিন কেটে গেল। কর্মস্থল থেকে ছেনি হাতুড়ির শব্দটুকু পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল না। ইন্দ্রদ্যুম্নের ভারি ভাবনাও হচ্ছিল আর ধৈর্যও রাখতে পারছিলেন না। দুর্বুদ্ধির বশ হয়ে তিনি বিশ্বকর্মার কাজ দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন কারিগর অদৃশ্য হয়েছেন, অসমাপ্ত মূর্তি পড়ে আছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন দুঃখ রাখার জায়গা পান না। এমন সময় স্বর্গ থেকে দৈববাণী হল যে ঐ অসমাপ্ত মূর্তিই জগৎময় বিখ্যাত হবে। মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন রাজা সব দেবতাদের নিমন্ত্রণ করলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা এসে পৌরহিত্য করলেন। মূর্তির চোখে দৃষ্টি আর দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। ভিতরে কৃষ্ণের অস্থি রাখা হল।

পুরীর মন্দিরে এই জগন্নাথের মূর্তি দেখতে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ

তীর্থযাত্রী আসে। মূর্তির কাঠের শরীর কয়েক বছর পর পর নতুন করে গড়া হয়, পবিত্র নব-কলেবর অনুষ্ঠানে। দুই লক্ষ যাত্রীর সঙ্গে আলঙ্গাও শত শত ক্রোশ হেঁটে এই জগন্নাথকে দর্শন করেছিল

পুরীর মতো একটা ছোট জায়গায় এতগুলো লোককে জড়ো হতে আলঙ্গা এর আগে কখনো দেখেনি। অগ্রদ্বীপে হাজার হাজার যাত্রীকে গোপীনাথের পুজো করতে দেখেছিল বটে, কিন্তু এর কাছে সে জনতা যেন সমুদ্রের পাশে এক ফোঁটা জল। পুরীতে ভারতের সব জায়গা থেকে যাত্রী এসেছিল ; বাংলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য, কোনো জায়গা বাদ যায় নি। নানান্ ধর্মমতাবলম্বী ছিল ঐ ভিড়ে. বিশেষ করে নানান্ সাজের, নানান্ গোষ্ঠীর বৈষ্ণব। যাত্রীদের সেকি দারুণ উৎসাহ। চারিদিকের যত মন্দির সব তারা দেখে বেড়াল। আর জগন্নাথের মন্দিরের তো কথাই নেই ; তার চারদিকে, ভিতরে বাইরে, হাজারে হাজারে লোক দিনমান ঘুর-ঘুর করতে লাগল। বড় মন্দিরের চারদিকের পাঁচিলের মধ্যে একশোটা মন্দিরের কম নেই। সেখানে গলাবাজি করে অষ্ট-প্রহর লোক ডাকা হচ্ছিল। কত যে বারাঙ্গনা আর বাজারের মেয়ে তার ঠিক নেই। পবিত্র মন্দিরের ছায়ায় বাস করত অগুন্তি নির্লজ্জ মেয়ে। আলঙ্গার কিন্তু জগন্নাথদেবের ওপর এমন ই গভীর বিশ্বাস ার এত নিষ্ঠার সঙ্গে সে সব আচার নিয়ম পালন করতে ব্যস্ত ছিল যে তার কাছে সব কিছুই গভীর ভক্তি আর আনন্দে পূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল।

জগন্নাথের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর বড় ভাই বলরাম আর ছোট বোন সুভদ্রাও পুজো পেয়ে থাকেন। তিনটি মূর্তিই হল ৬ ফুট মতো উঁচু ; কাঠের তৈরী ; শরীরের ওপর দিকটাই শুধু আছে, হাত-পায়ের বালাই নেই। খোদাই কাজও খুব মোটা। জগন্নাথের রঙ সাদা, বলরাম কালো, সুভদ্রা হলদে। জগন্নাথের তবু হাতের জায়গায়

ছুটো খুঁটিমতো আছে, সুভদ্রার তাও নেই। মোটের ওপর বলতে গেলে হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর মধ্যে এঁদের তিনজনের মতো কদাকার আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু কদাকার হলে কি হবে, এঁরা যে-রকম রাজকীয় ভোগ খান, তেমন আর কেউ পান বলে তো শুনিনি।

যে-সময় আলঙ্গা পুরী গেছিল, সে-সময় নাকি ভারতের কোনো রাজা-মহারাজার বাড়িতেও এমন এলাহি ব্যবস্থা ছিল না। চাকর-বাকর আর আশ্রিতদের ৩০০০ পরিবার ছিল। তার মধ্যে ৪০০ ঘর বামুন ঠাকুর। দেবতার খাবারের দৈনিক তালিকা শুনলেও অবাক হতে হয়। ১১০ সের চাল, ৪৮ সের কলাই, ১২ সের মুগ, ৯৪ সের ভয়সা ঘি, ৪০ সের গুড়, ১৬ সের তরকারি, ৫ সের দই, সের ছুই মশলা, ১ সের চন্দন, কিছু কর্পূর আর ১০ সের নুন। কোনো বড় উৎসবের সময় ঐ চারশো ঘর বামুন ঠাকুর সবাই যাত্রীদের জন্য রাধা-বাড়ায় লেগে যায়। যাত্রীরা এখানে রান্না খাবার কেনে। শোনা যায় যে মন্দিরের উঠোনেই এক লাখ যাত্রীর খাবার রান্না হয়, বিক্রি হয়। অন্য কোনো জায়গায় গিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা রান্না খাবার খায় না। কিন্তু শ্রীক্ষেত্র হল সব নিয়মের বাইরে। রাশি রাশি রান্না ভাত রোদে শুকিয়ে যাত্রীরা প্রসাদ বলে বাড়ি নিয়ে যায়। ভারতের সব জায়গায়, বিশেষ করে বাংলায়, ধার্মিক বৈষ্ণবরা কিছু খাবার আগে, এই শুকনো ভাতের এক দানা রোজ মুখে দেয়।

পুরী পৌঁছে আলঙ্গা প্রথম যে বড় অনুষ্ঠান দেখল, সেটি হল স্নানযাত্রা। পাণ্ডারা মহা ঘটা করে মন্দিরের ভিতর থেকে জগন্নাথের মূর্তি বাইরে এনে চাতালে রাখল। লক্ষ লক্ষ দর্শক অমনি 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি তুলে কান ঝালাপালা করে দিল। মন্ত্র পড়া হল; জগন্নাথের মাথায় জল ঢালা হল; তারপর গা মোছান হল; অসংখ্য ভক্ত নৈবেদ্য সাজিয়ে দিল; তারপর দেবতাকে আবার ঘরে তোলা হল।

আর দেখেছিল আলঙ্গা জগন্নাথের রথযাত্রা। এতবড় উৎসব আর হয় না। সাধারণতঃ আষাঢ় মাসে এই উৎসব হয়। সেদিন জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রার মূর্তি সিংহাসন থেকে নামিয়ে মন্দিরের বাইরে আনা হয়। দড়ি বেঁধে টানা হয়। নইলে অত ভারি মূর্তি আনতে পারবে কেন। সিংহ দ্বার দিয়ে তাঁরা বাইরে আসেন। সকলে আকাশ ফাটিয়ে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি দেয়। তারপর ঐরকম দড়ি বেঁধেই তাঁদের টেনে রথে তোলা হয়। পাঁচ তলা উঁচু বিশাল বিশাল রথ। কত তার চাকা, চূড়ো, পতাকা। জগন্নাথের রথ ৪৩½ ফুট উঁচু; তার ১৬টি চাকা, তাদের ব্যাসের মাপ ৬ ফুট করে; রথের মঞ্চটা চারকোণা, এককে ধারের মাপ ৩৪½ ফুট। বলরামের রথ ৪১ ফুট উঁচু; তার ১৪টি চাকা। সুভদ্রার রথ ৪০ ফুট উঁচু, তারও ১৪টি চাকা। মূর্তিগুলিকে রথে বসানো হলে, তাদের গায়ে সোনার তৈরি হাত পা কান পরানো হয়। তারপর রথ টানার পালা শুরু।

রথ যেই একটু নড়ে উঠল, অমনি সেই অগুন্তি জনতার উল্লাস দেখে কে!

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল, "জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ! হরিবোল! হরিবোল!" আর সেই সঙ্গে শত শত খোল করতাল ইত্যাদির কর্কশ ধ্বনি। রথের রসি একবারটি ছুঁতে পারলে নাকি অশেষ পুণ্য। তাই সকলেই ঠেলাঠেলি করে সমস্তক্ষণ রথের কাছে এগোবার চেষ্টা করছিল। সেকালে পুণ্য অর্জন করবার আশায় কত স্ত্রী-পুরুষ ছুটে গিয়ে রথের চাকার তলায় আছড়ে পড়ে, মুহূর্তের মধ্যে পিষে মরে যেত। বৃটিশ সরকার দয়া করে সেটি বন্ধ করেছেন।

দেবতারা আট দিন পরে আবার তাঁদের মন্দিরে ফিরে আসেন। ফিরে এসে তাঁরা বিশ্রাম করেন। তীর্থযাত্রীরাও এবার দলে দলে ফিরতে আরম্ভ করে।

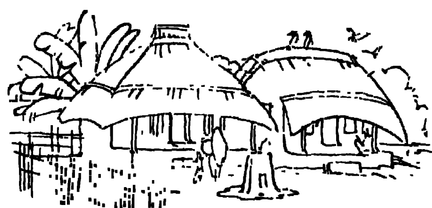
এই ফিরবার পথেই তীর্থযাত্রার ভয়াবহ দিকটি ভালো করে টের

পাওয়া গেল। অনেক দিন ধরে দিন রাত প্রকৃতির নানান্ ঝঞ্ঝাট সয়ে সয়ে যাত্রীদের শরীরের শক্তি একেবারে কমে গেছিল। দিনে রোদ বৃষ্টি. রাতে শিশির; মাথার ওপর একটা চাল নেই; চটিতে পান্থশালায় জায়গা নেই; যদিও বা জায়গা পাওয়া গেল, তাহলেও এতটুকু ঘরে এতগুলো মানুষের ভিড়; যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া নেই, খাওয়াতে যথেষ্ট পুষ্টি নেই, কারণ ফেরবার আগেই বেশির ভাগ যাত্রী তাদের যথাসর্বস্ব খরচ করে বসে থাকে। পুরীতে কিম্বা পুরীর চার দিকে কোথাও স্বাস্থ্য রক্ষার আর ময়লা দূর করার কোনো ভালো ব্যবস্থা ছিল না। তা ছাড়া শত রকম অত্যাচার, অনিয়ম। ফলে দলে দলে যাত্রীরা নানান্ মারাত্মক রোগে পড়তে লাগল: জ্বর, আমাশা, ওলাউঠো।

পুরীর চারপাশে বিকট শ্মশানের মত দৃশ্য; যেদিকে তাকানো যায় মৃতদেহ পড়ে রয়েছে! ছোট একটা নদী ঐখান দিয়ে বয়ে যায়; সে নদীতে এত মড়া ভাসছিল যে জল দেখা যাচ্ছিল না। পুরী থেকে কটক যাবার রাস্তার দু ধারে চিতাভস্ম। কোথাও মৃতদেহ পোড়ানো-ও হয়নি. শেয়ালে শকুনে ছিঁড়ে খেয়েছে। পথের ধারের সরাইখানা, পান্থশালা থেকে দিন রাত সব সময়, মরণাপন্ন রুগীদের কাতরানি শোনা যাচ্ছিল।

আলঙ্গা বেচারীও শরীরে রোগের বীজ নিয়ে পুরী ছেড়ে এল। দু দিন বাদে রাতে তার মারাত্মক ওলাউঠোর লক্ষণ দেখা দিল। কাঞ্চনপুর থেকে যে ছজন স্ত্রীলোক ওর সঙ্গে এসেছিল, তারা এ হেন অবস্থায় যথাসাধ্য করল। অর্থাৎ কিছুই করতে পারল না, কারণ কিছু করার উপায় ছিল না। একটা চালা ঘরে ওর জন্য একটু আশ্রয়ের পর্যন্ত ব্যবস্থা করতে পারল না। সারা রাত আলঙ্গা গাছতলায় পড়ে রইল। ডাক্তার ছিল না, ওষুধ ছিল না। পরদিন সকালে ঐ স্ত্রীলোকরা ঠিক করল আলঙ্গাকে শেয়াল-শকুনের কাছে সঁপে দিয়ে, তারা পথ দেখবে। সুখের বিষয়, ভোরবেলা প্রেমভক্ত বৈরাগী আর

আহুরী দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হল। তারাও তীর্থ করে ফিরছিল। বৈরাগী বলল সে নাকি কিছু ওষুধ টষুধ জানে; আলঙ্গাকে সে কিছু ওষুধ দিয়েও ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আলঙ্গাকে চব্বিশ ঘণ্টাও ভুগতে হয়নি; সেই দিনই বিকেলে সে মারা গেল। তার সৎকারের জন্য কাঠ পাওয়া গেল না। মৃতদেহের কি ব্যবস্থা হল, সে বিষয়ে কিছু না বলাই ভালো। গরীব চাষীর স্ত্রী, চাষীর মা আলঙ্গার সুবুদ্ধি আর চরিত্রবলের জন্য সকলের শ্রদ্ধার যোগ্যা; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড়ই শোচনীয় ভাবে তার মৃত্যু হল।



আরো কয়েক বছর কেটে গেল। তারপর একদিন সকালে গোবিন্দ তাদের ঘরের দোরগোড়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল, এমন সময় তার বন্ধু মদন এসে বলল, "শুনলাম তোর বাবার অসুখ, স্যাঙাৎ?"

'হ্যাঁ, ভাই, কাল রাতে ভীষণ জ্বর নিয়ে মাঠ থেকে ফিরল। সারা রাত সে কি জ্বর। এখন পর্যন্ত ছাড়েনি।"

"একটু সাবধানে থাকিস্। এবারকার জ্বরটা বড় খারাপ ধরনের। বদ্যি ডাকবি না?"

"এখনি ডাকবার কি দরকার? আশা করছি জ্বরটা গুরুতর কিছু নয়। দু দিন উপোস দিলেই ছেড়ে যাবে।"

সত্যি কথা বলতে কি বাংলার গ্রামের ঐ ছিল নিয়ম। জ্বর-জারি হলে, গোড়ায় কোনো ওষুধপত্র দেওয়া হত না। তার বদলে রুগীকে উপোস করিয়ে রাখা হত। পানীয়র কথা কি আর বলব, রুগী মহা চ্যাঁচামেচি লাগালে, অনেকক্ষণ পর পর কয়েক ফোঁটা জল দেওয়া হত।

এই ভাবে দু-দিন কেটে গেছিল ; জ্বরটা ছাড়া দূরের কথা, বরং ক্রমে আরো বাড়ছিল আর রুগী বেজায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কালামানিক আর গোবিন্দর দুজনের-ই মনে হল রোগটা ক্রমে বাড়াবাড়ির দিকে যাচ্ছে, এবার বদ্যি ডাকা উচিত। কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীদের পরামর্শে আরেকটা দিন দেরি করা হল, কারণ সকলের বিশ্বাস ছিল হাল্কা জ্বর তিনদিনে ছেড়ে যায়। বাঙালীরা মনে করে তিন সংখ্যার অনেক গুণ। কিন্তু জ্বর যদি চতুর্থ দিন সকালের মধ্যে না ছাড়ে, তাহলে অবশ্যই কবিরাজ ডাকতে হয়। চতুর্থ দিন সকাল হলে দেখা গেল বদনের অবস্থা আরো খারাপ। কালামানিক তখনি বদ্যি বাড়ি গেল।

কাঞ্চনপুরে অনেক ঘর বৈদ্য ছিল। তাদের বাড়ির পুরুষরা বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে বদ্যি-গিরি করত! সবাইকে কবিরাজ বলা হত। কেন যে কবিরাজ তা জানি না, কবিতা-টবিতা তো তারা জন্মে কখনো লেখেনি। তাদের মধ্যে সব চাইতে বিখ্যাত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। তবে তাঁর নামটার মানে যাই হক না কেন, গুরুতর অসুখ তাঁর হাতে কম-ই সারত। লোকে তামাসা করে বলত, বাঙালী বদ্যি তিন রকমের হয়, দশ-মার, শত-মার আর সহস্র-মার। মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন এই শেষের দলে।

এত সামান্য কারণে অবিশ্যি তাঁর কবরেজি খ্যাতির কোনো ক্ষতি হয়নি। সকলেই জানত যে কবরেজ মশাই ওষুধ দিতে পারেন বটে কিন্তু তিনি বিধির লিখন খণ্ডাতে পারেন না। রুগীর কপালে যদি কোনো বিশেষ রোগ থেকে মৃত্যু লেখা থাকে, তাহলে জগতের কোনো বদ্যি—এমন কি স্বয়ং ধন্বন্তরীও তাকে সারিয়ে তুলতে পারবেন না। গাঁয়ের সকলেই জানত মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে অনেক ভালো আর বিরল ওষুধ ছিল। পাঁচ, দশ, কিম্বা আঠারো রকম তরি-তরকারির নির্যাস ছিল তাঁর কাছে; তাই দিয়ে তিনি নানা রকম ওষুধ তৈরি করে দিতেন। নানা রকম ধাতু থেকে তৈরি ওষুধ ছিল তাঁর; তার একটার খুব নাম ছিল, তাতে সোনার গুঁড়ো দেওয়া ছিল। এক

নম্বরের রসসিন্ধু ছিল। নানা জাতের গোখরো, কেউটের বিষ ছিল আর অগুন্তি রকম তেল ছিল। কিন্তু তাঁর রসায়নাগারের পুঁজির জন্যেই তাঁর এত নাম ডাক ছিল না। তাঁর মতো নাড়ি দেখতে কাছাকাছি কেউ পারত না। এত ধাতৃজ্ঞানের বিদ্যে কারো ছিল না। এই নাড়ি টেপাটাকেই সবাই চিকিৎসা শাস্ত্রের সব চাইতে কঠিন ব্যাপার বলে বিশ্বাস করত।

তাছাড়া লক্ষণ দেখে রোগ ধরতেও তিনি কম ওস্তাদ ছিলেন না। সবাই জানত যে রোগ ধরতে তাঁর কখনো ভুল হত না। তবে রুগীকে সারিয়ে তুলতে কদাচিৎ পারতেন।

তাঁর এই রোগ ধরবার ক্ষমতার মূলে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। শত শত বছর আগে সংস্কৃতে লেখা যত চিকিৎসা শাস্ত্রের বই, সব তিনি নিবিষ্ট মনে পাঠ করেছিলেন। সে-সব পুঁথিতে রোগ আর রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে এমন অগাধ বিদ্যা ধরা ছিল যে শুধু মৃত্যুঞ্জয় নয়, বাংলার সব চিকিৎসকদের-ই বিশ্বাস ছিল যে ভগবানের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা না পেলে, এমন পুঁথি রচনা করা যায় না। এমন কি কেউ কেউ বলত এ-সব পুঁথি মহাদেব নিজে লিখে রেখেছেন। আধুনিক চিকিৎসাকে, বিশেষতঃ ইউরোপের চিকিৎসাকে, মৃত্যুঞ্জয় ঘৃণা করতেন। একটা কথা তাঁর মুখে প্রায়ই শোনা যেত: এ-দেশের জ্বরের চিকিৎসা সায়েবরা একেবারেই বোঝে না। হ্যাঁ, শস্ত্র-চিকিৎসায় তারা অনেক এগিয়ে গেছে বটে, কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসা তো আর কবিরাজের কাজ নয়। সে হল গিয়ে নাপিতের কাজ।

এই গুণী মানুষটির একটিমাত্র দোষ ছিল। তিনি বেজায় আফিং খেতেন। গোড়ায় রোজ মটরশুঁটির দানার মতো ছোট্ট এক দানা আফিং খেতেন। কিন্তু সেটাকে দিনে দিনে বাড়াতে বাড়াতে শেষে এত বড় এক দলা খেতেন, যে অতখানি আফিং একটা ঘোড়ায় খেলে, সে সঙ্গে সঙ্গে মরে যেত। এই বদভ্যাসটির জন্য, মৃত্যুঞ্জয়কে কচিৎ সজাগ অবস্থায় পাওয়া যেত। পাঁচ মিনিট চুপ করে কোথাও

বসলেই, চোখ ছুটো নিজের থেকেই আধ-বোজা হয়ে আসত। গাঁয়ের কবিরাজদের রুগীর সংখ্যা বেশি থাকে না, ফী-ও খুবই কম—হয়তো পনেরো দিন চিকিৎসা করে রুগী সারালে এক টাকা পেলেন আর রুগী সেরে না উঠলে লবডঙ্কা। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে সর্বদাই তাঁর টাকার অভাব লেগে থাকত; কিন্তু ডাল-ভাত জুটুক আর নাই জুটুক, রোজকার ঐ আফিঙের দলাটি না খেলেই নয়। যদি কখনও আফিং খাবার সময়টি পার হয়ে গেল, আফিং জুটল না, তাহলে তাঁর একেবারে প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কি! এই কবিরাজকে কালামানিক গিয়ে ডেকে নিয়ে এল।

মৃত্যুঞ্জয় বদনের নাড়ি টিপে, এত বেশি জ্বর দেখে দশ রকম তরকারি থেকে তৈরি 'দশমূলার পাঁচন' খেতে বললেন। কিন্তু পাঁচন তৈরি করার আগেই ছুটি বড়ি খেতে দিলেন। এই বড়ি তিনি সর্বদা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। পানের রস দিয়ে খেতে হত। দশমূলার কোনো ফল হল না। জ্বর ছাড়ল না। তখন আরো অন্য বড়ি, পাঁচন খাওয়ানো হল। বিশেষ কোনো ফল হল না। রসসিন্ধু লাগানো হল। কিন্তু সবই বৃথা। বদনের জ্বর একটুও কমল না।

বাড়ির লোকে ততদিনে ভয়ে আধমরা। রামধন মিশ্রকে ডাকা হল; তিনি রোজ এসে দেবতাদের নামে একহাজার তুলসীপাতা উৎসর্গ করলেন। পুজো দেওয়া হল, স্বস্ত্যয়ন করা হল, যাতে দেবতাদের অসন্তোষ ঘোচে, রুগী সেরে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় নানা রকম ফলের আর সাপের বিষ দিলেন, কোনো ফল হল না। সবার শেষে 'হুঁকোওয়ালার গুঁড়ো' নামে একটা সাংঘাতিক বিষ পর্যন্ত দেওয়া হল। বর্ধমানের এক হুঁকোওয়ালা এই বিষ বানিয়েছিল। ভালো হওয়া দূরে থাকুক, বদনের অবস্থা ক্রমে মন্দের দিকে যেতে লাগল। শেষে সে ভুল বকতে লাগল। সবাই বুঝল এবার অন্তিম দশা উপস্থিত; তার ভালো হবার কোনো আশাই নেই।

ঘরে কখনো মরতে নেই, তাহলে আত্মা মুক্তি পায় না। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বদনকে তার শোবার ঘর থেকে তুলে এনে, খোলা উঠোনে শোয়ানো হল। সবাই তাকে ঘিরে রইল। সেইখানে বদন তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সকলে ডুকরে কেঁদে উঠল।

সেই রাত্রেই নারায়ণ শীল বলে একটা দীঘির ধারে বদনের দেহ দাহ করা হল। হিন্দুরা বিশ্বাস করে ঘরে বেশিক্ষণ মৃতদেহ রাখতে নেই। তাহলে অমঙ্গল হয়।



১০

সারাদিনের মধ্যে সকালবেলাটি যেমন, তেমনি সারা জীবনের মধ্যে শৈশব-কৈশোরও সব চাইতে সুখ আহ্লাদের সময়। কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই; জীবনের কঠিন পরীক্ষা, সংসারের দুঃখ-কষ্ট, এ-সব জিনিসের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। ছেলে খায়-দায়, ফূর্তি করে, চারদিকে যা দেখে তাতেই আমোদ পায়।

এতদিন পর্যন্ত গোবিন্দর জীবনও সুখে-শান্তিতে কেটেছিল। অবিশ্যি সৌখীন জীবনের আরাম বিলাসিতার কিছুই সে পায়নি! রোজ তাকে মাঠে গিয়ে প্রাণান্ত খাটতে হত; হয় মাঠে লাঙ্গল চালাত, নয় গোলাঘরে খাটত, কিম্বা ক্ষেতের অন্য কাজ করতে হত। বাড়ি এসে ডাল ভাত, দুটো একটা তরকারি, ছোটখাটো মাছ আর সাদা জল খেত। তবু তার মনে হত বড় সুখে আরামে আছে। বিলেতের বড়লোকরা টাকা-কড়ি জাঁকজমক দিয়ে নিজেদের ঘিরে রাখত। তাদের নানান্ উপাদেয় খাবার যোগাবার জন্য ডাঙা, সাগর, আকাশ চুঁড়ে বেড়ানো হত। তবু তারাও গোবিন্দর চেয়ে মনের সুখে ছিল না।

গোবিন্দ মোটা চালের ভাতের সঙ্গে শুধু পুঁই শাকের ঘন্ট খেয়ে, ঘরের মাটির মেঝেতে তালপাতার পাটি পেতে শুত। কিন্তু সেজন্য তার পেটও কিছু কম ভরত না, ঘুমেরও কোনো ব্যাঘাত হত না। গোবিন্দর পরনে থাকত হাঁটু অবধি বহরের মোটা ধুতি; গা-পা থাকত খালি। কিন্তু তাই বলে কি আর মখমল—কিংখাব পরা বড়লোকরা ওর চাইতে সুখী ছিল? চাষীর ছেলে হয়ে জন্মেছিল;

তার বেশির ভাগ সময় কাটত খোলা আকাশের নীচে; নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে ধানের ক্ষেতের মিষ্টি গন্ধ পেত; চোখ খুললেই দেখতে পেত মাতৃভূমির শ্যামল সুন্দর রূপ—নাই বা থাকল তাতে কোনো বৈচিত্র। হয়তো শিক্ষার অভাবে, বিশ্ব-প্রকৃতির স্পর্শে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থেকে যতখানি তার লাভ হতে পারত, তা হত না, তবু বলি ঐ সবুজ ধানের ক্ষেতে, ঐ স্নিগ্ধ আম-বনে, ঐ পথের পাশের ঝোপে-ঝাড়ে, কোথাও এমন কিছু ছিল না, যাতে তার মন কলুষিত হবে, কিম্বা চরিত্রে পাশবিক ভাব দেখা যাবে।

অধিকাংশ দেশে বিয়ের পর নানান সমস্যা আর দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। বাংলায় তা দেয় না। গোবিন্দর বিয়ে হল; ছেলেপিলেও হল; কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের খাওয়া পরার জন্য তাকে এতটুকুও ভাবতে হল না। ছেলের বৌয়ের আর নাতি-নাতনির ভার নেওয়া তো বদনের কাজ। বাড়ির যা কিছু ধন-দৌলত, সবই ছিল বদনের হাতে। ধান আর গুড় বেচে যা ঘরে আসত, দুধ আর বাগানের ডাল, বেগুন, পটল ইত্যাদি থেকে সামান্য যা রোজগার হত, সবই বদনের কাছে থাকত। বসত বাড়ি আর ক্ষেতের জন্য জমিদারকে সে-ই নিয়মিত খাজনা দিত। টাকার অভাব হলে, বদন-ই গিয়ে মহাজনের কাছ থেকে কিছু ধার করে আনত। মাঝে মাঝে অবিশ্যি ছেলের সঙ্গে সে পরামর্শ করত, কিন্তু বাপ যতদিন বেঁচেছিল, ঘরে কতখানি কি এল আর তাই দিয়েই সংসার কি ভাবে চলল, সে ভাবনা গোবিন্দকে কখনো ভাবতে হয়নি।

বদনের পরেই, সংসারের ভাবনা-চিন্তার ভাগ নিত আলঙ্গা। মাকে না জিজ্ঞেস করে বদন কোনো কাজে হাত দিত না, এ কথা বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হবে না। আলঙ্গা ভারি বুদ্ধিমতী ছিল। বাড়ির কর্তার স্ত্রী হয়েও, সুন্দরী কখনো বাড়ির গিন্নী হয়নি। গিন্নী ছিল আলঙ্গা। সেজন্য সুন্দরীর মনে এতটুকু ক্ষোভও ছিল না। বরং এমন বুদ্ধিমতী, স্নেহময়ী শাশুড়ীর হেপাজতে থাকতে

পায়রাটাকে সে মস্ত সৌভাগ্য বলেই মনে করত; সেজন্য সে ভারি কৃতজ্ঞ ছিল।

এখন কিন্তু সব কিছু বদলে গেল। বদন তার বাপ-ঠাকুরদার সঙ্গে মিলিত হল; আলঙ্গা বিদেশ-বিভুঁইয়ে প্রাণ দিল। হিন্দু আচার নিয়মে এবার কালামানিককে বদনের স্থান নিতে হয়। কিন্তু যদিও কালামানিক বেজায় সাহসী ছিল আর কাঞ্চনপুর গ্রামে ওর মতো বলিষ্ঠ আর কেউ ছিল না, তবু ওর বুদ্ধিশুদ্ধি খুব বেশি ছিল না। বাড়ির কর্তাগিরি করা ওর সাধ্যের বাইরে ছিল। কাজেই গোবিন্দ হল বাড়ির কর্তা আর ওর মা হল গিন্নী। এতকাল গোবিন্দর কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না। বাপ মলে ওর জীবনের রঙটাই অন্য রকম হয়ে গেল। এখন ওর প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কি করে এতগুলো পোষ্যের খাওয়া-পরা চালায়।

এবার গোবিন্দর অবস্থাটা কেমন, সে বিষয় একটু খবর নিলে ভাল হয়। বসত-বাড়ির কোনো পরিবর্তন হল না। সেই বড়-ঘর; তার দুটি ভাগ: এক ভাগ হল শোবার ঘর, অন্য ভাগ ভাঁড়ার ঘর। সেই মাঝারি-ঘর, তার দাওয়াতে ঢেঁকি পাতা। সেই আরেকটা ঘর, সেখানে রান্নাবান্নাও হয়, আবার কালামানিক শোয়। সেই গোয়ালঘর। সবই ঠিক আগের মতো। মৃত্যুর করাল হাত যে ওদের সংসারটাকে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। গয়ারাম সাপের কামড়ে মরেছিল। বদন জ্বরে গেল। আলঙ্গা তীর্থ করতে গিয়ে প্রাণ দিল। মালতী থাকত দুর্গানগরে, শ্বশুরবাড়িতে। আহ্লাদী বোষ্টমী হয়ে প্রেমভক্ত বৈরাগীর সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাড়িতে রইল শুধু গোবিন্দ, গোবিন্দর মা সুন্দরী, বৌ ধনমণি আর কাকা কালামানিক। সে আজ পর্যন্ত বিয়ে-থা করল না।

বদন যে ক্ষেতগুলোতে চাষ করত, গোবিন্দও ঠিক সেইগুলোতেই চাষ করত। ক্ষেতের মাপ এতটুকু বাড়েওনি, কমেওনি। তবে

গোবিন্দর সাংসারিক জীবনটা একটা গুরু দায় নিয়ে শুরু হয়েছিল। বাপ সামান্যই ধার রেখে গেছিল। কিন্তু পরপর ঠাকুমার আর বাবার শ্রাদ্ধে গোবিন্দ বেশ বড় অঙ্কের টাকা ধার নিয়ে, ঋণের হিসাবটি অনেকখানি বাড়িয়ে ফেলেছিল। এই ঋণের দায়ের সবচেয়ে কষ্টকর দিকটি হল বড় বেশি হারে সুদ দিতে হবে। অর্থাৎ প্রতিমাসে টাকা পিছু দু পয়সা সুদ। হিসাব করলে বছরে এটা শতকরা ৩৭½ পড়ে। কিন্তু মহাজনরা এই হারেই সুদ নিত, কাজেই চাষীদের কাছে এটাকে খুব বেশি মনে হত না।

একদিন সকালে গোবিন্দ দোরগোড়ায় বসে হুঁকো খাচ্ছে আর নানা কথা ভাবছে, এমন সময় এক হাতে মোটা বাঁশের লাঠি, অন্য হাতে একটা চিরকুট নিয়ে একজন লোক এসে হাজির হল। খুব লম্বা চওড়া মানুষটা, মাথায় ৬ ফুট হবে, ইয়া গোঁফ জোড়া ইয়া জুলপীর সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, তার ওপর ঘন দাড়ি ওপর দিকে তুলে আঁচড়ে রাখা হয়েছে। পোষাক আর নাক-মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে লোকটা বাঙালী নয়, উত্তর-পশ্চিম থেকে এসেছে। লোকটার নাম ছিল হনুমান সিং; কাঞ্চনপুরের জমিদারের সেরেস্তার একজন পেয়াদা। তার কাজ প্রজাদের ধরে গোমস্তার সামনে হাজির করা। গোমস্তার কাছে খাজনা জমা দিয়ে রসিদ নিতে হত।

গোবিন্দ বলল, "তোমার হাতে ওটা কি, হনুমান সিং?" হনুমান সিং বলল, "ফাল্গুনে জমিদারবাবুর ছেলের বিয়ে, তাই সব প্রজাদের কাছ থেকে 'মাথট' নেওয়া হচ্ছে। তোমাকে কত দিতে হবে এতে লেখা আছে।"

গোবিন্দ আকাশ থেকে পড়ল। "মাথট? আমি আবার মাথট দেব কোত্থেকে? এমনিতেই খাজনা বাকি পড়েছে আর ঠাকুমার শ্রাদ্ধের, বাপের শ্রাদ্ধের জন্য টাকা ধার করতে হয়েছে।"

"আরে বাবা, বেশি তো আর দিতে হবে না। রোজ রোজ তো আর রায় চৌধুরীর ছেলের বিয়েও হচ্ছে না। প্রজারা তালুকদার

মশাইকে যে যত খাজনা দেয় তার টাকা পিছু দু-আনা হিসাবে দিতে হবে। তুমি বছরে চল্লিশ টাকা খাজনা দাও, কাজেই তোমাকে পাঁচ টাকা দিতে হবে।"

গোবিন্দ বলল, "আরে মশাই, আমার কি এখন মাথট কিম্বা আবোয়াব দেবার মতো অবস্থা ? বড়লোকদের পক্ষে ও-সব বাড়তি খরচ পোষায়। কিন্তু আমার মতো যার দুরবস্থা, তার কাছ থেকে জমিদার মশাইয়ের কিছু আশা করা কি উচিত ? তুমি বলছ পাঁচ টাকা বেশি নয়, আমার এখন পাঁচটি কড়ি দেবারও সাধ্য নেই।"

"তা বললে তো হবে না। ওটা দিতেই হবে জমিদারের হুকুম। ভিক্ষে করে, কি ধার করে, কিম্বা বৌয়ের গায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে, ঘটি-বাটি বেচে যেমন করে পার, পাঁচটি টাকা তোমাকে বের করতেই হবে।"

"তুমি যাও, গিয়ে গোমস্তাকে বল টাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই।"

"বাঃ! বেড়ে বলেছ!! তোমার বাপের চেয়ে দেখছি তুমি বেশি লায়েক হয়েছ। সে তো জমিদার চাইলেই মাথট দিত। যাও তো বাপু, এবার পাঁচটি টাকা এনে দাও দিকিনি।"

"আমি কি ঠাট্টা করছি, হনুমান সিং ? ঘরে একটা পয়সা নেই। তুমি সমস্ত বাড়িটা ঢুঁড়ে পাঁচটা পয়সাও বের করতে পারবে না। গিয়ে জমিদারবাবুকে বল টাকা জোগাড় হলেই দিয়ে দেব, এখন দিতে পারছি না।"

"বেশ, তবে তুমি নিজে এসেই তাঁকে বল না কেন। আমার হুকুম যে তুমি নিজের থেকে না এলে, তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে হবে।"

গোবিন্দ দেখল এখানে আপত্তি করে লাভ হবে না, কাজেই সে যেতে রাজি হল। হুঁকো তুলে রেখে, কাঁধে গামছাটা ফেলে, সে হনুমান সিংহের সঙ্গে চলল।



গ্রামের মধ্যে জমিদারবাবুর বাড়িটাই সব চাইতে বড় আর ভালো। দক্ষিণ-মুখী বাড়ি, যেমন এদিককার বেশির ভাগ বাড়িই হয়ে থাকে। তাহলে শীতকালের হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়াটা গায়ে লাগে না, অথচ গ্রীষ্মের মিষ্টি দখ্‌নে হাওয়া খাওয়া যায়। বাড়ির সদর দরজার মজবুত পাকা গাঁথুনি; প্রকাণ্ড দরজার পাল্লা দুটি শাল কাঠের তৈরি, তাতে মস্ত মস্ত পেরেক লাগানো। মাথার ওপর সিমেন্ট পলেস্তারার এক সিংহ বসানো। ফটক দিয়ে ঢুকেই সামনে পড়ে ষাট ফুট লম্বা, ষাট ফুট চওড়া, চারকোণা একটা উঠোন। তার উত্তর দিকে মস্ত সভা-ঘর। সভা-ঘরের পুবে পশ্চিমে, একেবারে সামনের পাঁচিল পর্যন্ত টানা দুই সারি ছোট ছোট ঘর। ঐ উঠোন, সভা-ঘর আর ছোট ঘরগুলি নিয়ে হল জমিদারের কাছারি বাড়ি। এখানে জমিদার সভা করেন আর জমিদারির যাবতীয় কাজকর্ম দেখেন।

সভা-ঘরের মেঝে শতরঞ্জি দিয়ে ঢাকা। তার মাঝখানে, চারদিকে তাকিয়া ঠেস দিয়ে জমিদারবাবু বসেন। দেওয়ান, গোমস্তা আর অন্য কর্মচারীরা যে-যার পদ-মর্যাদা বুঝে কাছে দূরে আসন পিঁড়ি হয়ে বসেন।

এই সভাঘরের উত্তর দিকে আরেকটি উঠোন; মাপে সেটি প্রথমটির-ই সমান। তার সামনে আর একটা বড় ঘর, তাকে দালান বলা হয়। তার ওপরে খিলান দেওয়া। দুধারে ঢাকা বারান্দা। এ দিকটা দোতলা; এখানেও অনেকগুলো ঘর। এটিকে বার-বাড়ি কিম্বা দালান-বাড়ি বলা হয়। দালানটি শুধু পুজোর সময় কিম্বা কোনো বিশেষ উৎসবের সময় ব্যবহার হয়। মূর্তিগুলোকে দালানে রাখা হয়। নীচের উঠোনে যাত্রা, নাটক, প্রহসন ইত্যাদি হয়। সে সময় উঠোনের ওপর চাঁদোয়া তোলা হয়। কাছারিবাড়ির সভাঘর থেকে দালান-বাড়ির উঠোনে চলে আসা যায়। তবে সভা-ঘরের বাঁয়ে একটি গলি দিয়ে দালান-বাড়িতে যাবার আসল পথ।

দালান-বাড়ির পেছনে ঐ রকম আরেকটা উঠোন, ঐ একই মাপের। এর-ও চারদিকে ঢাকা বারান্দা। এ মহলটিও দোতলা; এখানে ছোট ছোট অনেক ঘর, তাদের জানলার সংখ্যা বড় কম। এই হল অন্দরমহল বা অন্তঃপুর এখানে মেয়েরা থাকে; সূর্যের আলো ছাড়া এখানে বাইরের কেউ আসে না।

গোবিন্দ এই ইঁট-সুরকির বিশাল স্তূপটির সিং-দরজা দিয়ে ঢুকে, সভাঘরের দরজায় পৌঁছে, গলায় কাপড় দিয়ে জমিদারবাবুকে নমস্কার করল। জমিদারবাবু বিশাল এক তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসেছিলেন।

প্রকাণ্ড শরীর তাঁর, বাঙালীরা সচরাচর এতটা লম্বা হয় না; সেই অনুপাতে বপুটিও বিশাল। বসেছেন যেন একটা সিংহী থাবা গেড়ে আধা শুয়ে আছে। যে তাঁর কাছে আসত, সবার আগে তাঁর চোখজোড়ার ওপর তার নজর পড়ত। চকচকে, প্রকাণ্ড, বিলোল, মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্যুতের মতো তেজ ঝলকাচ্ছে। ঐ দুটি ভয়াবহ অগ্নি-উদ্‌গারী কামানের সামনে দাঁড়াতে কাঞ্চনপুরের সব চাইতে জবরদস্ত চাষীরাও ঘাবড়াত; এ-কথা তারা নিজেরাই স্বীকার করত। বেজায় জোরালো গলা, কি তার গমক্; রেগে গর্জন করলে মনে হত যেন বাজ পড়ছে! কালো চুলে রূপোলী রেখা দেখে বোঝা যেত তাঁর বয়সটা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।

জমিদারের নাম জয়চাঁদ রায়চৌধুরী। আসলে তিনি জমিদার ছিলেন না; বর্ধমানের মহারাজার অধীনে তিনি একজন সামান্য পত্তনি-তালুকদার। তা হলে হবে কি, কাঞ্চনপুরের আর চারদিকের কুড়িটা গ্রামের লোকরা তাঁকে জমিদার-ই বলত। কাঞ্চনপুর গ্রামের জন্য তিনি মহারাজকে বছরে দু হাজার টাকা দিতেন। কিন্তু সবাই বলত যে তিনি নিজে খাজনা হিসাবে তার তিনগুণ আদায় করতেন। সমস্ত জমিদারিটার, অর্থাৎ পত্তনিটার জন্য মহারাজকে দিতেন আশি হাজার টাকা, কিন্তু নিজে স্বীকার করতেন যে সদর

জমা দেবার পরেও, খরচ-খরচা বাদে তাঁর লাভ হত দু লাখ টাকা। এত টাকা ন্যায্য উপায়ে আদায় হতে পারে না। তিনি অতিরিক্ত খাজনা দাবি করতেন ; জোর করে টাকা আদায় করতেন। নিষ্ঠুরভাবে প্রজাদের নিপীড়ন করতেন। তাঁর মতো জমিদাররা ছিল এ-দেশের অভিশাপ। ইংরিজি শিক্ষা পাননি ; সংস্কৃত একেবারেই জানতেন না ; বাংলা বিদ্যেও কোনোমতে কাজ চালিয়ে দেবার মতো ছিল। অর্থাৎ লোকটি একেবারে মুখ্যু। তার ওপর স্বভাবটি ছিল স্বার্থপর ; ফলে দুর্ভাগ্যবশতঃ যারা তাঁর প্রজা হয়ে জন্মেছিল, ঐ মূর্খতাই ছিল তাদের সর্বনাশের কারণ। ন্যায়-অন্যায় ভেদজ্ঞান তাঁর চরিত্রে ছিল না। যে কোনো উপায়ে—তা সে যত বে-আইনী বা নিচ-ই হক না কেন—প্রজাদের কাছ থেকে তিনি যত টাকা পারেন নিংড়ে বের করে নিতেন। 'হপ্তম' আর 'পঞ্চমের' সুবিধা তো প্রায়ই নিতেন ; তাঁর অত্যাচারের চোটে কত প্রজা যে সর্বস্বান্ত হয়েছিল তার হিসেব কে রাখে। জাল জুয়োচুরি ধাপ্পাবাজি, কোনো কিছুতেই জয়চাঁদের আপত্তি ছিল না। যে কোনো উপায়ে তিনি বহু গরীব প্রজার লাখরাজ জমি হাতিয়ে নিয়েছিলেন। এদিকে গোঁড়া হিন্দু ; ওদিকে গরীব বামুনদের ব্রহ্মত্ব গাপ করতে এতটুকু ইতস্তত: করতেন না। তিনি ছিলেন তাঁর জমিদারীর বিভিষীকা। শাপান্ত না করে কেউ তাঁর নাম মুখে আনত না। তাঁর ভয়ে সে এলাকায় বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। এ-হেন লোকটার সামনে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে, হাত জোড় করে গোবিন্দ দাঁড়াল।

জয়চাঁদ তাঁর দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ওখানে ?" দেওয়ান বললেন, "বদনের ছেলে গোবিন্দ সামন্ত।"

"ভালো মানুষের ছেলে তা হলে। কি চায় ও ?"

হনুমান সিং তখন এগিয়ে এসে বলল, "মহারাজ, আপনার ছেলের বিয়ের জন্য ও মাথট দিতে চাইছে না। তাই খোদাবানের কাছে ধরে আনলাম।"

"মাথট দিতে চাইছে না! কোনো ব্যাটা প্রজার এত আস্পর্ধা যে আমি মাথট চাইলে না দেয়। তুমি না এক্ষুনি বললে ও বদন সামন্তর ছেলে? বদন আমার সব থেকে ভালো বাধ্য প্রজাদের এক জন ছিল। এ ব্যাটা কি ওর নিজের ছেলে? এ-সব কথা কে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে?"

দেওয়ান তখন কর্তার কানে কানে বললেন, "শুনেছি ছোটবেলায় গোবিন্দ খোঁড়া-মাস্টারের পাঠশালায় কয়েক বছর পড়েছিল।" জমিদার কটমট করে গোবিন্দর দিকে চেয়ে বললেন, "বটে! বটে! ভারি পণ্ডিত হয়েছিস বুঝি? জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে, তাই মাথট দিতে চাচ্ছিস্ না। রামরূপকে এবার বারণ করে দেব, চাষাদের ছেলেদের লেখাপড়া না শেখাতে। তবু যদি শেখায়, তাহলে অন্য ঠ্যাংটাও ভেঙে দেব, আহাম্মুক কোথাকার।"

গোবিন্দ ক্ষীণ স্বরে বলল, "ধর্মাবতার, আমি মাথট দিতে আপত্তি করিনি। আমার সে সাহস নেই। আমি খালি বলেছি এক্ষুণি দিতে পারছি না। বাবার আর ঠাকুমার শ্রাদ্ধে অনেক খরচ হয়ে গেছে, ধার-কর্জ করতে হয়েছে। তার ওপর কদিন বাদেই খাজনা দিতে হবে। তার পরে মাথটটা দিয়ে দেব, হাতে কিছু এলেই।"

জমিদার বললেন, "চুপ কর্! এই আমার হুকুম তিন দিনের মধ্যে মাথট দিতে হবে। না দিলে, হাতে দড়ি বেঁধে তোকে এখানে টেনে আনা হবে। মনে থাকে যেন। দেওয়ান, ব্যাটাকে ছেড়ে দাও।"

পাঠক যেন মনে না করেন যে সেকালের সব জমিদারই কাঞ্চনপুরের জয়চাঁদ রায় চৌধুরীর মতো ছিলেন। সব জাতের মধ্যেই যেমন, জমিদারদের মধ্যেও ভালো-মন্দ ছিল। এ গল্প শেষ হবার আগে এমন জমিদারের কথাও বলা হবে যিনি ন্যায়বান, দয়াবান, প্রজাবৎসল, বাপের মতো। গোবিন্দর কপালেই ঐ রকম জমিদার জুটেছিল। গোবিন্দ নিজেও বলত, "আমার ভাগ্যটাই এমন যে

এই রকম লোকের জমিদারিতে বাস করতে হয়, যার চেহারাটাই মানুষের মতো, স্বভাবে সোঁদর বনের বাঘ!"

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সূর্যদেব তাঁর আগুনের রথে চড়ে সুমেরু পর্বতের আড়ালে গেছেন। গাই-বলদ মাঠ থেকে ফিরে, গোয়ালে উঠেছে। পাখিরা বাসায় আশ্রয় নিয়েছে। কাঞ্চনপুরের মেয়েরা ভূত-প্রেত তাড়াবার জন্য ঘরে ঘরে বাতি দেখিয়েছে। সারা দিনের পরিশ্রমের পর চাষীদের মধ্যে বেশির ভাগই হয় ঘরে বসে তামাক খাচ্ছে, নয়তো রাতের খাওয়ার যোগাড় করছে। খালি কুবের আর তার ছেলে নন্দ, দিনেও যেমন এখন-ও তেমন-ই কাজে ব্যস্ত। গভীর রাতের আগে কামাররা ছুটি পায় না। এ-কথা সত্যি যে দিনের বেলায় যে-সব লোক ছোটখাটো কাজ করাবার জন্য কামারশালায় আসত, এ-সময় তাদের কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। তাদের বদলে বন্ধু-বান্ধব এসে গল্প করবার জন্য জুটেছিল। কিন্তু বন্ধুই আসুক আর যে-ই আসুক, কুবেরের আর নন্দর হাত কামাই যাচ্ছিল না। কুবের সবে আগুন থেকে লাল টকটকে প্রকাণ্ড একটা লোহার টুকরো বের করে এনে নেহাইয়ের ওপর রেখে, দুজনে মিলে সেটাকে বেদম পিটছিল; চারদিকে জ্বলন্ত কুচি ছুটছিল। হুশ্-হুশ্-হুশ্ করে বাপ-ব্যাটার হাতুড়ি পড়ছিল। লোহাটা ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে এল; তারপর তাকে জলে চোবানো হল; তখন আওয়াজটা বদলে শোনাতে লাগল টিপ্-টপ্! টিপ-টপ্! টিপ্-টপ্! কুবের আর নন্দতো এই কাজে ব্যস্ত; ওদিকে চার-পাঁচজন লোক ঐ ঘরেই মাদুরে বসেছিল। ছুতোর মিস্ত্রি কপিল, মদন-মুদী, চতুর নাপিত, রসময় ময়রা আর বোকারাম তাঁতী।

কামারের হাতুড়ি-পেটানো বন্ধ হল; লোহাটা আবার আগুনে দেওয়া হল। কপিল তখন নন্দকে বলল, "শুনেছ, আজ সকালে গোবিন্দকে জমিদারবাবুর কাছে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? জমিদারবাবু ওকে সাবধান করে দিয়েছেন, তিন দিনের মধ্যে মাথট

না দিলে, হাতে হাত কড়া পরিয়ে তাঁর সামনে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে।"

"জমিদারবাবুর বাড়ি থেকে ফিরেই স্যাঙাৎ আমাকে সব কথা বলেছিল। গরীবদের ওপর এ-রকম অত্যাচার কত বড় অন্যায় বল দিকিনি। আমার মনে হয় স্যাঙাতের এটা মেনে নেওয়া উচিত নয়। জমিদারের ছেলের বিয়ে হচ্ছে, তার সঙ্গে আমাদের কি? তাঁর ব্যাপার তিনি বুঝবেন। আমরা কেন খরচ জোগাতে যাব?"

"কিন্তু না দেওয়াটা কি বুদ্ধির কাজ হবে? জমিদারবাবু হলেন বড় লোক, তাঁর একদল লেঠেল আছে। বন্ধুর মতো গরীব মানুষ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?"

বেজায় উত্তেজিত হয়ে, হাতুড়িটা তুলে নিয়ে নন্দ বলল, "এই হাতুড়ির এক বাড়ি দিয়ে জমিদারের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়ে ব্যাটাকে যমের বাড়ি পাঠাতে পারলে বেশ হত! ওর ছেলের বিয়ে, তাতে আমাদের কি? মাথট, আবোয়ব কেন দেব আমরা? কোম্পানি বাহাদুর যে খাজনা ঠিক করে দিয়েছেন, আমরা শুধু তাই দেব।"

চতুর নাপিত বাঁকা হেসে বলল, "বাঃ! বাঃ! বেড়ে বলেছ নন্দ! তুমি দেখছি মস্ত বীর! তবে তোমার বীরত্ব ফোটে ঘরের কোণে। তুমি একটি তালপাতার সেপাই, এক পয়সা দামের বীর! এই যে গোবিন্দ এসেছে।"

গোবিন্দ এসেই বলল, "দেখ স্যাঙাৎ, তুমি বড় অবুঝ। জাননা চারদিকে জমিদারবাবুর চর ঘুরে বেড়াচ্ছে? এক্ষুণি যা বললে, শত্তুরে যদি সে-কথা তাঁর কানে তুলে দেয়, তুমি পড়বে ফ্যাসাদে। আর অত জোরে কথা বল না? দেয়ালের পেছন থেকে কেউ শুনছে কি না, তাই বা কে জানে!"

নন্দর কি তেজ! "বলুক সে জমিদারকে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এত অত্যাচার আর সহ্য হয় না। ওঁর অবিচারের কোনো সীমানা নেই। মাথার ওপর ভগবান নেই নাকি?

অত্যাচারের চোটে প্রজাদের হাড় ভাজা ভাজা হয়ে এল! সূর্যের দিকে তাকিয়ে, হাতে পৈতে নিয়ে, বামুনরা জোরে ওঁকে অভিশাপ দিচ্ছে। এবার আমাদের সকলের ধর্মঘট করে, ঐ সর্বনেশে মাথটটি না দেওয়া উচিত। কি বল স্যাঙাৎ?"

গোবিন্দ বলল, "যা বলছ সবই সত্যি, স্যাঙাৎ। অসহ্য অত্যাচার, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা কি-ই বা করতে পারি? উনি হলেন বড়লোক, ওঁর কত ক্ষ্যামতা। আমরা গরীব। ওঁর সঙ্গে কি করে লড়ব বল?"

নন্দ বলল, "তাহলে তুমি মাথট দেবে?"

গোবিন্দ বলল, "না দিয়ে করি কি? না দিলে আমার ওপর অত্যাচার হবে, হয়তো ফাটকে দেবেন, কিংবা বাড়ি জ্বালিয়ে দেবেন। ন্যায় বিচার পাওয়ার কোনো আশাই নেই।" নন্দ বলল, "মাথার ওপর কেউ নেই নাকি? তিনি এমন দুষ্টু জমিদারকে সাজা দেবেন না?"

গোবিন্দ বলল, "আমার বিশ্বাস ভগবান দুষ্টু লোকদের সাজা দেন? কিন্তু এ-জন্মে সে রকম কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো পরজন্মে উনি সাজা পাবেন। এ জন্মে পাবেন বলে আশা রাখি না।"

কপিল বলল, "ঠিক বলেছ বন্ধু। জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু করে লাভ নেই। যেমন করেই হক মাথটটা তোমায় দিয়ে দিতেই হবে। যাদের হাতে ক্ষ্যামতা তাদের সঙ্গে কি লড়াই করে পেরে ওঠা যায়?"

মদন বলল, "মাথটের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমার চেয়ে বেশি আপত্তি কারো নেই। এটা আমাদের ঘাড়ে চাপাবার জমিদারের কোনো অধিকার নেই। কিন্তু ওঁর সঙ্গে লড়ে কি জেতার সম্ভাবনা আছে? কাজেই আমার মতে ভালোমানুষের মতো টাকাটা দিয়ে দেওয়াই ভালো।"

নন্দ বলল, "কিন্তু ধর্মঘট করবে না কেন?"

গোবিন্দ বলল, "ও-কথা বলা খুব সোজা। কিন্তু কার সঙ্গে ধর্মঘট করবে? গ্রামের সব লোক কি আমাদের সঙ্গে মিলবে?

তোমরা কি জান না ভয়ের চোটে পনেরো আনা মানুষই আমাদের দলে আসবে না? ছ-সাতজন লোক দিয়ে কখনো ধর্মঘট হয়? তোমার খুব সাহস আছে, স্যাঙাৎ, কিন্তু বুদ্ধি ততটা নেই।"

বোকারাম এবার মুখ খুলল, "আমি ও সব ধর্মঘট ফর্মঘট বুঝি না। আমি শুধু এটুকু বুঝি, মাথট না দিলে আমরা ধনে-প্রাণে মরব। তাছাড়া ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনো লাভ হয় না। ওঁর ভাগ্যের জোরে উনি জমিদার হয়েছেন; আমাদের যেমন কপাল, আমরা ওঁর প্রজা হয়েছি। কাজেই ওঁর দাবি আমাদের মানতেই হবে, তা সে ন্যায়ই হক কি অন্যায়ই হক।"

নন্দ বলল, "ভালো বলেছ, বোকারাম, তুমি একটা বীর বটে হে। সাবাস্! সাবাস!"

বোকারাম বলল, "টিটকারি দিলে কি হবে, ভাই। আমি তো তোমাতে আমাতে কোনো তফাৎ দেখি না। কথার বেলায় তুমি পাহাড়, কাজের বেলায় সরষের দানা! আমি জানি শেষ পর্যন্ত তোমার বাবা মাথট দেবেন-ই। তাহলে আর বড়াই করা কেন?',

নন্দর ভারি তেজ, "বাবা মাথট দিলে, আমার অমতে দেবেন। উনি বাড়ির কর্তা, কাজেই উনি যা খুশি তাই করতে পারেন। উনি টাকা দিলেও,আমার মত বদলাবে না। এই যে মানিক-কাকা, উনি যে গোবিন্দর মাথট দেওয়াতে মত করবেন, এমন আমার মনে হয় না। কি বলেন, মানিক কাকা?"

কালামানিক জানতে চাইল, "কি বিষয়ে কি বলি, নন্দ? এখন আমাকে হেঁয়ালী দিয়ে আর জ্বালিও না। আগে একটা সুখ-টান দিই।"

কালামানিক যখন ঘরে ঢুকল গোবিন্দ তামাক খাচ্ছিল, সে অমনি হুঁকোটি কালামানিকের হাতে দিল। অভিজাত কিম্বা মধ্যবিত্তদের মধ্যে কাকার সামনে হুঁকো খাওয়াটাকে অভদ্রতা বলে

মনে করা হয়, কিন্তু চাষীদের বা শ্রমিকদের মধ্যে তা হয় না। তার কারণ ওরা সব সময়েই একসঙ্গে মাঠে-ঘাটে কাজ করে ; সেখানে তো আড়ালে গিয়ে তামাক খাওয়া যায় না আর তামাক ছাড়া তাদের অন্য কোনো অভ্যাস-ই নেই, কাজেই বড়দের সামনে না খেয়েই বা করে কি ?

কালামানিক হুঁকো নিয়ে দু-তিনটে জোরে টান দিল ; সে এমনি জোরে যে কল্কের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠল। তারপর নন্দর দিকে ফিরে বলল, "এবার বল্, কি বিষয়ে আমার মত জানতে চাস্।"

নন্দ বলল, "মাথট ছাড়া আজকাল আর কে কি জানতে চায়, মানিককাকা ? আমি জানতে চাই আপনারা মাথট দেবেন কি না।"

কালামানিক তো অবাক। "আমি ভেবেছিলাম আমাকে তুই এত ভালো করে চিনিস যে অমন প্রশ্ন তুলবি-ই না। আমার মতে মাথট একটা অন্যায় আবদার। তাই ওটা আমি মেনে নিতে পারি না। রেখে দে !! কি ? না, ওনার ছেলের বিয়ে হবে আর আমাদের মতো গরীব মানুষদের তার খরচ জোগাতে হবে ! গরীব প্রজাদের ছেলেদের বিয়ের খরচ কে জোগায় শুনি ? জমিদার একটা কানা-কড়ি দেন ? উল্টে বরং সে-সময়ও তিনি আমাদের কাছ থেকে নজরানা আশা করেন কি না বল্ ? করেন, আর পান-ও। এই হল দুনিয়ার নিয়ম। তেলা মাথায় তেল ঢালো আর আমাদের চুল রুক্ষু থাকুক।"

শুনে নন্দ খুব খুসি। "বেশ বলেছেন, মানিক কাকা আমারও সেই মত। অন্যায় মেনে নেওয়া কক্ষনো উচিত নয়।"

কালামানিক বলল, "আমিও তাই বলি। গোবিন্দ কিন্তু ওর বাপের-ই মতো। ও শান্তি ভালোবাসে ; ও তো মাথট দেবে বলেই ঠিক করে ফেলেছে। জমিদারের হুমকি শুনে ও ঘাবড়ে গেছে।

আমি হলে জমিদারের কাছারিতে আর যেতেই রাজি হতাম না। কেউ ধরে নিয়ে যেতে এলে, তার মাথা ফাটিয়ে দিতাম!"

তাই শুনে গোবিন্দ বলল, "সেটা কি খুব নির্বুদ্ধির কাজ হত না, কাকা? এ-বিষয়ে আমি তোমার সঙ্গে একমত যে মাথট আদায় অন্যায় উৎপীড়ন। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? তুমিই বা কি পার? জমিদারের লোককে পেটালে, আমাকে নির্ঘাৎ কাটকে দেবে। জলে বাস করলে কি আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়? তার সঙ্গে বনিবনা করে থাকাই ভালো। আপত্তি করতে গেলে, আমারই সর্বনাশ হবে।"

চতুর বলল, "এই হল বুদ্ধিমানের মতো কথা। আমাদের মতো গরীব দুর্বল মানুষ কি আর জমিদারের সঙ্গে লাগতে পারে? এ যে বামন হয়ে চাঁদে হাত! গোবিন্দ টাকা দেবে ঠিক করেছে, ভালোই করেছে।"

কালামানিক বলল, "লোকে বলে আমি না ভেবে কাজ করি, আমার বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। না বাপু, আমি তোমাদের মতো বুদ্ধিমান হতে চাই না। দেখি তো আমার কাছে কে মাথট চাইতে আসে! সঙ্গে সঙ্গে দই সমঝে দেব না। তারপর যমের বাড়ি পাঠাব!"

গোবিন্দ বলল, "কাকা, ভেবেচিন্তে তবে কাজ কর। তোমার ঐ বেপরোয়া ভাবের জন্য না বাড়ির সকলের ওপর সর্বনাশ ডেকে আন! এ গাঁয়ে তোমার মতো সাহস আর গায়ের জোর কারো নেই। কিন্তু একশো লোকের সঙ্গে তুমিও একা লড়ে পারবে না। জমিদার বাবু ইচ্ছে করলেই আমাদের পেছনে পাঁচশো লোক লাগাতে পারেন।"

কালামানিক ওকে আশ্বাস দিল, "আমার জন্য ভাবিস্ নে রে, গোবিন্দ। আমি তো একেবারে নির্বুদ্ধি নই। আমার জন্য তোদের সর্বনাশ হবে না।"

গোবিন্দর বন্ধু কপিল এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিল, এবার সে বলে উঠল, "এটা কি খুবই আশ্চর্য কথা নয় যে কোম্পানি বাহাদুর আমাদের ওপর ওনাকে এ-রকম উৎপীড়ন চালাতে দেন? অনেক বিষয়েই তো কোম্পানির রাজত্ব মুসলমান রাজত্বের চাইতে ভালো। তাহলে এই বিষয়ে আরো খারাপ হল কেন? মন্দ জমিদারের হাতে তাঁদের প্রজাদের উৎপীড়ন তাঁরাই বা নিশ্চিন্তভাবে দেখছেন কি করে?"

চতুর বলল, "আচ্ছা ভেড়ু তো তুই, কপিল। তুই কি ভাবিস আমাদের ভালো-মন্দ নিয়ে কোম্পানি বাহাদুর মাথা ঘামান? মোটেই তা নয়। তাঁদের জমাটুকু পেলেই হল। জমিদার কি উপায়ে টাকাকড়ি আদায় করেন, কতখানি করেন, সে-কথা তাঁরা জানতেও চান না। জমিদারের সুবিধার জন্য ঐ হপ্তম আর পঞ্চমের ব্যবস্থা তো কোম্পানি বাহাদুর-ই করে দিয়েছেন, যার ফলে প্রজারা উচ্ছন্নে যাচ্ছে!"

গোবিন্দর মিতা মদন বলল, "আমি কিন্তু বুড়ো মানুষদের বলতে শুনেছি যে কোম্পানি বাহাদুরের দয়া-মায়া ধর্মজ্ঞান আছে। তা হলে তাঁরা কি বলে প্রজাদের ওপর জমিদারদের এই অত্যাচার বরদাস্ত করেন? জমিদার ঐ যে সদর জমাটি দেন, সে তো প্রজাদের গায়ের রক্ত নিংড়ে বের করে দেন!"

গোবিন্দ বলল, "আসল ব্যাপার হল যে যেহেতু কোম্পানি বাহাদুর নিজে ন্যায়বান আর দয়ালু, ওঁরা ধরে নিয়েছেন জমিদারদেরও দয়ামায়া, সাধারণ ন্যায়-বোধ আছে। এঁরা যে এত মন্দ, কোম্পানি বাহাদুর তা স্বপ্নেও ভাবেননি।"

রসময় বলল, "তাই বলে তো আর সব জমিদার মন্দ নয়। হুগলী জেলায় আমার মামার বাড়ি; সেখানকার জমিদার নাকি বড় ভালো মানুষ। মামা বলেন ওঁদের জমিদার হলেন প্রজাদের মা-বাপ। উনি শুধু যে অন্যায় দাবিদাওয়া করেন না তা নয়, তার ওপর খরা কিম্বা বন্যার সময় প্রজাদের খাজনা মাপ করে দেন।"

নন্দ বলল, "ও-রকম জমিদার হয়তো গোটা কতক আছে। কিন্তু পনেরো আনাই অত্যাচারী। পনেরো আনা কেন টাকায় পনেরো আনা তিন পয়সাই অত্যাচারী। গরীব ব্রাহ্মণদের ব্রহ্মোত্তর খেয়ে বসে থাকে, প্রজাদের বাড়ি জ্বালায়। মা-ধরিত্রী কেন যে এদের মতো পাপিষ্ঠদের কোলে ধরেন তা বুঝি না।"

গোবিন্দ বলল, "স্যাঙাৎ, তুমি বড় মাথা গরম কর। কোন দিন একটা কাগ তোমার কথা জমিদারের কানে পৌঁছে দেবে।"

নন্দ বলল, "দিলে তো আমার ভারি বয়ে গেল।"

এর পর সবাই গ্রাবু খেলতে বসল, একদিকে নন্দ আর গোবিন্দ, অন্য দিকে চতুর আর মদন। বাকিরা কেউ এ দলে, কেউ ও দলে। চতুর সব চেয়ে ভালো খেলত, কাজেই ওরাই জিতল; গোবিন্দদের মুখে ছাই দিয়ে তিনটি ছক্কা দুটো পঞ্জা তুলল। বিজয়ীরা ছক্কা তুললেই সবাই খুব হাততালি দিতে লাগল। কেউ এক ফোঁটা মদ মুখে দিল না। হুঁকো ছাড়া কারো কোনো নেশা ছিল না। হুঁকোটা চার পাঁচবার ঘুরল। রাজনীতিবিদ্‌রা যখন উঠে যে যার বাড়ি গেল, তখন রাত প্রায় বারোটা।

এই কথাবার্তার পর গোবিন্দ এই বিষয়ে চিন্তা করে দুটো দিন কাটিয়ে দিল; মাথট দেবে না কি দেবে না। মন ঠিক করতে কম কষ্ট হয়নি। বাড়িতে মা আর কাকার সঙ্গে ঐ বিষয়ে কথা হল;



দু-জন দু-রকম উপদেশ দিল—মা বলল দিয়ে দে আর কাকা বলল কিছুতেই দিতে পাবিনে, তা যা থাকে কপালে। সুন্দরীর যুক্তি ছিল এই রকম: "ক্ষমতাশালী লোককে চটানো ভারি বিপজ্জনক, বিশেষ

করে নিজের রাজাকে। জমিদার ইচ্ছা করলেই আমাদের সর্বনাশ করতে পারেন ; মিথ্যা করে খাজনা বাকি পড়েছে বলে মাঠের ধান কেটে নিতে পারেন ; গোরু আটক করতে পারেন, বাড়ি ঘর লাটে তুলে দিতে পারেন; আমাদের মেরে ফেলতে পারেন। এমন মানুষকে চটাবার কথা তুই ভাবতে পারিস, বাবা ? পুকুরের মাছ কখনো কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে ?"

ওদিকে কালামানিক বলতে লাগল এমন অন্যায় দাবি মেনে নেওয়া হল নিছক কাপুরুষের কাজ। তারপর কালামানিক জমিদারকে যাচ্ছেতাই করে গালিগালাজ করতে লাগল ; বলল, ঐ শালার মতো পাপিষ্ঠ ভূভারতে আর নেই ! গোবিন্দর শ্বশুর পদ্মলোচন সুন্দরীর সঙ্গে এক-মত , সে বলল যে টাকা না দেওয়া পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। পদ্মলোচন তার ওপর গোবিন্দকে সাবধান করে দিল। অনেকে মুখে খুব আস্ফালন করে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব মেনে নেয়। কিছু লোক আসলে গোবিন্দর ক্ষতি করতেই চায় ; তারা ইচ্ছে করে ওকে মাথট না দিতে উস্‌কানি দিচ্ছে, যাতে গোবিন্দর সর্বনাশ দেখে তাদের চোখ জুড়োয়। মোটের ওপর গোবিন্দর মনে হল যে জমিদারের এই অন্যায় আবদারটি মেনে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে টাকা দেবার সময় সে জমিদারবাবুর মুখের ওপর বলে দেবে যে দাবিটা অন্যায় আর বে-আইনী।

নির্দিষ্ট দিনে, সকালে আটটা নাগাদ হনুমান সিং গোবিন্দর বাড়ি এসে বলল জমিদারবাবু ওকে কাছারিতে ডেকেছেন। মাথটের টাকা কোঁচড়ে বেঁধে গোবিন্দ তার সঙ্গে গেল। জমিদারবাবু তাঁর নিজের জায়গায় বসেছিলেন ; তাঁকে ঘিরে দেওয়ান, গোমস্তা ইত্যাদি বসে ছিলেন। গোবিন্দ গলায় কাপড় দিয়ে মাটিতে মাথা ঠুকল।

দেওয়ান বলল, "কি হে সামন্ত, মাথটের টাকা এনেছ ?"

গোবিন্দ বলল, "দেওয়ান-মশাই যদি ওটা মাপ করে দেন তাহলে আমি কেতাত্থ হই। বড় ধার কর্জ হয়ে গেছে।"

জমিদার রাগে ফেটে পড়লেন, "লক্ষ্মীছাড়া, তুই এখনো মাপ করার কথা বলছিস্? তোর বাবা বড় ভালো প্রজা ছিল: সেদিন শুধু তার কথা মনে করে, তুই টাকা দিতে নারাজ হলেও, তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। টাকা দিতে দেরি করার জন্য আর আমার প্রজাদের টাকা না দিতে উস্‌কানি দেবার জন্য, তোকে সাজা পেতে হবে।"

গোবিন্দ বলল, "ধর্মাবতার, আমি তো কাউকে উস্‌কানি দিইনি।"

জমিদার বললেন, "হারামজাদা! আমি ভালো জায়গা থেকে খবর পেয়েছি যে তুই দিয়েছিস্। এই নিয়ে রাতে তোরা মিটিং করিস্‌নি? তুই আমাকে শাসাস্‌নি?"

গোবিন্দ বলল, "না ধর্মাবতার, আমি কখনো আপনাকে শাসাইনি।"

জমিদার বললেন, "নিশ্চয় শাসিয়েছিলি, পাজি কোথাকার, ফের অস্বীকার করলে তোকে জুতো-পেটা করব। আমাকে গালি-মন্দ করবার জন্য তোরা রাতে মিটিং করিস্‌নি বলতে চাস্?"

গোবিন্দ তবু বলল, "মাথট না দেবার জন্য, কিম্বা আপনার নিন্দা করবার জন্য কোনো মিটিং হয়েছিল বলে আমি শুনিনি।

জমিদার বললেন, "দু রাত আগে কুবেরের দোকানে তুই গিয়েছিলি কি না? তখন আমাকে গাল দিস্‌নি?"

গোবিন্দ স্বীকার করল, "গিয়েছিলাম সত্যি; প্রায় রোজই যাই, কিন্তু মিটিং বলে কিছু ডাকা হয়নি। আমি আপনার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিনি, কর্তা।"

জমিদারের বেজায় রাগ, "ফের বলছি, অস্বীকার করলে জুতো-পেটা খাবি।"

এবার দেওয়ান বললেন, "হয়তো গোবিন্দ নয়, অন্য কেউ জমিদারবাবুকে গাল দিয়েছিল। তবে গোবিন্দও নিশ্চয় সায়-দিয়েছিল।"

জমিদার বাবু বললেন, "না, আমি ঠিক জানি এই হতভাগাই আমাকে গাল দিয়েছিল। যদি ও না দিয়ে থাকে, তাহলে আমার মুখের ওপর বলুক কে দিয়েছিল।"

বাঙালী প্রজারা মিথ্যা বলাটাকে সে-রকম কিছু অন্যায় বলে মনে করে না, বিশেষ করে জমিদারের সঙ্গে কারবারে। কাজেই গোবিন্দ অম্লানবদনে বলল সেদিন কেউ জমিদারবাবুকে গাল দেয়নি। কোনো একজন বাইরের লোক সেদিনের ব্যাপারটা খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জমিদারবাবুর কানে তুলেছিল। তিনি এখন রেগে চতুর্ভুজ হয়ে গোবিন্দকে মারতে উঠলেন। দেওয়ান বাধা দিয়ে বললেন যে এমন একটা দীনহীন লোক কি অত বড় জমিদারের হাতে মার খাবার যোগ্য? তারপর গোবিন্দকে বললেন, "মাথটটা দিয়ে, বাড়ি যা।"

কোঁচড় থেকে টাকা বের করতে করতে গোবিন্দ বলল, "দিচ্ছি টাকা, তবু বলি দাবিটা অন্যায়, কোম্পানি বাহাদুরের আইনের বিরুদ্ধে।"

এবার জমিদার আর নিজেকে সামলাতে না পেরে, উঠে পড়ে নিজের এক পাটি চটি দিয়ে গোবিন্দকে মারতে মারতে বললেন, "শালা নেমকহারাম কোথাকার! আমাকে বলিস্ অন্যায় দাবি করছি। চাষাড়ে ভূত, ভারি আইনে পণ্ডিত হয়েছিস্, না! আমাকে কর্তব্য শেখাবি! জুতো মেরে খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব! এই তো সবে কলির সন্ধ্যে! দাঁড়া না, তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে! তোর এমন সর্বনাশ করব যে তোর দুঃখে শেয়াল কুকুরে কাঁদবে।"

এই মারের আর এই গালাগালির ওপর কিছু বলবার সাহস হল না গোবিন্দর। ঐটুকু যে বলেছিল সে-ও বাঙালী চাষীদের চাইতে অনেক বেশি সাহস দেখিয়েছিল। চুপ করে মার খেয়ে, গাল হজম করে, চোখ মুছে, যেখানে জুতোর বাড়ি লেগেছিল সেই জায়গাটি মুছে, টাকা জমা দিয়ে, গোবিন্দ কাছারি থেকে বেরিয়ে গেল।

গোবিন্দ বিদায় নিলে জমিদারবাবু দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন প্রজাদের মধ্যে কতখানি ক্ষোভ জমেছে, তার কি করা যায় ইত্যাদি। এক বিষয়ে দুজনেরই একমত: ঐ কালামানিকটি চারদিকে বিক্ষোভ ছড়াচ্ছে সব চাইতে বেশি; ওকে একটু কড়া রকমের শাস্তি দেওয়া দরকার।

গোমস্তা বললেন, "ঐ কামারের ছেলেটাও কম যায় না, ও সর্বদা জমিদারের দোষ ধরে।" দেওয়ান কিন্তু নন্দর বাবা কুবেরকে পছন্দ করতেন। তিনি বললেন ছেলেটার মাথাটা একটু গরম, লম্বা-চওড়া কথা বলে বটে, তবে ওতে কোনো ক্ষতি হবার ভয় নেই, কারণ ওর কথায় কেউ কান দেয় না। আবশ্যি নষ্টের গোড়া যে কালামানিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরই প্ররোচনায় গোবিন্দ গোড়াতে মাথট দিতে চাইছিল না। তাছাড়া এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না যে জমিদারের বিরুদ্ধে গাঁয়ের লোকদের ও উস্‌কোয়। এখন কি ভাবে শাস্তিটা দেওয়া হবে? লোকটার ভার মনের জোর, বেজায় জবরদস্ত। তার ওপর গায়েও এমন অসম্ভব জোর যে গাঁয়ের যে কোন তিনটে লোক মিলে ওর সঙ্গে পারবে না। কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে ওকে সাজা দিতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে জমিদার হনুমান সিংকে হুকুম দিলেন, "দেখ তো কোথায় কালামানিক; ওকে বল জমিদার ডেকেছেন।" দেওয়ান বললেন এভাবে ডাকলে ওর আসবার সম্ভাবনা কম। এক যদি জন দশ-বারো লোক গিয়ে ওকে ধরে আনে। জমিদার বললেন, "না এলে, আরো জবরদস্ত কিছু করতে হবে। তবে গোড়াতেই খুব বেশি জোর না দেখানোই ভালো।"

হুকুম পেয়েই হনুমান সিং কালামানিকের খোঁজে বেরিয়ে দেখল সে আখের খেতে জল দিতে ব্যস্ত। জমিদারের পেয়াদাকে দেখে কালামানিক বলল, "কি হনুমান সিং, কি মনে করে?"

হনুমান সিং বলল, "তোমার খোঁজেই এসেছি, মানিক সামন্ত।"

কালামানিক বলল, "আমার খোঁজে? কেন তোমার সঙ্গে আমার কি?"

"জমিদার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

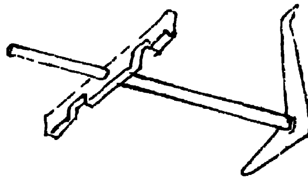
"জমিদার দেখা করতে চান? তাঁর সঙ্গেই বা আমার কি? আমি তাঁর ধার ধারি না। গোবিন্দের সঙ্গে তাঁর দরকার থাকতে পারে, আমার সঙ্গে আবার কিসের দরকার?"

"তা তো জানি না আমি শুধু হুকুম পালবার চাকর।"

কালামানিক বলল, "কিন্তু আমি তো আর তাঁর চাকর নই যে ডাকলেই ছুটে যাব। বলগে আমি ক্ষেতে সেচ দিচ্ছি, এখন আমার কাছারি যাবার সময় নেই।"

হনুমান বলল, "ভালো বলছি চল আমার সঙ্গে। মিছিমিছি মালিককে চটিয়ে কি লাভ? গেলে ক্ষতিটা কি? সে তো আর তোমাকে খেয়ে ফেলবে না।"

"খেয়ে ফেলবে? কই, খাক্ তো দেখি। খেলে পেট ব্যথায় মরবে। আমি কিন্তু ওনার মতো অনেক জমিদারকে খেয়ে হজম করে ফেলতে পারি। মানিক সামন্তের মাংস বড় শক্ত, খেলে সহজে হজম হবে না। তুমি বরং গিয়ে আমার কথাটা তাঁকে বল।" এই বলে আগের চেয়েও উৎসাহের সঙ্গে কালামানিক সেচের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।





১১

পশ্চিম বাংলার চাষীদের মধ্যে উগ্র-ক্ষত্রিয় বা অগুরিদের মতো স্বাধীন জাত আর ছিল না। গোবিন্দ-ও এই বংশের ছেলে। সাধারণ বাঙালী চাষীদের চাইতে আগুরিদের গায়ের রঙ একটু ফিকে হয়। বলিষ্ঠ গড়ন, লম্বা-চওড়া বেশি। সবাই জানত আগুরিরা খুব সাহসী, খানিকটা হিংস্রও বটে। অন্যান্য বাঙালী চাষীদের চাইতে অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে এরা বেশি অসহিষ্ণু। বাকিরা তো হাজার লাথি খেয়েও মুখে রা কাড়ে না। কথায় বলে 'আগুরির গোঁ': এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণের ধারণা আগুরিদের রক্ত গরম, ভয়-ভীতি নেই তাদের, ভারি একগুঁয়ে আর এতটুকু অপমান সইতে পারে না। বর্ধমানের চাষীদের বেশির ভাগই সদ্গোপ; আগুরিরা সংখ্যায় কম; নিজেদের মধ্যে খুব একতা; সকলের জন্য সকলের সহানুভূতি; বাঙালীদের অন্যান্য জাতের মধ্যে এমন দেখা যায় না। গায়ের স্বাভাবিক জোর বেশি; এরা খাটেও বেশি ফলে এদের অবস্থা অন্যদের চাইতে ভালো; সেই অনুপাতে স্বাধীন ভাবটাও বেশি। কাজেই গোবিন্দর সঙ্গে জমিদারবাবুর ঐ রকম ব্যবহারের ফলে যে কাঞ্চনপুরের সব আগুরি ক্ষেপে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি? সকলের মতে যত রকম সাজা অছে—তার মধ্যে জুতো মারা হল সব চাইতে অপমানকর, সব চাইতে ছোট জাত ছাড়া কাউকে জুতো মারা উচিত নয়। বাগদী, হাড়ি, ডোমদের চাইতে আগুরিরা

নিজেদের কতখানি উন্নত মনে করত, তাদের, একজনের প্রতি এমন অপমানজনক ব্যবহারের ফলে তাদের ক্ষোভ দেখেই তার হিসেব পাওয়া গেল।

সেচের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে জুতো-পেটার কথা শুনেই কালামানিক রাগে ক্ষ্যাপার মতো হয়ে উঠল। অমনি অত্যন্ত কটু ভাষায় সে জমিদারকে গাল দিতে লাগল আর প্রতিজ্ঞা করল যে তাদের বংশের এই অপমানের প্রতিশোধ সে নেবেই। সারা দিন ধরে, একেবারে সন্ধ্যার পর অবধি গাঁয়ের সব আগুরি চাষী গোবিন্দর আর কালামানিকের সঙ্গে দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে গেল। সবাই বলল গোবিন্দর অপমান তাদের-ও অপমান: এখন থেকে তারা যে ভাবে পারে জমিদারের বিরোধিতা করবে।

কিন্তু কি এমন করতে পারত তারা? গাঁয়ে বড় জোর পঁচিশ ঘর আগুরি ছিল। আরো বেশি যদি থাকত-ও, তবু জমিদারবাবুর বিরুদ্ধে কি এমন করতে পারত তারা? জমিদারের হাজার প্রজা, অন্তত: একশো গুণ্ডা লেঠেলের দল। তাছাড়া সদ্গোপরা আর অন্য চাষীরাও আগুরিদের পক্ষ নেবে না। জমিদারের আর তাঁর মাইনে-করা প্রতিনিধিদের নিত্য লাঠির বাড়ি, লাথি, কিল খেয়ে খেয়ে তাদের মধ্যে যেটুকু আত্মসম্মান ছিল, তাও কবে নষ্ট হয়ে গেছিল। সে আত্মসম্মান ছিল শুধু গোবিন্দর আর তার আগুরি জাতভাইদের। আগুরিদের সঙ্গে অন্যদের সহানুভূতি থাকা দূরের কথা, তাদের মতে আগুরিদের চামড়া বড় বেশি পাৎলা; সামান্য কিছু হল কি না হল, অমনি রেগে চটে একাকার করে!

সে সময় অর্থাৎ উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেকে, জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করে শুধু একজন কেন, একদল প্রজাও পেরে উঠত না। বৃটিশ সরকারের প্রবর্তন করা হপ্তম আর পঞ্চম, অর্থাৎ ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৭নং আইন আর ১৮১২-র ৫নং আইনের জোরে জমিদারদের হাতে অসীম ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। খাজনা বাকি পড়লে তাঁরা প্রজাদের

জমিজমা, বসত বাড়ি, গাই-বলদ অধিকার করতে তো পারতেন-ই, এমন কি তাদের কাছারিতে হাজিরা দিতে এবং হাজত বাস করতে বাধ্য করতে পারতেন। সেকালের বেশির ভাগ জমিদারের-ই ধর্ম-বোধ কি ন্যায় বিচার বলে কিছু ছিল না। তারা প্রজাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ করতেন; খাজনা নিয়ে তার রসিদ দিতেন না: তাছাড়া নিজেদের স্বার্থের আর প্রজার সর্বনাশের জন্য তাঁরা জাল-জুয়োচুরি, ধাপ্পাবাজি ইত্যাদি, দুর্বৃত্তদের হাজার রকম চালাকির সুযোগ নিতে একটু পেছপাও হতেন না। জমিদারের এই অত্যাচারের বিপক্ষে দাঁড়াবার সাহস আর মনের জোর প্রজাদের ছিল না। খাগুরিদের তেজী আর সাহসী বলা হয়েছে; কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে অন্য বাঙালী প্রজাদের সঙ্গে তুলনা করলে তবেই ওদের ঐ গুণগুলি চোখে পড়ত। নয়তো সাধারণভাবে বলতে গেলে, বাঙালী প্রজারা ভারি বাধ্য ও ভীতু স্বভাবের। আয়ারল্যাণ্ডের চাষীদের মতো এরাও যদি তেজ দেখাতে পারত, তাহলে জমিদারের পক্ষে ওদের অমন নিপীড়ন করা সম্ভবই হত না।

একজন বুড়ো খাগুরি চাষী জানতে চাইল, "মাথট তো প্রায় সবাই দিয়ে ফেলেছি; তাহলে কি ভাবে জমিদারের বিরোধিতা করা হবে?"

কালামানিক বলল, "আমার মতে এক কোপে মা-ধরণীর বুকের ভার ঐ ব্যাটা রাজাকে সরাতে পারলেই সব চেয়ে ভালো হত।"

বুড়ো চাষী তখন বলল, "দেখ, মানিক সামন্ত, আমি দেখছি তোমার ঐ না ভেবে কথা বলার জন্য তুমি আমাদের সবাইকে বিপদে ফেলবে। জমিদারকে মেরে ফেললে, বর্ধমানের ফাঁসি-কাঠে তোমাকে তো ঝুলতে হবে তার ওপর আমাদেরও কয়জনকে বোধ হয় যাবজ্জীবন জেল খাটতে হবে, কিম্বা কালাপানি পার হয়ে দ্বীপান্তরে যেতে হবে।"

কালামানিক বলল, "মানিক সামন্ত কখনো এমন কাঁচা কাজ করে না যাতে নিজের কিম্বা বন্ধুদের জীবন সংশয় হয়। কাজটা করা হবে, কিন্তু যে করল তাকে দেখা যাবে না।"

বুড়ো চাষী ব্যাকুল হয়ে উঠল, "দেখ বাবা, আমি তোমার বাপের বয়সী, এমন কুচিন্তা মন থেকে দূর করে দাও। রক্তপাতের মতো মহাপাতক কর না; দেবতারাই ওঁকে সাজা দেবেন। ওঁর কপালে যা লেখা আছে, আমাদের পক্ষে আগেবাগে গিয়ে সেইটে করা শোভা পায় না। ছোটখাটো উপদ্রব করে ওঁকে জ্বালাতে পারলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।"

কালামানিক বলল, "শোননি বুঝি আমি নিজে জমিদারকে দারুণ অপমান করেছি। হনুমান সিংকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমি যেতে রাজি হইনি!"

বুড়ো বলল, "তোমাকে আবার ডেকে পাঠালেন কেন? কেন ডেকেছেন তা বলেনি হনুমান?"

কালামানিক উত্তর দিল, "কোনো কারণ দর্শায়নি, কাজেই আমিও যেতে রাজি হইনি। তবে কারণটা আমার জানা আছে। সেদিন সন্ধ্যায় কুবেরের দোকানে আমি যে-সব কথা বলেছিলাম, কোন ব্যাটা ছুঁচো গিয়ে অমনি জমিদারের কিম্বা দেওয়ানের কানে লাগিয়েছে! ওঁরা বলছেন আমিই হলাম পাণ্ডা, যত নষ্টের গোড়া আমি!"

বুড়ো বলল, "তাহলে না গিয়ে ভালোই করেছ। গেলে নির্ঘাৎ অপমান হতে। হয় জুতো-পেটা, নয় জেল।"

কালামানিক চটে গেল, "বেশ দেখা যাবে। আমার নাম যদি মানিক সামন্ত হয় তো গোবিন্দকে অপমান করার জন্য ঐ জমিদারকে নাকের জলে চোখের জলে এক হতে হবে।"

শেষ পর্যন্ত কি উপায়ে জমিদারকে জব্দ করা হবে, তার কিছু ঠিক হল না। তবে মনে হল কালামানিক মনে মনে মৎলব

পাকাচ্ছিল। পরদিন থেকে ও মাঠে কাজ করতে বিশেষ যেত না, চারদিকের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াত। প্রায়ই ভোরে সূর্য ওঠার অনেক আগে গ্রাম থেকে চলে যেত, অনেক রাতে ফিরত। গোবিন্দ এসব লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেও কাকার কাছে কোনো উত্তর পায়নি: কাজেই ভেবেছিল এ বিষয়ে আর না ঘাঁটানোই ভালো।

একদিন রাতে গোবিন্দ আর বাড়ির মেয়েরা সবাই ঘুমিয়েছিল; কালামানিক আধ-জাগা অবস্থায় গুমোট আর ছারপোকার জ্বালায় এপাশ-ওপাশ করছিল; এমন সময় বাইরে থেকে বাঘা কুকুরটার চিৎকার কানে এল। বাঘা কখনো রাত দুপুরে ডাকত না, কাজেই কালামানিকের কেমন খট্‌কা লাগল। চোর এসে বড় ঘরের দেয়ালে সিঁদ কাটছে না তো? বাড়ির যা কিছু দামী জিনিস, সব তো সেখানে।

কুকুরের ডাক আরো বেড়ে যাওয়াতে, বিছানা থেকে উঠে, ঘরের কোণা থেকে বাঁশের লাঠিটা তুলে নিয়ে, দরজা খুলে কালামানিক ঘরের পেছনের গলিতে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো লোক দৌড়ে এসে, পাঁই পাঁই ছুটে পালাল একজনকে কালামানিক স্পষ্ট চিনতে পারল, পশ্চিমে ঢলে পড়লেও, আকাশে তখনো চাঁদ ছিল। সে লোকটা হল জমিদারবাবুর লেঠেলদের পাণ্ডা ভীমা কোটাল। কালামানিক অমনি চেঁচিয়ে উঠল, "ভিমে! ভিমে! চোর! চোর!"

দুঃখের বিষয় সেই ঘোর রাতে কেউ সাহায্য করতে এল না; পাড়া পড়শীরা সব ঘুমিয়ে কাদা। কালামানিক প্রথমে ভেবেছিল লোকদুটোকে তাড়া করে যাবে; তারপর দেখল তারা অনেক দূর এগিয়ে আম-বনের পুকুর-পাড় অবধি পৌঁছে গেছে। তাদের আর ধরা যাবে না। অগত্যা কালামানিক বড় ঘরের পেছনে সিঁদ পড়েছে কি না দেখতে গেল। দক্ষিণ-পূব কোণা অবধি গিয়েই দেখে ঘরের চালে আগুন লেগেছে। ওর প্রথম চিন্তা গোবিন্দকে, ওর ছেলেপিলে

আর বৌকে বাঁচাতে হবে। তারা তো সব ঐ ঘরেই ঘুমিয়ে আছে। চালে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে! ছুটে বাড়ির ভিতরে গিয়ে, বড় ঘরের দরজায় লাঠির ঘা দিতে দিতে, কালামানিক প্রাণপণে চ্যাঁচাতে লাগল, "গোবিন্দ! গোবিন্দ! ওঠ্! বাড়িতে আগুন লেগেছে!" দরজায় অমন আওয়াজ আর ঘরের চাল পোড়ার পড়-পড় শব্দ শুনে নিমেষের মধ্যে গোবিন্দের ঘুম ছুটে গেল। লাফিয়ে উঠে, স্ত্রীকে জাগিয়ে, দোর খুলে ছেলেমেয়ে কোলে করে ওরা দৌড়ে বেরিয়ে এল। কালামানিক ঘরে ঢুকে কাপড়চোপড়, জিনিসপত্র যেটুকু পারল, টেনে বের করে উঠোনে ফেলল। তারপর পাড়ার লোকের বাড়ির দিকে ছুটে গেল, "আগুন! "আগুন! উঠে পড়, ভাই সব!"

পড়শীদের মধ্যে কেউ কেউ উঠে এলে, কালামানিক আবার দৌড়ে বাড়ি ফিরে গোবিন্দকে হুকুম দিল পুকুর থেকে কলসী কলসী জল নিয়ে আসতে। হঠাৎ ঘুম থেকে এই সর্বনাশের মধ্যে জেগে গোবিন্দ কেমন হকচকিয়ে গেছিল, অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। পুকুরটা ছিল বাড়ির পাশেই. গোবিন্দ গেল জল আনতে, কালামানিক বড় ঘরের ছাদে উঠল। এক দিকটা দাউ দাউ করে জ্বলছিল। গোবিন্দ এক কলসী জল আনতে আনতে পড়শীরা কেউ কেউ পৌঁছে গেল। সবাই মিলে ঘরের যে দিকটাতে আগুন লাগেনি সে দিকে জল ঢালতে লাগল। একজন পড়শী পুকুর-ঘাটে দাঁড়িয়ে কলসী কলসী জল তুলে আরেক জনের হাতে দিল, সে আরেক জনকে, এমনি করে হাতে হাতে বড়-ঘরের দেয়ালে ঠেকানো বাঁশের মই পর্যন্ত জল পৌঁছে যেতে লাগল। সেখানে গোবিন্দ দাঁড়িয়েছিল, সে কলসীটি কালামানিককে দিল; কালামানিক কলসীর জল চালের ওপর ঢালতে লাগল। এই ভাবে কলসীর পর কলসী জল খড়ের চালে ঢালা হলেও ঘরের কিছুটা অংশ বাঁচাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। ততক্ষণে আগুন চালের একেবারে মাজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল আর

অত জল দেওয়া সত্ত্বেও খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ছিল। শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে বড়-ঘরটিকে আগুনের কাছে সঁপে দিয়ে কালামানিক নেমে এল।

তারপর পাছে অন্য ঘরের চালে আগুন ধরে যায়, তাই সে সব ঘরের চালেও খুব করে জল ঢালা হল। গাই-বলদ গোয়াল থেকে বের করে যতটা দূরে সম্ভব রাখা হল। ঘরে গোরু পোড়া মহা পাপ, এ-কথা সকলেই বিশ্বাস করত। এমন কি কারো স্ত্রী ছেলেমেয়ে আগুনে পুড়ে মলে যত পাপ হয়, গোরু মলে হয় তার চাইতেও বেশি।

এদিকে ওদের সব চাইতে ভালো ঘরখানি দাউ দাউ করে জ্বলছিল। আকাশে, অনেক উঁচুতে তার ধোঁয়া উঠছিল; তার আলোয় আধখানা গ্রাম আলো হয়েছিল: বাঁশের কড়ি আর তালগাছের খুঁটি ফট্-ফট্-দুম্-দুম্ করে এত জোরে ফাটছিল যে বহু-দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল। গ্রামের চারদিকে আগুনের খবর রটে গেল; আগুন দেখবার জন্য নানা দিক থেকে লোক ছুটে আসতে লাগল। মুখে অনেকে সহানুভূতি জানালেও, হাত লাগাল খুব কম। সে যাই হক, ঐ একখানি ঘর খেয়েই সেদিনকার মতো অগ্নিদেবের পেট ভরল: অন্য ঘরগুলি বেঁচে গেল।

রাতের যেটুকু বাকি ছিল, গোবিন্দ কালামানিক আর বাড়ির অন্য সকলে জ্বলন্ত ঘরের সামনে খোলা উঠোনে বসে সেটুকু কাটিয়ে দিল। জনাকতক সহানুভূতিশীল বন্ধুও তাদের সঙ্গে ছিল: কামারের ছেলে নন্দ, ছুতোর মিস্ত্রি কপিল, মুদীর ছেলে মদন, গোবিন্দের শ্বশুর পদ্মলোচন, আরো কজন আগুার বন্ধু। কালামানিক গোড়াতেই হাতে করে যে সামান্য কটি জিনিস বের করে এনেছিল, তা-ছাড়া আর কিছুই বাঁচানো যায়নি। দামী জিনিস সামান্য যা কিছু ছিল আর সমস্ত দলীল আর কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল।

কালামানিক ওদের সমস্ত ব্যাপারটা বিস্তারিত বলেছিল। কুকুরের

ডাক শুনে ওর কেমন সন্দেহ হয়েছিল বুঝি সিঁদেল চোর এসেছে; তারপর ঘর থেকে বেরিয়েই কেমন জমিদারের লেঠেলদের পাণ্ডা ভীমা কোটালের আর অন্য একটা লোকের সঙ্গে দেখা হল; ওরা কেমন চোঁ-চাঁ দৌড় দিল ইত্যাদি। সকলের-ই মনে হল ভীমা কোটালই ঘরের চালে আগুন দিয়েছিল, নিঃসন্দেহে জমিদারের হুকুমে।

পরদিন সকালে কালামানিক ফাঁড়িদারের কাছে গিয়ে নালিশ করল ওদের বড়-ঘর পুড়ে ছাই হয়েছে। ভীমা কোটাল আগুন লাগিয়েছে। ফাঁড়িদার ভীমাকে ডেকে পাঠাল। ভীমার বৌ জানাল যে দিন দুই আগে ভীমা শ্বশুরবাড়ি গেছে, আড়াই কোশ দূরের গ্রামে। তখনো সে ফেরেনি। তখন ফাঁড়িদার খোদা বক্স কালা-মানিককে জিজ্ঞাসা করল যে ভীমা যখন দুদিন থেকে গ্রামেই নেই, তখন সে আগুন দেয় কি করে? কিন্তু কালামানিক আর অন্য আগুরিরা বলতে লাগল আগের দিনও ভীমা গ্রামে ছিল বৈকি। ওর বৌ মিছে কথা বলছে।

পরদিন ভীমা গ্রামে ফিরে এল। গোবিন্দের ঘরে আগুন দিয়েই সে সত্যি ভেগেছিল। ফাঁড়িদার তদন্ত বসাল। জমিদারের লোকদের ছজন আটজন সাক্ষী দিল ভীমা গত দুদিন গ্রামে ছিল না। ভীমার শ্বশুরবাড়ির লোকরা বলল যে সে ঐ দুদিন তাদের কাছে ছিল; কাজেই কেস্ ডিস্‌মিস্ হয়ে গেল। জমিদারবাবুর অনুরোধে ফাঁড়িদারের কর্তা মন্তেশ্বরের দারোগাকে কিছুই জানানো হল না। তা সত্ত্বেও গ্রামবাসীদের বেশির ভাগেরই ধারণা হয়েছিল যে জমিদারের হুকুমে ভীমাই ঐ কাজটি করেছিল। আগুরির ক্ষোভ এতে আরো বেড়ে গেল আর প্রতিশোধ নেবার জন্য কালামানিক দাঁত কিড়িমিড়ি করতে লাগল।

এর পর গোবিন্দর সব চাইতে বড় দুর্ভাবনা হয়ে দাঁড়াল বড় ঘরটিকে যে জমিদারবাবু পুড়িয়ে ছাই করলেন, ওটিকে আবার কি করে

তোলা যায়। শুধু দেয়ালগুলোই দাঁড়িয়েছিল। খড়ের চাল, বাঁশের ছাউনি, তাল-কাঠের খুঁটি বরগা, সব পুড়ে শেষ। এই রকম আরেকখানি ঘর তুলতে তখন শত-খানেক টাকা লাগত। বর্ধমানের লোকেরা অন্যান্য জায়গার চাইতে ঘর-বাড়ি আরো ভালো করে বানাত। তবে বড় ঘরের দেয়াল, মেঝের কোনো ক্ষতি হয়নি; কাজেই শুধু, খড়ের চাল আর খুঁটি, কড়ি, বরগাতে পঞ্চাশ-ষাট টাকা মতো পড়বে। এত টাকা গোবিন্দ পায় কোথায়? টাকার বাক্সে—এক বিঘৎ লম্বা একটা টাকা-কড়ির বাক্স ছিল গোবিন্দের—প্রায় কিছুই ছিল না, বড় জোর একটা টাকা আর কয়েকটা পয়সা, বাক্সটি একেবারে শূন্য রাখা ভারি অপয়া। এখানকার চাষীদের অবস্থা খানিকটা ভালো হলেও, তাদের নগদ টাকা থাকে না। যদি কিছু থাকে, সে হল বৌ-ছেলে-মেয়ের গায়ে রূপোর গয়নাপত্র। চাষীর ধন হল তার ধানের মরাই, খড়ের গাদা, গাই-বলদ। হঠাৎ টাকা দরকার হলে, তাদের একমাত্র উপায় ছিল মহাজনের লোহার সিন্দুক। ঐ মহাজনই হল গ্রামের সেরা মানুষ; দরকারের সময় একমাত্র সে-ই হল গরীব চাষার সহায়।

অবিশ্যি এ-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে মহাজনরা বড় বেশি সুদ নিত। তেমনি এ-কথাও সত্যি যে চাষীরা খুসি হয়েই সে সুদ দিত। এদেশের খবরের কাগজে যতখানি লেখে, বাংলায় অন্ততঃ মহাজনদের ওপর লোকে অতটা চটা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের সহায়তা না পেলে অনেক বাঙালা চাষীকেই দেনার দায়ে জেল খাটতে হত। ঘর পোড়ার পরের দিনই গোবিন্দ তার মহাজনের কাছে গিয়ে হাজির হল। সে লোকটির বাড়ি কুবেরের কামারশালা থেকে বেশি দূরে ছিল না।

তার নাম গোলক পোদ্দার, জাতে সুবর্ণ-বণিক; তবে কলকাতার মল্লিকদের, কিম্বা চুঁচুড়ার লাহা, শীল, মণ্ডলদের মতো অতটা উঁচু জাতের নয়। জাতে গোলক স্বর্ণকার, অর্থাৎ স্যাকরা ছিল না, যদিও

ওর প্রধান কাজই ছিল সোনা রূপোর গয়না তৈরি করা। এমন কি এ অঞ্চলের সেরা স্যাকরা বলে ওর নামডাক ছিল। ও ছিল ওস্তাদ কারিগর, ওর তদারকিতে অনেকগুলি স্যাকরা কাজ করত। সোনা রূপো কেনা-বেচাও করত গোলক। সোনা রূপোর গয়না বাঁধা রেখে, কিম্বা সুদ নিয়ে টাকা ধার দিত।

বর্ধমান শহরে মহারাজার প্রাসাদের পাশেই ওর একটা দোকান ছিল। সেটার দেখাশুনো করত ওর দুই ছেলে। সবাই বলত এ গ্রামের মধ্যে গোলক পোদ্দার-ই হল সব চাইতে বড়লোক, কিন্তু ওর বসত-বাড়ি কিম্বা হালচাল দেখে সে কথা বোঝা দায় ছিল। বাড়ির চার-দিকে অবিশ্যি একটা উঁচু পাঁচিল ছিল; তার ওপর ভাঙা শিশি-বোতলের টুকরো গাঁথা ছিল, যাতে চোর-ডাকাতরা সহজে বেয়ে উঠতে না পারে। কিন্তু ওর একটিও পাকা ঘর ছিল না। শুধু কতকগুলো খড়ের চাল দেওয়া মাটির ঘর; তবে এটুকু মানতেই হবে যে ঘরগুলোর কাঠামো খুব ভালোভাবে তৈরি ছিল।

গোলক তার নিজের, কিম্বা পরিবারের জন্য এত কম খরচ করত, দোল-দুর্গোৎসব কি ঐ ধরনের কিছু, যাতে পয়সা খরচ করতে হয়, সে-সব এমন ভাবে এড়িয়ে যেত, বামুনকে কি ভিখিরীকে এত অল্প দান-খয়রাত করত যে লোকে ওকে এক নম্বরের কিপ্টে বলত। সকালে কেউ ওর নাম করত না, বলত অমন অলুক্ষণে নাম মুখে আনলে সারা দিন উপোস করতে হবে। তা সত্ত্বেও গোলক মানুষটি ভারি খাঁটি ছিল, কাউকে সে একটি পয়সা ঠকাত না আর কাজ কারবারে ভারি সাধু ও সৎ ছিল।

মহাজনের বাড়ি পৌঁছে গোবিন্দ দেখল একটি পরিপাটি মাটির ঘরের দাওয়ায় মাদুরে বসে গোলক একটা কষ্টিপাথরে এক টুকরো সোনা ঘষে পরখ করছে সোনাটা কতখানি খাঁটি। পরনে একটিমাত্র ধুতি; গা খালি। দেখে মনে হত পঞ্চাশের ওপরে বয়স; বুকে ঘন লোম, চোখে চশমা; মাথা ভরা কাঁচা-পাকা চুল। মুখ

তুলে, চশমা খুলে, গোবিন্দের দিকে চেয়ে গোলক বলল, "কি হে সামন্ত, খবর কি? কাল তোমার বড়-ঘর পোড়ার কথা শুনে খুবই দুঃখিত হলাম। সবটাই গেছে, নাকি কিছুটা বেঁচেছে?"

গোবিন্দ বলল, "সব গেছে, পোদ্দার মশাই। কিছু বাকি নেই। সমস্তটা পুড়ে ছাই।"

গোলক বলল, "এমন পাপ কাজ করলটা কে?"

"কি আর বলব, মশাই। গরীবের ওপর শত অত্যাচার। আগুন লাগার ঠিক পরেই কাকা দেখলেন ভীমা কোটাল আর অন্য একটা লোক আম-বাগানের দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে!"

"ভীমা কোটাল? ফাঁড়িদারকে বলেছিলে সে কথা?"

গোবিন্দ বলল, "কাকা বলেছিলেন। কিন্তু আপনিও তো জানেন ফাঁড়িদার তো জমিদারের হাতের মুঠোয়। জমিদারের লোকজন এসে বলল ভীমা নাকি তার দু-দিন আগেই আড়াই কোশ দূরে শ্বশুর বাড়ি চলে গেছিল। কাজেই কেস্‌টা চাপা পড়ে গেল। এমন কি মহেশ্বরের দারোগাকেও খবর দেওয়া হল না। গরীবরা কখনো সুবিচার পায় না।"

গোলক বলল, "হুঁ, যা বলছ, সামন্ত। এ দুনিয়াটা বড় খারাপ জায়গা। জীবনকালে কিছু দেখতে আমার বাকি নেই। কেন আমি চাষের জমি কিনি না তার ঐ একটা কারণ। জমিদার টমিদারের ধারে কাছে যেতে চাই না।"

গোবিন্দ বলল, "আপনার যথেষ্ট সোনা-দানা আছে, আপনার জমিদারের কাছ থেকে জমি না নিলেও চলে। কিন্তু আমাদের মতো চাষীরা কি করবে বলুন? জমি-ই আমাদের প্রাণ।"

গোলক বলল, "তা সত্যি। তাহলে এখন কি করা হবে?

গোবিন্দ বলল, "যে আগুন জ্বালাল তাকে কিছুই করা হবে না। কিন্তু ঘরটাকে তো আবার ছাইতে হবে। আপনি ছাড়া আর

আমার বন্ধু কে আছে? আপনি সত্যিই আমার অন্নদাতা; আমি আপনার খাই-পরি।"

গোলক তখন বলল, "দেখ সামন্ত, এমনিতেই তুমি আমার কাছে অনেক টাকা ধারো। যদিও আমি কখনো টাকা আদায় করবার জন্য আদালত কাছারি করি না, তবু টাকাটা তো শীগ্‌গির শোধ দিতে হবে। আরো টাকা ধার নেবে কি উপায়ে?

গোবিন্দ হতাশ হল. "ধার না নিলে, আমার চলবে কি করে? আমার স্ত্রী-পুত্র কি রাতে খোলা মাঠে পড়ে থাকবে? আপনি টাকা না দিলে. ঘর-ও হবে না।"

গোলক লোকটি ভালো, "আচ্ছা, দেখি। কত লাগবে তোমার?"

গোবিন্দ বলল, "ষাটের কমে তো হবে না।"

গোলক অবাক হল. "ষাট টাকা! এত টাকা দিয়ে কি করবে? দেওয়ালগুলো নিশ্চয় আছে, মেঝেটাও আছে, খুঁটিও হয়তো কিছু আছে। তোমার খড়ের গাদায় নিশ্চয় যথেষ্ট খড় আছে। তারপর পুকুর-পাড়ে তোমার কয়েকটা বাঁশঝাড় আছে। আমার মতে. ত্রিশ টাকাই যথেষ্ট।"

গোবিন্দ ব্যস্ত হয়ে উঠল, "ষাট টাকার চেয়ে এক কড়ি কমে হবে না, পোদ্দার মশাই। সব খুঁটি পুড়ে ছাই। খড়ের গাদায় যা আছে তাতে গাই বলদের-ই কুলোবে কি না সন্দেহ। বাঁশঝাড়ের বাঁশ সব কচি আর কাঁচা. ঘর তৈরির কাজে একটিও চলবে না।"

গোলক বলল, "তোমাকে টাকাটা দিতে পারি সত্যি। কিন্তু আমি ভাবছি আগের ধারের সুদের সঙ্গে এই নতুন ধারের সুদ মিলে তোমার ওপর বড় বেশি চাপ পড়বে না তো? বুঝতেই পারছ টাকা পিছু মাসে দু-পয়সা সুদ দিতে হবে।"

গোবিন্দ বলল, "সুদ অনেক দিতে হবে সত্যি। কিন্তু এ ব্যামোর আর তো ওষুধ নেই। যেমন করে হক ব্যবস্থা করতেই হবে।"

গোলক পোদ্দার এক টুকরো কাগজে রীতিমতো রসিদ লিখে, গোবিন্দের সই নিল। ওর দুজন কারিগরও সাক্ষী হয়ে সই দিল। তারপর গোলক টাকাটা গুণে দিয়ে দিল।

টাকা পেয়েই গোবিন্দ আর কালামানিক কাজে লেগে গেল। তাল-গাছ কিনে কাটা হল। কয়েক কোশ দূরের একটা গাঁ থেকে বাঁশ কিনে এনে, চিরে, বাখারি তৈরি হল। এই সমস্ত আর অন্যান্য কাজে নন্দ কামার আর কপিল ছুতোর অনেক সাহায্য করল। নন্দ বিনা পয়সায় সমস্ত পেরেক, আঁকশি ইত্যাদি লোহার কাজ করে দিল। কপিলও টাকা না নিয়ে তালের খুঁটি, কড়ি, বরগা ইত্যাদি তৈরি করল।



গোবিন্দর বড়-ঘর পুড়ে যাবার কয়েক দিন পরে বাবু জয়চাঁদ রায় চৌধুরী তাঁর কাছারিতে প্রকাণ্ড তাকিয়া ঠেস দিয়ে, আধ-শোয়া অবস্থায় লম্বা নলওয়ালা গড়গড়া টানছিলেন। এইভাবে জমিদারি চালে, দেওয়ান, গোমস্তা, মুহুরী নিয়ে জাঁকিয়ে বসে আছেন, এমন সময় তাঁর লেঠেলদের পাণ্ডা ভীমা সরদার এসে ঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করল। জয়চাঁদ মাথাটা সামান্য তুলে, মুখ থেকে গড়-গড়ার নল নামিয়ে বললেন, "বেশ, বেশ, ভীম সরদার, তোমার খবর কি ?"

ভীমা বলল, "সব ভাল মহারাজ। মহারাজের রাজ্যে কি আর মন্দ কিছু হবার জো আছে ?"

জয়চাঁদ বললেন, "সেদিন রাতে বেড়ে কায়দা করে সামলে

নিলে। তবে আর একটু হলেই ধরা পড়তে। ও ব্যাটা যদি তোমাকে ধরতে পারত তবেই তোমার হয়ে গেছিল! হতভাগা যমের মতো কালোই নয়, যণ্ডাও বটে।"

ভীমা তো আকাশ থেকে পড়ল, "ও ব্যাটা আমাকে ধরবে!! আপনার আশীর্বাদে মহারাজ, একা লড়ে আমি ওর মতো দশটাকে ঘায়েল করতে পারি।"

জয়চাঁদ বললেন, "সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে ভীম, নিজের শক্তি বাড়িয়ে বলছ। ও হতভাগার গায়ে নিশ্চয় তোমার চেয়ে জোর বেশি। তুমি হলে ভীম আর ও ব্যাটা নির্ঘাৎ অর্জুন। সে যাই হোক গে, তুমি কাজ হাসিল করেছিলে, তার জন্য তোমার বকশিস পাওয়া উচিত।"

ভীমা বলল, "মহারাজ, আমার যা কিছু আছে, সবই আপনার দান। আপনার খেয়ে পরেই বেঁচে আছি। এর বেশি আবার কি চাইব?"

জয়চাঁদ খাজাঞ্চিমশাইকে বললেন ভীমাকে দুটো টাকা দিয়ে দিতে। খাজাঞ্চিমশাই টাকা দুটো মাটিতে ফেললেন; জমিদার সরদারকে বললেন, "যাও, টাকা নিয়ে, স্যাঙাৎদের সঙ্গে ফুর্তি কর গে।" সরদার আরেকবার কুর্নিশ করে, "রাম! রাম! রাম!" বলে বিদায় নিল।

জয়চাঁদ তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করতে বসলেন; ওদিকে ভীমা সরদার দশ-বারোজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রথমে মুদীর দোকানে গিয়ে রাশি রাশ মুড়ি মুড়কি বাতাসা ফুটকলাই পাটালি ইত্যাদি কিনে, কৃষ্ণ সাগরের দিকে চলল। দীঘির বাঁধের নিচে গাঁয়ের একমাত্র শুঁড়িখানা।

হয়তো এদেশে ইংরেজেরা আসবার আগেও মদের দোকান ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে সরকারের আবগারি নিয়মের ফলেই মদ খাওয়া বেড়ে গেছে। ঋগ্‌বেদ পড়ে বোঝা যায় যে

তিন হাজার বছর আগে আর্যরা যখন ভারতে এসে বসবাস শুরু করে, তারা সম্ভাবতঃ মদ আর গো-মাংস খেত। তেমনি একথাও সত্যি যে শত শত বছর ধরে সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের লোকেরা পানাহারে সবচাইতে সংযমী আর মিতাচারী। এই বড় দুঃখের কথা যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খৃশ্চান জাতই এমন দেশে মাতলামি প্রবর্তন করেছে আর তাতে উৎসাহ দিয়েছে। এ-কথা বললে চলবে না যে আবগারি বিভাগ মদ বিক্রির ওপর কর বসিয়ে মদের দাম বাড়িয়েছে, কাজেই মদ খাওয়াও নিশ্চয় কমে গেছে। কিন্তু কাজের বেলায় অন্যরকম দেখা যাচ্ছে। আবগারির উদ্দেশ্য সরকারের আয় বাড়ানো; কিন্তু মদ বিক্রি না বাড়ালে আবগারির করের টাকাই বা বাড়ে কি করে? কাজেই আবগারি বিভাগের কর্মচারীদের উদ্দেশ্য ছিল যতটা সম্ভব এ-দেশে মদের দোকানের সংখ্যা বাড়ানো। ভারত মহাদেশ সমুদ্রের বুক থেকে মাথা তোলার সময় থেকে আরম্ভ করে এই ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনো সময়ে আজকের মতো এত বেশি মদের দোকান এখানে দেখা যায় নি; প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামে একটা করে মদের দোকান, বড় গ্রামে তার চাইতেও বেশি। তবে যে-সময়ের গল্প বলা হচ্ছে, তখনো এমন দুরবস্থা হয়নি।

এদিকে ভীমা তার দশবারোজন বন্ধু নিয়ে মদের দোকানে পৌঁছল। ছোট একটা খড়ের চাল দেওয়া মাটির ঘর। মাটিতে বসে পড়ে তারা কয়েক কলসী ধেনো ফরমায়েস করল। সেকালে পাড়াগাঁয়ে বিলিতী মদ আর কোথায় পাবে? শুধু দু-রকম মদ বিক্রি হত; একটা তৈরি হত গুড় থেকে, অন্যটা ধান থেকে। গুড়ের মদের দাম বেশি ছিল; আট আনায় এক বোতল; খুব গরীবরা তা কিনতে পারবে কেন? ধান পচিয়ে জল মিশিয়ে ধেনো তৈরি হত, এক পয়সায় মস্ত এক হাঁড়ি। তার বেশি একটা মানুষের খাওয়া সম্ভব নয়। ভীমাকে নিয়ে তেরো ইয়ার সারি সারি উবু হয়ে মাটিতে বসে

গিয়ে মাথা তুলে হাঁ করল, যেন বৃষ্টির জল খেতে যাবে। হাঁড়ি হাতে শুঁড়ি এসে একেক জনের গলায় গব্-গব্ করে যে যতখানি চায় মদ ঢেলে গেল। সবার মদ খাওয়া হলে, পোঁটলা খুলে তারা মুড়ি মুড়কি বাতাসা ফুটকলাই পাটালি হাম-হাম করে খেতে লাগল। মাটিতে ন্যাকড়া পেতে মুড়ি ঢালতেই ছোট একটা পাহাড়ের মতো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সব সাবাড়। ফুটকলাই খাবার সময় ওদের ফুর্তি দেখে কে! ঠাট্টা তামাসার শেষ নেই। কেউ কেউ নেশার ঘোরে মাটির মেঝেতে গড়িয়ে পড়ল। খাবারগুলো শেষ হলে, ওরা আবার খেনো ফরমায়েস করল। আগের মতোই শুঁড়ি আবার ওদের খোলা মুখে গব্-গব্ করে মদ ঢালল, যে যতখানি চায়। তারপর হুঁকো সাজিয়ে সবাই তামাক খেতে বসল।

শেষে কেউ আধা মাতাল, কেউ পুরো মাতাল; ফুর্তির চোটে কেউ টলছে কেউ নাচছে; হুঁকো হাতে নিয়ে গ্রামের পথ দিয়ে সব বাড়ি চলল। কাঞ্চনপুরের লোকেরা বলত মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় ভদ্রঘরের দু-একজন বামুনও শুঁড়িখানায় যেত। কথাটা হয়তো সত্যি, তবে শুঁড়িখানার খোদ্দেরদের বেশির ভাগই গ্রামের সব চাইতে নিচু জাতের লোক ছিল, গোবিন্দদের চাইতেও তারা ছোট।



নীলকর

১২

অনেক দিন আগে দুর্গানগরে মাধবের ছেলে যাদবের মুখে-ভাত হয়েছিল. তারপর আর তাদের কথা কিছু বলা হয়নি। অবিশ্যি সে-রকম কিছু ঘটেও নি সেখানে। এর মধ্যে বাপের শ্রাদ্ধে মালতী একবার কাঞ্চনপুরে এসেছিল, শূদ্রদের নিয়ম-মতো মারা যাবার একমাস পরে। বাপের শক্ত অসুখের সময় মালতী কাঞ্চনপুরে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু শাশুড়ী বাধা দিয়েছিল। তারপর বদনের মৃত্যুর খবর পেয়ে মালতী একবার ঘুরে গেছিল। কিন্তু বেশি দিন থাকা হয়নি, কয়েক দিনের মধ্যেই নিজের বাড়ি ফিরে গেছিল। পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া; পাল্কির বড় খরচ। যে-সমস্ত অঞ্চলের পথ-ঘাট এত খারাপ যে চাকাওয়ালা গাড়ি চলে না, সেখানে বড় লোকরা পাল্কিতে আসা-যাওয়া করত। দুর্গানগরে মালতী আর মাধবের মতো সুখী কেউ ছিল না; দুজনে দুজনকে কাছে পেয়েই খুসি। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে তো এ-জগতে কিছু নেই, কাজেই ওদের দুজনেরও দুটি যন্ত্রণার কারণ ছিল। মালতীর যন্ত্রণার কারণ তার বদ্‌-মেজাজি শাশুড়ী। শাশুড়ীর নাম সুধামুখী। উদয়াস্ত তার মুখ থেকে মধু ঝরছে। সে কি মধু! বকাবকি, গালিমন্দ, শাপমন্যি। মালতীর আর কাদম্বিনীর যন্ত্রণার শেষ ছিল না। মাঝে-মাঝে বকাবকি তবু সহ্য হয়, কিন্তু এই মধু বর্ষণের বিরাম

ছিল না। মালতীর মনে হত এ-রকম খিটখিটে মানুষের সঙ্গে থাকার চাইতে বাদাবনে গিয়ে বাস করাও ঢের ভালো। তাই হয় তো যেত-ও, কিম্বা আতুরীর মতো বোষ্টমী হত, যদি না তার অমন স্বামী, অমন সন্তান থাকত। তাদের টানেই ঐ বদ্‌মেজাজি শাশুড়ী ঘরে থাকা সত্ত্বেও, মালতীর হাত-পা বাঁধা থাকত।

মাধবের যন্ত্রণা অন্য ধরনের। নীলডাঙার নীলকর সায়েবের সঙ্গে ওর অ-বনিবনা।

নীলডাঙাকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না। থাকার মধ্যে একটা নীলের কারখানা আর কুলীদের কুঁড়েঘর। এই কুলীদের বেশির ভাগই ছোটনাগপুর আর সাঁওতাল পরগণার লোক। নীলকর সায়েবের চমৎকার বাড়ি। চারদিকে অনেকখানি জায়গা. ফটক থেকে বাড়ি অবধি পথের দুধারে সুন্দর ঝাউগাছের সারি।

নীল-গাছ আগে আমাদের দেশে হত না, ইংরেজরাই এনে লাগিয়েছিল। বাড়ির সুমুখে কারখানা, সেখানে নীল তৈরি হত। কারখানার চারধারে কিছুটা দূরত্ব রেখে অনেকগুলো দীনহীন কুঁড়েঘর, তাতে কুলীরা থাকত। সায়েব জাতে ইংরেজ; নাম জন্ মারে। উনি কারখানার মালিক ছিলেন না; উনি ম্যানেজার। মালিক হল ঈস্ট ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো কনসার্ন, এদিককার সব চাইতে ধনী নীল কোম্পানির একটি। ইংলণ্ডের নীলের বাজারে এরাই সবচাইতে বেশি জোগান দিত। বাঙালী গ্রামবাসীদের পক্ষে ইংরিজি নাম উচ্চারণ করা বড় শক্ত; তাই তারা সায়েবদের নামগুলোকে বাড়িয়ে বদলে বাঙালী ধরনের করে নিত। যেমন, ক্যাম্বেল হল কম্বল। লার্মুর হল লালমোহন। সিবণ্ড্ হল সুবোল। সাণ্ডাস হল সন্দেশ। ব্রাউন হল বরুণ। ম্যাস্কেলিন হল মুশ্‌কিল। বল্ডউইন হল বলদ। নীলকর সায়েব মিঃ মারে হলেন 'মারি' অর্থাৎ 'পেটাই' কিম্বা 'মহামারি'। চারদিকের গ্রামের লোকদের সঙ্গে মারে সায়েবের যে সম্বন্ধ ছিল, তাতে নামটার সার্থকতা প্রমাণ হয়েছিল। ওঁর

একটা চামড়ার চাবুক ছিল, তাই দিয়ে উনি অবাধ্য কুলিদের শাসন করতেন। সেটার নাম দিয়েছিলেন গদাধর। এই সমস্ত এবং আরো অন্যান্য কারণে লোকে তাঁকে মহামারীর মতো ভয় করত।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হলেও, নীলের ক্ষেতে ঘুরে ঘুরে, রোদে পুড়ে গায়ের রঙ হয়েছিল তাবার মতো। সকালে উঠেই, অর্থাৎ সাতটা নাগাদ্ উনি ছোটা হাজরি খেতেন: এক পেয়ালা চা, এক স্লাইস রুটি, একটা নরম ডিম সেদ্ধ। তারপর ডান হাতে নিত্যসঙ্গী গদাধরকে নিয়ে, ঘোড়ায় চেপে অনেক মাইল ঘুরে ক্ষেত পরিদর্শন করতেন। দশটার আগে বাড়ি ফিরতেন না। ফিরেই একটা সভা গোছের ব্যাপার করতেন। কুলীরা, চাষীরা এসে আবেদন জানাত, নালিশ জানাত। সাহেব শুনে রায় দিতেন। বেলা একটায় তিনি দুপুরের খাওয়া খেতেন; তার সঙ্গে প্রচুর মদও খেতেন। বিকেলে আবার ঘোড়ায় চড়ে বেরোতেন; তবে যত না কাজের জন্য, তার চাইতে বেশি বেড়াবার উদ্দেশ্যে। রাতে খেতেন আটটার সময়। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে মারে সাহেব অনিচ্ছুক চাষীদের নীলের চাষ করতে বাধ্য করতেন জোরজবরদস্তি করে অসহায় গরীব চাষীদের জমিজমা দখল করে, সেখানে নীলের চাষ করতেন। কত লোকের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিতেন, তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে কারখানায় আটক রাখতেন আর লেঠেল লাগিয়ে গাঁ-কে-গাঁ লুটপাট করাতেন।

কিন্তু তাঁকে দেখলে, কিম্বা তার সঙ্গে কথা বার্তা বললে এ-সব কথা বিশ্বাস করা কঠিন হত। ভালো বংশের ছেলে, বেশ কিছু লেখা পড়াও করেছিলেন। তাঁর ব্যবহার, বিশেষতঃ ইউরোপীয়দের প্রতি ভারি অমায়িক ও ভদ্র ছিল। তাঁর বাড়িতে যে আসত সে-ই খেয়ে যেত আর ইউরোপীয়দের প্রতি তাঁর আতিথেয়তা তো প্রায় প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পাশের গ্রামে এ-দেশী ছেলেদের ইংরিজি শিক্ষা দেবার জন্য একটা স্কুল ছিল, সেখানে মারে মাসে মাসে দশ

টাকা চাঁদা দিতেন। মস্ত সিন্দুক ভরা ওষুধ ছিল তাঁর; গাঁয়ের লোকের অসুখ বিসুখ করলে তিনি বিনি পয়সায় কুইনিন আর অন্যান্য ওষুধ বিলি করতেন। বাইবেল সোসাইটি আর খৃষ্ট-ধর্ম প্রচারের জন্য যে সব মিশনারি সমিতি ছিল, তাঁদের চাঁদার খাতাতেও তাঁর নাম শোভা পেত। তাঁর চরিত্রের এ দিকটার সঙ্গে চাষীদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতা, নিপীড়ন, আর লুট-তরাজের দিকটা কি করে যে খাপ খেত তা জানি না। কিন্তু দু-দিকই যে সত্যি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন মাধবের বাপ কেসব দুর্বুদ্ধির বশে তার ক্ষেতে নীলের চাষ করবে বলে মিঃ মারের কাছ থেকে দাদন নিয়েছিল। সেই ইস্তক মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি বছর সে কারখানায় অনেক গাড়ি বোঝাই নীল জোগান দিত। এই ব্যবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে অনেকবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। একবার যে নীলকরের হাত থেকে দাদন নিয়েছে, সে চিরকালের মতো তার কেনা গোলাম হয়ে যেত। কেসব কারখানায় যত নীলই জোগান দিক না কেন, যে-কোনো উপায়ে প্রমাণ হয়ে যেত যে কম দিয়েছে। সেই বাকিটা শোধ করবার জন্য তাকে পরের বছরেও নীলের চাষ করতে হত। এই ভাবে বছরের পর বছর চলত; বাকিটুকু আর শোধ হত না। এ ঋণ পুরুষে পুরুষে বর্তাত। যত রাশি রাশি নীল জোগান দিক না চাষী, তার বাকিটুকু কিছুতেই মিটে যেত না। সারা জীবন কেসব এই গোলামি করেছিল, তার মৃত্যুর পর মাধব দেখল সে-ও সায়েবের কাছে হাত-পা বাঁধা হয়ে আছে। নীলের নাম শুনলেও তার গা জ্বলে যেত, তবু তাকে নীলের-ই চাষ করতে হবে, কারণ তার নামের পাশে যে ধার লেখা রয়েছে, সে-ধার কোনো জন্মেও শোধ হবার নয়। ঘাড় থেকে এই ভূতটাকে নামাবার জন্য মাধব টাকা দিয়ে ধার শোধ করতে রাজি ছিল। সায়েব টাকা নিতে রাজি হলেন না। এ তো আর সাধারণ ধার নয় যে টাকা দিলেই শোধ হয়ে যাবে, এ হল গিয়ে অগ্রীম টাকা—মাধবের বাপের সঙ্গে এই ব্যবস্থাই হয়েছিল—এ ধার

শোধ করতে হবে এত গোছা নীল-গাছ দিয়ে! এখন মুশ্‌কিল হল যে মাধবের নিজের ক্ষেতের নীল-গাছের গোছাগুলো যেই না কারখানায় পৌঁছত, অমনি তাদের পরিমান আর গুণ রহস্যময় ভাবে কমে যেত, কাজেই ধারটাও কমে না গিয়ে, ক্রমে বেড়েই চলেছিল এবং শেষটা ওর মতো গরীব চাষীর পক্ষে বড় বেশি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। সব বাঙালী চাষীই কিছু সাধু ছিল না আর সব নীলকর সায়েবই কিছু পাপিষ্ঠ ছিল না। কোনো কোনো নীলকরের স্বভাব হয়তো সদয়-ই ছিল; কিন্তু যে নিয়মে সেকালে নীলের ব্যবসা চলত, তাতে ভালো মানুষ-ও ক্রমে বুনো বাঘে পরিণত হয়ে যেত; নইলে তার নিজের-ই সর্বনাশ হত। আরো কথা আছে। বাংলার কোনো কোনো নীলকরকে প্রজারা মা-বাপের মতো ভক্তি করত, তাদের বিষ নজরে দেখা দূরে থাক। কিন্তু যে দয়ালু নীলকরদের কথা হচ্ছে সে নীলকররা কেউ খাঁটি ইংরেজও ছিলেন না, এ-দেশী লোক-ও ছিলেন না। এঁরা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধনী কর্মী, নিবাস পূর্ণিয়াতে। ইংরেজদের একমাত্র চেষ্টা ছিল কত তাড়াতাড়ি কতখানি টাকা জমিয়ে জাহাজে চেপে স্বদেশে ফেরা যায়। এখন যাঁদের কথা হচ্ছে, তাঁরা এদেশেই জন্মেছিলেন, এখানেই মানুষ, এখানেই মরবেন বলে আশা করতেন। প্রজাদের সঙ্গে তাঁরা খুব ভালো ব্যবহার করতেন; প্রজারা ও তাঁদের ভক্তি করত। দুঃখের বিষয়, ভালো জমিদারদের মতো এঁদের সংখ্যাও ক্রমে কমে আসছে। প্রজাদের মধ্যেও ফাঁকিবাজ লোক ছিল; দাদন নিয়ে জোগান দিত না; দুই মালিকের কাছ থেকে একই ফসলের জন্য দাদন নিত। কিন্তু এ সব মেনে নিয়েও এ-কথা সত্যি যে ক্ষমতাশালী নীলকররা অসহায় প্রজাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করত।

সেকালে নীল চাষের দুটি নিয়ম ছিল, নিজাবাদ আর রায়তি। নিজাবাদ মানে নীলকর নিজের জমিতে, কিম্বা জমিদারের কাছ থেকে

ইজারা নেওয়া জমিতে নীলের চাষ করত। রায়তি নিয়মে নীলকর রায়ত কে দাদন দিত; রায়ত তার নিজের জমিতে নীলের চাষ করে, নির্দিষ্ট দামে সেই নীলগাছ কারখানায় বিক্রি করত। নিজাবাদে বেশি নিপীড়নের সুযোগ ছিল না, কারণ নীলকরকে নিজের খরচে নিজের জমিতে নিজের লোক দিয়ে নীলের চাষ করতে হত। নিপীড়ন যদি কিছু হত সে চাষীদের ওপর হত না, হত নীলকরের নিজের কুলী আর লোকজনের ওপর। কিন্তু রায়তি নিয়ম ছিল অশেষ অন্যায় অত্যাচারের জন্মদাতা। চাষী নীলকরের কাছ থেকে দাদন নিয়ে একটা চুক্তি সই করে দিত যে এই দামে বছরে এতখানি নীলগাছ জোগাবে। অসৎ চাষী-ও নিশ্চয় কিছু ছিল, যারা দাদন নিয়ে তারপর নিজেদের কথা রাখত না, কিন্তু সে হত কালে-ভদ্রে। তার কারণ চাষীদের কতটুকুই বা ক্ষমতা. এদিকে নীলকর জোর জবরদস্তি করে তার ন্যায্য দাবি আদায় করতে পারত। ক্ষতি হত চাষীদের-ই সব চাইতে বেশি। অনেক সময়ই তারা চুক্তি সই করতে চাইত না; তাদের জোর করে করানো হত। বিদেশীদের কাছে এ ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে না-ও মনে হতে পারে; কিন্তু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে বাংলার চাষীরা বড় দুর্বল আর ভীতু; ক্ষমতাশালী মালিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার তাদের শক্তিই ছিল না। ওরা দাদন নিতে চাইত না, কারণ নীলের চাষ করে ওদের কোনো লাভ হত না

নীলগাছ মাটি থেকে যতখানি পুষ্টি শুষে নেয়, তেমন আর কোনো ফসল নেয় না। যে হারে চাষীদের নীলের দাম দেওয়া হত সে শুনতে যতই ন্যায্য শোনাক, আসলে তার ফলে চাষী ধনে-প্রাণে মরে। নীল গাছ আঁটি বেঁধে কারখানায় নিয়ে যেতে হত; সেখানে ওজনদার গাছ মাপত। সে এক ব্যাপার। নীলগাছের গোছাব বেড় মাপা হত ছয় ফুট লম্বা একটা শিকল দিয়ে। লম্বাতে ও গাছের ছয় ফুট হওয়া চাই। তবেই হল এক আঁটি। মুশ্‌কিল হল গাছ লম্বায় ছয় ফুট প্রায়-ই হয় না। তখন দুটো গোছা মুখোমুখি রেখে গায়ের জোরে চাপ দিয়ে

ঘটোর মিলিত মাপ ছয় ফুট দেখানো হত। এই কাজের জন্য বেশ মশা দেখে ওজনদার রাখা হত। রায়ত দেখত তার ক্ষেতের মাপা য় গোছা নীলগাছ কারখানায় এসে হয়ে গেল মাত্র দুই বাণ্ডিল। রাজেই চুক্তি অনুসারে যতখানি নীলগাছ জোগান দেবার কথা, রায়তকে কোনো দিন-ই তা জুগিয়ে উঠতে দেওয়া হত না। বছরে বছরে খাতায় তার ঋণের অঙ্ক বেড়েই চলত।

চৈত্রমাসে একদিন মাধব ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে; এদিকে ঘোড়ায় চড়ে মারে সাহেব সকাল বেলায় বেড়াতে বেরিয়ে, ক্ষেতের কাছে এক গাছতলায় দাঁড়ালেন। অমনি সঙ্গীর হাতে লাঙ্গল দিয়ে মাধব সাহেবের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে নমস্কার করল। সায়েব বলল, "কি হে মাধব, তোমার জমি দেখছি বীজের জন্য তৈরি। নীলের বীজ লাগাবে তো?

মাধব বলল, "হুজুর নীল লাগালে আমার ছেলে-বৌ খাবে কি? এ জমি ধানের জন্য তৈরি করেছি, এখানে নীল লাগালে আমরা খেতে পাব না।"

"তুমি কি বলতে চাইছ নীল লাগাবে না? কাল এসে দাদন নিয়ে যেও। তাছাড়া, তুমি আমার কাছে টাকা ধারো। যতদিন না সে ধার শোধ হচ্ছে, তোমাকে নীলের চাষ করতেই হবে।"

"খোদাবন্দ, আমি টাকা দিয়ে ধার শোধ করব। আর কি করতে পারি? মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আপনার ধার শোধ করব।"

"টাকা দিয়ে কারখানার ধার শোধ করবে? এমন কথা কে কবে শুনেছে বল? নবকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জে বুঝি এই বুদ্ধি দিয়েছে?"

"না, হুজুর, কেউ বুদ্ধি দেয়নি। নীলের চাষ করলে আমার কেবলি ক্ষতি হয়; কোনো লাভ হয় না; ধানের গোলা খালি থাকে।"

"নীল চাষে তোমার ক্ষতি হয়? এ বুদ্ধিই বা কে দিল? তোমার

বাবা কি বছর নীল-চাষ করত ; কই, তার তো ক্ষতি হত না : বাপের চাইতে বেশি চালাক হয়েছ বুঝি ? আমি দেখছি এ গ্রামের অনেক চাষীই দাদন নিতে চাইছে না। এর নিশ্চয় একটা মানে আছে। ঐ বদমায়েস জমিদারটাই বোধ হয় নষ্টের গোড়া : তোমাদের আর ঐ জমিদারকে একটু শিক্ষা দিতে হবে দেখছি। কাল এসে দাদন নিয়ে যেও, নইলে টেরটা পাবে।"

"খোদাবন্দ ! এ বছরটা মাপ করুন। হুজুরের হুকুম এবার মানতে পারলাম না।"

"তুমি তো বড় আহাম্মুক, মাধব। চোখ খুলে সর্বনাশের সাগরে ঝাপ দিচ্ছ। এই বলে রাখলাম, আমি রাগলে, কোনো শালার সাধ্য নেই তোমাকে রক্ষা করে, তা সে জমিদার-ই হক আর যাই হক।"

"আমি তো জানি হুজুর, দেবতাদের মতো আপনিও সব করতে পারেন। আপনাকে রাগিয়ে আমি বাঁচব কি করে ? আমার তো কোনো দোষ নেই, আমার ওপর দয়া করুন।"

"তোমার দোষ নেই ? আমার বিশ্বাস এই গ্রামে যারা বিক্ষোভ করছে, তুমিই তাদের দলের পাণ্ডা। তুমিই তাদের দাদন নিতে বারণ করছ আর ঐ জমিদার ব্যাটা তোমার পক্ষ নিচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাবে কে তোমার পক্ষ নেয়।"

"খোদাবন্দ, আমি কাউকে দাদন নিতে বারণ করিনি। আমার মতো একটা নগণ্য লোকের কথা শুনছেই বা কে ? হুজুর আমার রক্ষা-কর্তা। আমার এই বিনীত প্রার্থনা রাখুন।"

"না, তা হয় না। তুমি ভারি জোচ্চোর। কারখানার কাছে টাকা ধারো, অথচ নীল বুনতে চাইছ না। আমিও দেখব কেমন নীল না বোন !"

"খোদাবন্দ, দয়া করে মনে রাখবেন ধারটা আমার বাবার। আমি তো টাকা দিয়ে সবটাই মিটিয়ে দিতে চাইছি।"

"বাঃ, ভারি দয়া দেখছি ! তোমার কি এত বড় আস্পর্ধা যে

ঋণের খাতায় তোমর নাম রয়েছে, অথচ তুমি নীলের চাষ করবে না ? আরেকবার কথা বললে, পিঠে কি পড়ে দেখবে। শোন, কাল এসে দাদন নিয়ে যেও। না নিলে, তোমার সর্বনাশ তো হবেই, এ গাঁয়ে যত শালা নীলের চাষ করতে রাজি হবে না, সব কটার সর্বনাশ হবে। মনে রেখো কি বললাম। জানই তো মারে সাহেবের যেমন কথা, তেমনি কাজ।"

"হুজুর"—মাধব কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মারে সায়েব ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে বললেন, "আর কথা নয়। বেশি বেয়াদবি আমি বরদাস্ত করব না।" এই বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।

মাধবের সঙ্গে মারে সাহেবের কথা থেকেই বোঝা গেছিল যে দুর্গানগরের অনেক চাষীই নীল চাষের দাদন নিতে অস্বীকার করে ছিল। দাদন নিতে অস্বীকার করা এই নতুন; সে সময় কেউ সাহস পেত না। মারে সায়েব ঠিকই ধরেছিলেন জমিদার ওদের পক্ষ নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। দুর্গানগর গ্রামটি ছিল বাড়ুযোদের সম্পত্তি। এঁরা খুব ধনী ছিলেন; এঁদের বাড়ি ছিল কয়েক ক্রোশ দূরে, ভাগীরথীর ধারে দক্ষিণপল্লীতে। বুড়ো জমিদার মায়ের সঙ্গে বনিয়ে চলতেন। ঐ সময় তিনি গত হয়েছিলেন, জমিদারির ভার পড়েছিল তাঁর ছেলে নবকৃষ্ণর ওপর। নবকৃষ্ণ বাপের মত ছিলেন না। বুড়ো জমিদার সেকেলে মানুষ ছিলেন, ইংরিজি লেখা পড়া জানতেন না, চরিত্র ও খুব ভালো ছিল না। প্রজাদের মঙ্গল নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না; নীলকর সাহেবের অত্যাচারে কোনো বাধা দিতেন না। তাঁর মত ছিল যে মারে সায়েব খুব ক্ষমতাশালী; তাঁর অধীনে বহু লোক; জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট, কলেকটর, সবাই তাঁকে খাতির করেন, তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন, কাজেই তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ নেই।

নবকৃষ্ণ কিন্তু ইংরিজি লেখা পড়া জানতেন; কয়েক বছর কলকাতার হিন্দু কালিজে পড়েছিলেন; তাঁর উদার মতামত;

তাছাড়া মানুষটি ছিলেন দেশ-প্রেমিক। ছোটবেলা থেকেই তিনি ঐ মারে সাহেবটির অত্যাচারের কথা শুনেছিলেন, নিজের চোখে দেখেও ছিলেন। মারে এবং তাঁর আগে নীল ভাঙ্গায় যে ম্যানেজার ছিলেন, দুজনেই নবকৃষ্ণের বাপের প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতেন। নবকৃষ্ণের বড় দুঃখ যে বাপ কোনো প্রতিবাদ করতেন না। কলেজে নবকৃষ্ণ গ্রীস, রোম, ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়েছিলেন তার ফলে তাঁর চিন্তা করবার ধরণটাই অন্য রকম হয়ে গেছিল আর যতই তাঁর বয়স বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে গরীব চাষীদের ওপর যারা অত্যাচার করে, তাদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ-ও বাড়তে লাগল। সে কালে অনেক জায়গায় বিতর্ক সভা হত; সেখানে নবকৃষ্ণ নীলকরদের উৎপীড়নের নিন্দা করতেন; নিপীড়িত গরীব চাষীদের প্রতি ন্যায় বিচার দাবি করে মাঝে মাঝে বেনামায় কলকাতার খবরের কাগজে চিঠিও দিতেন।

কলেজ ছাড়বার পরে তিনি কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হয়েছিলেন। বেশির ভাগ সময় তিনি কলকাতায় থাকতেন; প্রায়ই এখানে ওখানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। এই সব বক্তৃতায় তিনি জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ করবার জন্য নানান প্রস্তাব পেশ করতেন। গরীবদের দুর্দশা দেখে তাঁর ভারি দুঃখ হত; তাছাড়া নিজে জমিদার হয়ে অত্যাচারী জমিদারদের তিনি কুলের কলঙ্ক মনে করতেন। নবকৃষ্ণ ছিলেন সেই মুষ্টিমেয় জমিদারদের একজন, যাঁরা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি জনগণের মঙ্গল চিন্তা করতেন; নিজে উদারপন্থী দেশপ্রেমিক ছিলেন; নিপীড়িত প্রজাদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ছিল এবং সব চিন্তার ও কাছে তিনি ধর্মের পথ অনুসরণ করতেন। সেকালে এ ধরণের জমিদার কম দেখা যেত। সুখের বিষয় ইংরিজি শিক্ষা লাভের ফলে দিনে দিনে এঁরা সংখ্যায় বাড়ছেন।

গদীতে বসেই নবকৃষ্ণ তাঁর জমিদারিতে ঘোষণা করে দিলেন

যে এখন থেকে তাঁর পক্ষ থেকে প্রজাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার চলবে না। 'জোর যার মুলুক তার'—এই নিয়ম বন্ধ করা হবে। বাইরের লোকের উৎপীড়নের হাত থেকে তিনি তাঁর প্রজাদের যথাসাধ্য রক্ষা করবেন। বে-আইনী দাবি, যেমন আবোয়াব, মাথট সেলামী ইত্যাদি বন্ধ হবে। তাঁর অর্থে ও সামর্থে যতখানি কুলোয়, তিনি তাঁর প্রজাদের মঙ্গল-বিধানের ব্যবস্থা করবেন।

রামের অভিষেকের সময় অযোধ্যার লোকরা যেমন আনন্দ-উল্লাস করেছিল, নবকৃষ্ণ দক্ষিণ পল্লীর জমিদার হলে পর, ঐ অঞ্চলের প্রজারাও সেই রকম উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। এক কথায় তারা আহ্লাদে আটখানা। ঘোষণার কথা শুনে বুড়োরা আনন্দের চোটে কেঁদে বুক ভাসাল। তারা বলল নবকৃষ্ণের সঙ্গে দশরথের ছেলে রামের কোনো তফাৎ নেই; ছেলেপিলে নাতি নাতনি অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাবে এ কথা জেনে এবার তারা শান্তিতে মরতে পারবে। একশো গাঁয়ের বুড়িরা আকাশের দিকে হাত তুলে তাদের তরুণ রাজাকে আশীর্বাদ করল।

নবকৃষ্ণও শুধু ঘোষণা করেই সন্তুষ্ট রইলেন না। তাঁর সব চাকর আর কর্মচারীদের,—ঘুষ খেয়ে মেদ-বহুল দেওয়ান থেকে পেয়াদা পর্যন্ত-সবাইকে ডেকে বলে দিলেন প্রজাদের সঙ্গে সর্বদা উচিত ব্যবহার করবে, ঐ সব সেলামী, আবোয়াব, পার্বনী কেউ নিতে পারে না। কোনো আমলা যদি অবাধ্যতা করে তাহলে পত্রপাঠ তার চাকরি যাবে। দেওয়ান ছিলেন পাপিষ্ঠের এক শেষ; সময়কালে তিনি নিজেও প্রজাদের ওপর কম অত্যাচার করেননি, এখন তিনি নবকৃষ্ণকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে এর ফল ভালো হবে না। জমিদারি ভালোভাবে চালাতে হলে খানিকটা মিথ্যাচার, চালাকি, ধাপ্পাবাজি, জালিয়াতি করতেই হয়। তা না হলে জমিদারি থেকে কোনো আয় হবে না। যদি ছেলে

মানুষ কর্তা বাহাদুর এইভাবে চলেন, অল্প দিনের মধ্যেই জমিদারি লাটে উঠবে। নবকৃষ্ণ সে কথায় কান দিলেন না; বরং আকারে ইঙ্গিতে দেওয়ানকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি যদি এই নতুন নিয়মে জমিদারি চালাতে না পারেন, তাহলে নতুন লোক দেখতে হয়। সেই মুহূর্ত থেকে দেওয়ান-বাহাদুর শুধু যে কোনো রকম আপত্তি করা ছেড়ে দিলেন তাই নয়, উলটে উচ্চকণ্ঠে নতুন নিয়মের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। দেওয়ানের দেখাদেখি আমলারাও সেই সুর ধরল। মনে হতে লাগল এঁরা সকলেই অবিচার অত্যাচারের চেয়ে সুবিচার আর ন্যায়-বিধানেরই অনেক বেশি পক্ষপাতী।

এখানেই শেষ নয়। লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিষ্ঠিত বাংলা বিদ্যালয়ের অনুকরণে নবকৃষ্ণ তাঁর জমিদারিতে অনেকগুলি বাংলা স্কুলের পত্তন করেছিলেন আর দক্ষিণ পল্লীতে একটি ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুল করে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের একজন হিন্দু কালিজের সহপাঠিকে তার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। প্রজাদের মধ্যে বিনা-পয়সায় ওষুধ বিতরণ করবার জন্য একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; তার তত্ত্বাবধানে ছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা একজন ডাক্তার। তাঁকে ১০০ টাকা বেতন দেওয়া হত। তিনি শুধু চিকিৎসালয় থেকে ওষুধ বিতরণই করতেন না; এখানে যত রুগী আসত, তাদের সকলের চিকিৎসাও করতেন।

মারে সাহেবের সঙ্গে নবকৃষ্ণের যৌবন থেকেই আলাপ ছিল। তাঁকে তিনি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন যে প্রজারা বড়ই গরীব আর অসহায়; তাদের সঙ্গে যেন ন্যায্য আর সদয় ব্যবহার করা হয়; তাতে সুবিচার তো হবেই, আখেরেও কাজে দেবে। অন্ততঃ নবকৃষ্ণের নিজের অনিচ্ছুক প্রজাদের দাদন নিতে আর তাদের ক্ষেতে নীলের চাষ করতে যেন বাধ্য করা না হয়। এই কারণেই মাধবকে সায়েব বলেছিলেন যে জমিদার নিশ্চয় তাকে আস্কারা

দিচ্ছে। এই রকম মানুষ ছিলেন দক্ষিণ পল্লীর জমিদার। সুখের বিষয় এই ধরণের মানুষ ক্রমে আরো বেশি দেখা যাচ্ছে।

পৌষ মাসে ফসল কাটার পর দুর্গানগর থেকে চল্লিশজন চাষী নবকৃষ্ণের কাছে দরবার করেছিল। তাদের মধ্যে মাধব-ও ছিল। এরা সকলেই তাঁর প্রজা। এরা তাঁর কাছে নিবেদন করেছিল যে নীলের চাষ করলে তাদের বড় লোকসান হয় আর নীলকরের কাছ থেকে তাদের অকথ্য অবিচার অত্যাচার সহ্য করতে হয়। তাঁর প্রজা হিসাবে ওরা তাঁর আশ্রয় প্রার্থী হয়ে এসেছিল।

এই চল্লিশজনের মধ্যে কেউ কেউ অনেক বছর ধরে নীলের চাষ করে এসেছিল ; কয়েকজনকে জোরজার করে গত বছর থেকে নীলের চাষ করানো হচ্ছিল আর বাকি কজনকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল যে এ-বছর থেকে তাদের নীলের চাষ করতে হবে, নইলে তাদের ওপর অত্যাচার করা হবে। জমিদারবাবুর কাছে এর মধ্যে কোনো নতুন খবর ছিল না। নীলকরদের হালচাল তাঁর ভালো করেই জানা ছিল। তিনি আগ্রহের সঙ্গে চাষীদের পক্ষ অবলম্বন করলেন, বিশেষ করে তারা সকলেই যখন তাঁর নিজের প্রজা। নবকৃষ্ণ চাষীদের বলে দিলেন যে যদি তাদের মনে হয় নীলের চাষ করলে তাদের লোকসান হবে, তারা যেন দাদন না নেয়। যে-সব চাষীরা নীলকরের কাছে টাকা ধারত, তাদের ধার শোধ করবার জন্য তিনি কিছু টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন এ-কথাও বললেন। এই ব্যাপারের পরেই মাধবের সঙ্গে মারে সায়েবের ঐ রকম কথাবার্তা হয়েছিল।

দুর্গানগরের চাষীদের সায়েব নানা রকম ভয় দেখিয়েছেন শুনে অবধি নবকৃষ্ণের মনে হয়েছিল উৎপীড়নের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার জন্য কিছু লোক মোতায়েন রাখা ভালো। সেই সঙ্গে তাঁর মনে হল যে সাগরপুরের দারোগাকে জানিয়ে রাখা উচিত যে নীল ডাঙার নীলকর সাহেব দুর্গানগরের চাষীদের নানা ভাবে শাসাচ্ছে এবং তাদের ওপর হামলা করার খুব সম্ভাবনা আছে। দুর্গানগর গ্রাম

সাগরপুরের দারোগার এলাকার মধ্যে পড়ত, এই গরীব চাষীদের উৎপীড়ন বন্ধ করা দারোগার কর্তব্য। থানায় এই চিঠিটি পাঠিয়ে নবকৃষ্ণ আরো কিছু ব্যবস্থা করে, তাঁর লোকজনদের সজাগ থাকতে বলে দিলেন।

দুর্গানগরের উদ্ধত চাষীদের কি করে জব্দ করা যায়, এই বিষয় নিয়ে মারে সাহেব নানা রকম ফন্দী আঁটতে লাগলেন। চাষীদের একমাত্র অপরাধ হল তারা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর চাষের কাজ করতে নারাজ। এই সুযোগে নীল সম্বন্ধে কিছু শোনা যাক। সমস্ত ইউরোপে এই যে জিনিসটির এত চাহিদা, এটিকে উৎপন্ন করতে চাষীদের প্রাণান্ত পারিচ্ছেদ।

মহাসাগর থেকে ভারত ভূখণ্ড মাথা তুলে ওঠা অবধি হয়তো এখানে নীল-গাছ গজাত। কিন্তু ইংরেজরা এ-দেশে এসে নীলের চাষে আর নীল-রঙ তৈরিতে নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়োগ করার আগে, এই গাছ কারো কোনো কাজে আসেনি। নীলের চাষের দুটি নিয়ম আছে। প্রথমটি হল জমিতে লাঙ্গল দিয়ে, বীজ বুনে মামুলী নিয়ম। দ্বিতীয় নিয়মের নাম 'ছিটানি'। এখানে মনে রাখা দরকার যে অতি বৃষ্টির ফলে বাংলার অজস্র নদীতে প্রতি বছর বন্যা হয়ে, দুই তীরের অনেকখানি ভেসে যায়।

বর্ষার পর জল নেমে গেলে দেখা যায় নদীর তীরে পলিমাটির একটা স্তর পড়ে আছে। বাংলার চাষীরা এর সুবিধা নেয়। এই চড়াগুলো ঠিক যেন তৈরি করা ক্ষেত; এতে বীজ ছড়িয়ে দিলেই হল। লাঙ্গল দেবার, মই দেবার দরকার হয় না; তবে মাটি নরম থাকতে কাজ করতে হয়। একেই বলে ছিটানি। চড়ার বীজ বুনতে হয় বর্ষার জল নামার পরেই, অর্থাৎ আশ্বিন মাসে। অন্য জমিতে ধান কাটার অনেক দিন পরে নীলের বীজ বোনা হয়, সেই ফাল্গুন চোতে। তার জন্য জমিতে লাঙ্গল দিতে হয়, মই দিতে হয়, তারপর ফিরিঙ্গি সায়েবরা যাকে 'ছোটা বর্ষাত' বলে সেই ঝড় জলে মাটি ভিজলে,

তবে বীজ বুনতে হয়। মজা হল যে যদিও এই দুই বীজ-বোনার মধ্যে পাঁচ মাসের ব্যবধান, তবু ফসল কাটা হয় প্রায় এক-ই সময়; বড় জোর চার-পাঁচ সপ্তাহের আগে পরে। আষাঢ় শ্রাবণের ভারি জলের আগেই নীল কেটে নিতে হয়।

নীল চাষে জমি নিষ্ফলা হয়, চাষীর লোকশান হয়, কিন্তু এর পিছনে বিশেষ খাটতে হয় না। মানুষের হাত লাগাবার প্রায় দরকার-ই হয় না, প্রকৃতিদেবী নিজেই সব কাজ করে নেন। বীজ লাগাবার দু-দিন পরেই শেকড় বেরোয়; এক হপ্তার মধ্যে খুদে খুদে গাছে মাঠ সবুজ হয়ে থাকে। বর্ষার আগেই গাছ হয় পাঁচ ফুট উঁচু; এবার গাছ তৈরি। তারপর গাছ কাটা হয়। নিজাবাদ চাষে নীলকর তার ক্ষেতের নীল কেটে, ঠেলা-গাড়ি কিম্বা নৌকো করে কারখানায় নিয়ে আসে। 'রায়তি' চাষে চাষীরা দাদন নিয়ে, নিজেদের ক্ষেতে চাষ করা নীল গাছ কেটে, নিজেদের খরচায় কারখানায় পৌঁছে দেয়। তারপর যে কি অন্যায় ভাবে নীল মাপা হয় সে-কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

তারপর নীল-গাছগুলোকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হয়। এ রকম দুই সারি চৌবাচ্চা থাকে। এক সারি একটু উঁচুতে, এক সারি একটু নিচে। দুই সারির চৌবাচ্চার মধ্যে নালি থাকে দরকার মতো নালিগুলোর মুখ বন্ধ করা যায়। এই চৌবাচ্চাগুলো সাধারণতঃ একুশ ফুট লম্বা, একুশ ফুট চৌড়া আর সাড়ে তিন ফুট মতো গভীর হয়। নীলডাঙায় মিঃ মারের কারাখানাটি বেশ বড় ছিল; সেখানে বারো জোড়া চৌবাচ্চা ছিল। উঁচু সারির চৌবাচ্চায় নীল গাছ ফেলা হয়। কাটার পরেই ফেলতে হয়, নইলে পচে যায়। তারপর অনেকগুলো বাঁশ চাপিয়ে নীল গাছ থেঁতুলো করা হয়। বাঁশের ওপর শাল গাছের গুঁড়ি খাড়া করে বসিয়ে, চাপ দিয়ে গাছগুলোকে সমান করে নেওয়া হয়।

তারপর নালা কেটে চীনে পাম্পের সাহায্যে, নদী থেকে জল

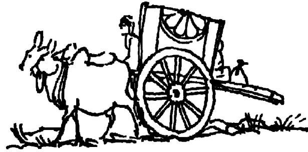
এনে গাছগুলোকে ভিজিয়ে রাখতে হয়। বারো ঘণ্টা এই ভাবে থাকার পর, নলের মুখ খুলে দেওয়া হয়। অমনি ওপরের চৌবাচ্চা থেকে নীল গোলা জলটা গিয়ে নিচের খালি চৌবাচ্চায় জমা হয়। গাছের ছিবড়াটাকে বলা হয় 'সিথি'। সেটাকে ফেলে না দিয়ে, মাটিতে বিছিয়ে শুকিয়ে রাখা হয়। খটখটে হয়ে শুকোতে প্রায় দু-তিন মাস লাগে। তারপর সেটিকে কারখানার 'বয়লারের জ্বালানী' কিম্বা জমির সার রূপে ব্যবহার করা হয়।

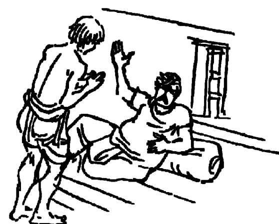
এদিকে নীলের গোলা নিচের চৌবাচ্চার মধ্যে জমা হয়েছে। এবার সেটাকে আচ্ছা করে ফেটানো হয়। পাঁচ ফুট লম্বা বাঁশের ডাণ্ডার এক মাথা নৌকোর দাঁড়ের মতো একটু চাপ্টা করে নিয়ে, তাই দিয়ে একদল লোক চৌবাচ্চায় নেমে, এদিকে ওদিকে নানা ভাবে দাঁড়িয়ে, নিজেদের শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে, গোলাটাকে পেটাতে থাকে। এই পেটানোর উদ্দেশ্য হল জল থেকে রঙের দানা আলাদা করা। কাজ করতে করতে নীল রঙের ভূত সেজে লোকগুলো সমস্বরে গান গায়।

ঘণ্টা দুই গোলাটা পেটাবার পর দেখা যায় জল থেকে রঙ আলাদা হয়ে, তলানির মতো নিচে পড়ে যাচ্ছে।

তারপর ঘণ্টা দুই গোলাটাকে থিতিয়ে বসতে দেওয়া হয়। সমস্ত রঙের দানা তলায় পড়ে যায়। জলটাকে একসারি কলের মধ্যে দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। নালা বেয়ে সেটা আবার গিয়ে নদীতে পড়ে। থকথকে রঙটাকে এবার আরেকটা নালা দিয়ে বয়লারে ভরা হয়। গত বছরের গাছের ছিবড়ের সাহায্যে মস্ত উনুনে আঁচ দিয়ে রঙটাকে ফোটানো হয়। তারপর বিরাট একটা মার্কিনের চাদর দিয়ে রঙ ছাঁকা হয়। নানান্ ভাবে চাপ দিয়ে সমস্ত জলীয় পদার্থ বের করে নিলে, রঙটা জমাট হয়ে বড় বড় চাপ বেঁধে থাকে। শেষে সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নেওয়া হয়। তারপর প্রত্যেকটি টুকরোর ওপর কারখানার নাম ছেপে, একটা ঘরে নিয়ে

গিয়ে বাঁশের তাকের ওপর শুকোতে দেওয়া হয়। ভালো করে শুকোতে তিন মাস লাগে। ছোট টুকরোগুলোর একেকটার ওজন হয় আট আউন্স, অর্থাৎ এক পোয়া মতো। সেগুলোকে বাক্সে পাক্ করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে জাহাজে করে লণ্ডনের ক্যানন স্ট্রীটের ইণ্ডিগো মার্ট, অর্থাৎ নীলের বাজারে চালান দেওয়া হয়। দক্ষিণ বাংলায় আর বিহারে এই ভাবে নীল তৈরী করা হয়।





ঝঞ্ঝাট

১৩

পরদিন মায়ে সাহেব দুর্গানগরের চাষীদের নোটিস্ দিলেন যে হয় তারা দাদন নিয়ে যাক, নয়তো তাদের বিপদে পড়তে হবে। সেদিন দুপুরে মাধবের হাতে বেশি কাজ ছিল না, তাই কাঁধে গামছা ফেলে, সুগন্ধী ধোঁয়া ভুর ভুর হুঁকো হাতে সে, গাঁয়ের মধ্যিখানে বকুল তলায় উপস্থিত হল। গিয়ে দেখে বাঁধানো মঞ্চটার ওপর চারজন চাষী বসে আছে; মাধব তাদের সঙ্গে বসল; আরো অনেকে এল; দেখতে দেখতে গাছতায় জনা কুড়ি চাষী জড়ো হল। সবার পরনে হাঁটু অবধি ধুতি, খালি গা; কারো কাঁধে গামছা, কারো তাও নেই; কিন্তু অর্ধেকের বেশির হাতে হুঁকো। নানান্ বিষয়ে গাল-গল্প, মধ্যে মধ্যে হুঁকো খাওয়া, কাশী, থুতু ফেলা। তবে সব কিছুর মূল বিষয়-বস্তু হল সাহেবের শাসানি।

এক চাষীর চুলে পাক ধরেছে, তাকে উদ্দেশ করে মাধব বলল, "আপনি কি বলেন, মুরুব্বি? এই সংকটে কি করা উচিত" হুঁকোর নলে মুখ লাগালেই বুড়োর কাশী আসত। কাশী থামলে বুড়ো তার উত্তরে বলল,

'কি আর বলব, বাবা মাধব? বুড়ো হয়েছি; তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। আর তো কটা দিন; তারপর শরীরটা পুড়ে ছাই হবে। আমি শান্তি ভালোবাসি। সারা জীবন আমি নীল-ডাঙার সায়েবদের জন্য নীলের চাষ করছি। অনেক কষ্ট পেয়েছি।

জীবনের এই শেষের দিকে, ওনার সঙ্গে ঝগড়া করে—কি হবে? তোমার বয়স কম। তুমি এখন আরো অনেক বছর সুখ-দুঃখ করবে। যদি এই লড়াইয়ে তোমরা জেত, আমি খুব খুসি হব; নিজের জন্যে না, তোমাদের জন্য। কিন্তু জিতবে কি না সন্দেহ হয়।"

"এ আমাদের লড়াই নয়, মুরুব্বি। আমরা আবার কে? আমরা কি আর মারি সায়েবের কাছে বাধা দিতে পারি? তবে আমাদের রাজা বড় সদয়; তিনি আমাদের সহায় হবেন বলেছেন।"

"বলা তো ভাই, খুব সহজ। কিন্তু কাজের বেলায় দেখবে তিনি আমাদের রক্ষা করতে পারবেন না। সব টুপি ওলা ভাই ভাই। ম্যাজিস্ট্রেটই বল, আর জজ্ই বল, তারা সবাই তাদের সাদা চামড়া ভাইয়ের পক্ষে রায় দেবে।"

তৃতীয় একজন চাষী তখন রেগে-মেগে বলল, "কি বলতে চাইছ, বুড়ো? তুমি কি বলছ যে আমাদের মারি সায়েবের দাদন নিয়ে, যতদিন না মরছি ততদিন নীলের চাষ করে যেতে হবে? বুড়ো হয়ে দেখছি তোমার ভীমরতি হয়েছে।

বুড়ো বলল, "রেগে যেও না, ভায়া। সময় কালে নীলকুঠির সায়েবদের সঙ্গে অনেক ঝগড়াই দেখলাম; কিন্তু সায়েবদের কেউ বাগ মানাতে পারেনি। সর্বদা ওদেরি জয় হয়। কাজেই আমি বলি ওদের সঙ্গে লড়াই করে কিছু হবে না। তার চেয়ে ওর কথা মেনে নেওয়াই বুদ্ধির কাজ।"

চতুর্থ একজন চাষীর কাপড়-চোপড় দেখে মনে হল তার অবস্থা এদের চাইতে ভালো আর অন্যরা যেন তাকে খানিকটা সমীহ করে চলে। সে বলল, "ওঁর কথা মেনে নেওয়া নিছক পাগলামি। নীল চাষ করার চাইতে মরণ ভালো। নীলকরের অপয়া টাকায় হাত দিয়েছ কি তোমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই ধার কোনো জন্মে শোধ হয় না। বরং বছরে বছরে বেড়েই চলে। ক্ষেতের সব চাইতে ভালো জায়গাটি সায়েব নীলের জন্য বেছে দেয়। তারপর গাছ তৈরি

হলে, কেটে যখন কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সর্বদা দেখা যায় ঘরে মেপে যা হয়েছিল, ওদের মপে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম। বাকি জমিতে যে চাল হয়, তাতে পরিবারের সম্বৎসর কুলোয় না। এ একেবারে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো!

সব নীলকরদের মতো মারি সায়েবের-ও দয়া-ময়া নেই। ওর নীল পেলেই হল, চাষী মরল কি বাঁচল তাতে ওর কিছুই এসে যায় না। ওর একমাত্র ফন্দী হল কি করে টাকা জমিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারে। তবে স্বর্গ থেকে সুবিচার হবেই। অপরের সর্বনাশ করে যে বড়লোক হয়, তার কখনো ভালো হয় না। এই হল দেবতাদের বিধান। না, না, ওর কথা কখন-ই মেনে নেওয়া যায় না। দেবতাদের কৃপায় নবকৃষ্ণবাবু চিরকাল বেঁচে থাকুন। তিনি আমাদের পক্ষ নেবেন বলেছেন। ওঁর সাহায্য নিয়ে আমরা ঐ ব্যাটা ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।"

ঐ সভ-ভবা চেহারার চাষী ছিল ঐ গ্রামের মোড়ল। তার কথা শুনে আর সকলে জয়ধ্বনি দিল। বুড়ো কেঁদে ফেলল। জয়-ধ্বনি থামলে মাধব বলল, "মোড়ল এখুনি যা বলল, আমারো সেই মত। নীলকরের সঙ্গে আমরা একা পেরে উঠতে পারব না, কিন্তু জমিদার-বাবু আমাদের পক্ষ নিলে, মারি সায়েব কি করতে পারে?"

"ততক্ষণে মোড়লের মাথা গরম হয়ে উঠেছিল; সে চিৎকার করে উঠল মারি শালাকে মারো! মারি শালাকে মারো! এই হক আমাদের যুদ্ধের ডাক! নীলকররা আমাদের দেশের সর্বনাশ করল। ও শালারা আসবার আগে এ দেশটা ছিল রামরাজ্য। এখন সব উচ্ছন্নে গেছে। ওরা আমাদের ওপর অত্যাচার করে; মারধোর করে; কাটকে দেয়; নিপীড়ন করে; আমাদের বৌ-মেয়ের অপমান করে। নীল বাঁদরগুলো নিপাত যাক! মারি শালাকে মারো!"

প্রবল ভাবে হাত-পা নেড়ে, ভীষণ তেজের সঙ্গে এই কথাগুলো বলতেই, উপস্থিত সকলে একেবারে ক্ষেপে উঠে চ্যাঁচাতে লাগল

"মারি শালাকে মারো !" সেই বুড়ো এতক্ষণ চুপ করেই ছিল ; এবার আর সইতে না পেরে, চিরকেলে হুঁকোটা হাতে নিয়ে বলে উঠল, "দেখা যাবে ভাইসব, তোমরা কেমন করে মারি সাহেবকে মার ! আমাদের দেশের লোকদের ঢের ঢের বীরত্ব দেখেছি। কথায় পর্বত, কাজে সরষের দানা। এই বড় বড় মুখ ; এই এতটুকু বুকের পাটা ! লম্বা চৌড়া কথা বল, কিন্তু সাহেব দেখলে কেঁচো ! সায়েব যেই না দলবল নিয়ে আসবে, পায়ের ফাঁকে ল্যাজ গুঁজে কুত্তার মতো সব পালাবে !"

তাই শুনে সকলে বেজায় উত্তেজিত। এক ছোকরা বলল বুড়োকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হক। ঠিক সেই সময় নবকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের গোমস্তা এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখে সকলে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁকেই মঞ্চের মধ্যিখানের মাদুরের ওপর বসাল। গোমস্তা বললেন যে মারে সায়ের গ্রামে হাম্‌লা দিলে, এরা তার প্রতিরোধের কি ব্যবস্থা করতে পারবে, সে-কথা তিনি জানতে এসেছেন। সেখানে যারা ছিল তারা বলল, আত্মরক্ষা করবার জন্য তারা সবাই প্রস্তুত। গাঁয়ে কারো বর্শা তলোয়ার ছিল না। এক পাইকদের কাছে ছাড়া। তা না থাকতে পারে, কিন্তু বাঁশের লগুড়ের অভাব ছিল না। জমিদারবাবু হুকম দিলেই তারা লগুড় চালাবে।

গোমস্তা একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। নীলকরদের অত্যাচারের উল্লেখ করে বললেন, গ্রামের সকলের এক হওয়া দরকার, নইলে অত্যাচার বন্ধ করা যাবে না। জমিদারবাবু তাদের পিছনে থাকবেন বলে স্থির করেছেন। নীলকরদের অত্যাচার বন্ধ করতেই হবে। যে-ভাবে পারেন জমিদার তাঁর প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করবেন। সে-কথা শুনে প্রজারা আনন্দ রাখার জায়গা পেল না। "নবকৃষ্ণবাবু চিরজীবী হন ! নবকৃষ্ণবাবু অমর হন !" এই বলে ধ্বনি দিতে দিতে সেদিন যে যার বাড়ি গেল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় এমন কোনো নীলকর

বা জমিদার ছিলেন না, যাঁর নিজের একটা দক্ষ লেঠেলের দল না ছিল। এর জন্য প্রচুর খরচ হলেও, তাঁরা মনে করতেন একটা সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া কুঠির কিম্বা জমিদারির কাজ চলা অসম্ভব। বাংলায় সব চাইতে দক্ষ লেঠেলের দলের মালিক বলে মারে সাহেবের খ্যাতি ছিল।

শান্তির সময় তার জন্য পঞ্চাশেক লেঠেল মজুত থাকত; কিন্তু বড় গোছের হাঙ্গামা হলেই সংখ্যাটা অনেক বেড়ে যেত। লেঠেলদের বেশির ভাগ-ই ফরিদপুর কিম্বা পাবনার লোক। সেখানকার লেঠেলদের ভারি সুনাম ছিল। জনা-কতক শান্তিপুরের গোয়ালাও ছিল; সবাই বলত এমন ষণ্ডা আর তেজী প্রজা এ দেশে আর নেই। কিছু পশ্চিমাও ছিল; তবে গণ্ডগোল না বাধলে তাদের ডাক পড়ত না। তাদের গাদা বন্দুক ছুঁড়তে শেখানো হয়েছিল; তবে পাড়া গাঁয়ের হাঙ্গামায় বড় একটা বন্দুকের ব্যবহার চলত না। দলের বেশির ভাগের হাতে থাকত বাঁশের লগুড়। লেঠেলদের বলা হত সরকি-ওয়ালা; সরকি মানে আগায় বর্শার ফলা লাগানো বাঁশের লাঠি। সরকিগুলো খুব কাছে থেকে চালানো হত না, দূর থেকে ছুড়ে মারা হত। এক-এক লেঠেলের কাছে গোটা ছয় সরকি থাকত। ডান হাতে তার একটা তৈরি থাকত; কাছে থেকে কি দূর থেকে ছুঁড়ে মারা যেত। বাকিগুলো বাঁ হাতে ধরা থাকত; দরকার হলেই সে গুলোকে নিয়ে একটার পর একটা ছোঁড়া হত। তাছাড়া সরকিওয়ালার বাঁ হাতে একটা ঢাল-ও থাকত। বেতের ওপর চামড়া লাগিয়ে এই ঢাল তৈরি হত। যারা বেশি দামের ঢাল ব্যবহার করত, তারা সাধারণ চামড়ার বদলে পুরু গণ্ডারের চামড়া লাগাত। সে সহজে ফুটো হত না।

এক দিন ভোর বেলায় মারে সাহেবের চল্লিশ-পঞ্চাশ জন সরকি-ওয়ালা একটা দীঘির উঁচু বাঁধের তলাকার আম-বাগান থেকে বেরিয়ে এসে, বিকট হুঙ্কার দিয়ে দুর্গানগরের চাষীদের বাড়ির দিকে এগিয়ে

গেল। চাষীরা সবে ঘুম থেকে উঠে চোখে মুখে জল দিচ্ছে, এমন সময় সরকিওয়ালারা হিংস্রভাবে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এত ভোরে জমিদারের লোকেরা প্রস্তুত ছিল না। প্রস্তুত থাকলেও মারে সাহেবের চৌকস লেঠেলদের সঙ্গে তারা পেরে উঠত না। নীলকরদের চেয়ে বাঙালী জমিদারদের লেঠেলরা সংখ্যায় কম থাকে, এ-কথা ঠিক নয়। ব্যাপার হল যে নবকৃষ্ণের বাবা সর্বদা নীলকরদের মন জুগিয়ে চলতেন; তাঁর লেঠেলরা কাজ না করে করে আনাড়ি আর কুঁড়ে হয়ে কাজ প্রায় ভুলতে বসেছিল। নবকৃষ্ণ নিজে থাকতেন লেখাপড়া নিয়ে, এদিকে দয়ার শরীর ছিল তাঁর, লেঠেলদের দলের সংস্কার করার কথা তার মনেও হয়নি। চাষাদের হাতে সরকি ছিল না, তারা এদের তেমন ভাবে ঠেকাবে কি করে? জমিদারের লেঠেলরাও আক্রমণের সময়টা না জানাতে, কেউ তৈরি ছিল না। গ্রামবাসীরা দলে দলে বেরিয়ে এসে, হাতের কাছে যা পেল, ইট পাটকেল, ভাঙা হাঁড়িকুড়, তাই ছুঁড়ে মারতে লাগল। তাছাড়া তাদের কাস্তে কুড়ুল কোদাল ছিল। মারে সাহেব নিজেও এসেছিলেন সাদা একটা আরব ঘোড়ায় চেপে বন্দুক সঙ্গে করে। তাঁর অভিতে সরকিওয়ালারা দেখতে দেখতে মাঠ দখল করল।

ঠিক সেই সময় জমিদারের লেঠেলরাও তৈরি হয়ে, অকুস্থলে পৌঁছে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুই দল পরস্পরের দিকে সরকি ছুঁড়তে লাগল। ক্রমে যোদ্ধারা আরো কাছাকাছি এসে গেল। একবার মনে হল জমিদারের দলই জিতে যাচ্ছে, এমন সময় মারে সাহেব দুবার পিস্তল ছুঁড়লেন। শত্রুরা তাতে একেবারে ঘাবড়ে গিয়ে, রণে ভঙ্গ দিল। নীলকুঠির লোকেরা তাদের তাড়া করে কিছুদূর গেল; তারপর কয়েকজন চাষীকে বন্দী করে, তাদের কুঁড়ে ঘরে ঢুকে লুট-পাট করতে লাগল। উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের কেউ কেউ জখম হয়েছিল; তবে সে-রকম গুরুতর চোট কারো লাগেনি। মাত্র একজন লোক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল। সে হল মাধব।

শত্রুরা প্রথমেই তার ঘর আক্রমণ করেছিল। মাধব সাহসের সঙ্গে বাড়ি রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। ফলে তার গায়ে সরকি বিঁধে-ছিল। ব্যথায় কাতর হয়ে মাধব বাড়ির কাছেই একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিল। সরকিওয়ালারা ফিরে এসে তাকে খুঁজে পেয়েছিল। অমনি তাকে ধরে নিয়ে গেছিল। তার কারণ ঐ আঘাতের ফলে যদি মাধব মারা যায়, তাহলে মারে সাহেব মুশকিলে পড়বেন। মাধব আর সেই মোড়লকে নিয়ে ওরা বারোজনকে বন্দী করেছিল। তাদের হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে, জয় ধ্বনি দিতে দিতে, সরকিওয়ালারা নীলকুঠিতে ফিরে গেল। পিছন পিছন মারে সাহেব-ও চললেন। সেখানে পৌঁছে মোড়ল আর অন্যান্যদের একটা বড় গুদোম-ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। শুধু সাহেবের হুকুমে মাধবকে নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হল।



এখন মারে সাহেবের প্রতি ন্যায় বিচার করতে গেলে, বলতে হয় যে দুর্গানগরের চাষীদের কাউকে মেরে ফেলা, কিম্বা গুরুতর ভাবে জখম করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তিনি খালি ওদের ভয় দেখিয়ে বাগে আনতে চেষ্টা করছিলেন। তাদের জিনিসপত্র লুট হক, তাও তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে কোথায় কে কি করল না করল, তাঁর পক্ষে সব দেখা সম্ভব ছিল না। তাঁর লোকরা তাঁর অজান্তে চাষীদের ঘরে ভালো জিনিস যে যা পেয়েছিল, লুটে নিয়ে গেছিল।

বাংলার নীল-চাষের যখন খুব বোল-বোলা, তখন প্রত্যেক কুঠিতে একটা করে বড় গুদোমের মতো ঘর থাকত। নীলকরের লোকরা সেটাকে বলত 'শ্বশুর-বাড়ি'। কে না জানে বাংলায় শ্বশুর বাড়িতে জামাইদের বড় আদর। জামাই এলে বাড়ি সুদ্ধ সকলে তার আদর আপ্যায়ন করে; তাকে যতদূর সম্ভব যত্ন করা হয়, ভালো ভালো উপহার দেওয়া হয়, আর খাওয়া-দাওয়া আমোদ-আহ্লাদের তো কথাই নেই। কাজেই শ্বশুর বাড়ি বলতে এমন একটা জায়গা বোঝায়, যেখানে কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, আছে শুধু আরাম আর আনন্দ। বলা বাহুল্য নীলকুঠির শ্বশুর বাড়িতে এ-সব কিছুই ছিল না। কুঠির মধ্যে এ-ঘরটি সব চাইতে অন্ধকার; এখানে লাথি, কিল, জুতো-পেটানি, গদাধরের বাড়ি আর দুটো বাঁশ দিয়ে বন্দীর বুক চেপে ধরা ছাড়া কোনো উপহার পাওয়া যেত না। দীর্ঘ-নিশ্বাস আর আর্তনাদ ছাড়া কোনো সঙ্গীত শোনা যেত না। আর ভোজ খাওয়ার কথা যদি বলা যায়, দুবেলা দুমুঠো ডাল-ভাত দিয়ে কোনো রকমে ধড়ে-প্রাণে এক করে রাখা হত। এখানে নীলকরের হুকুমে ঋণী আর অবাধ্য চাষীদের বন্ধ করে রাখা হত। ব্যঙ্গ করে জায়গাটাকে ওরা বলত 'শ্বশুর বাড়ি।'

ঘরে কোনো আসবাব ছিল না; একটা মাদুর পর্যন্ত না। ছিল শুধু বন্দীদের উৎপীড়নের জন্য বাঁশ, জুতো, সরকি, বেত। একটা দেয়ালে অনেক উঁচুতে একটা গর্ত ছিল, তাকে জানলা বলা যায় না। এই ঘরে ঐ এগারোজন বন্দীকে বন্ধ করা হল। মিনিট পনেরো বাদে, সাক্ষাৎ যমের মতো মারে সাহেব, তাঁর দুর্ধর্ষ দেওয়ান আর জনা-দুই সরকি-ওয়ালার সঙ্গে ঢুকলেন। হাঙ্গামার সময় সরকি-ওয়ালারা দুজন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। একটা কুরশী আনা হল; তাতে সাহেব বসলেন। প্রভুর দুপাশে দেওয়ান আর সরকিওয়ালারা দাঁড়াল। মারে সায়েব মোড়লকে কাছে ডেকে বললেন, "কি হে, এবার ভাঙা গাঁয়ের মোড়ল হলে

দেখছি। বড় যে বলেছিলে 'মারি সায়েব শালাকে মারো!' এখন কেমন?"

মোড়ল বলল, "খোদাবন্দ, ও কথা আমি বলিনি। আমার সর্বনাশ করবার জন্য কোনো শত্তুরে বলেছে।"

সায়েব বলল, "তোমাদের গোটা জেতের মতো তুমিও বেজায় মিথ্যাবাদী। তুমি কি ভাব তোমরা যা কর, সব আমি জানতে পারি না? তুমি আর ঐ বদমায়েস মাধবটা আমাকে মারবে বলে শাসিয়েছিলে আর অন্যদের উস্কেছিলে, যাতে তারা আমার আর আমার লোকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। শালার জমিদার বলেছিল তোমাদের রক্ষা করবে। কোথায় তোমাদের নবকৃষ্ণ বাপ? এখন এসে তোমাদের রক্ষা করুক।

মোড়ল বলল, "হুজুর সব করতে পারেন। আমাকে মারতেও পারেন, বাঁচাতেও পারেন। আমার মতো হতভাগা চাষীর ওপর খোদাবন্দের দয়া হক!"

মারে বললেন, "তুমি এমন সব খারাপ কাজ করেছ যে এক্ষুণি তোমাকে মেরে ফেলা উচিত। কোনো শালার বাপ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তবে দুটো সর্তে তোমাকে মাপ করতে পারি। এক হল তুমি এক্ষুণি নীল চাষের দাদন নেবে। দুই হল, যখন এই ব্যাপার নিয়ে পুলিস তদন্ত করতে আসবে, গঙ্গাজল ছুয়ে তুমি সাক্ষী দেবে যে আজ কোনো হামলা-টামলা হয়নি; তোমাদের জোর করে নীলকুঠিতে ধরে আনা হয়নি আর তুমি নিজের ইচ্ছায় দাদন নিয়েছ।

মোড়ল বলল, "ধর্মাবতার, সব কিছুতে আমি রাজি আছি, খালি ঐ দাদনটা মাপ করে দিন, হুজুর!"

মারে সায়েব তাই-শুনে বেজায় রেগে সরকি-ওয়ালাদের হুকুম দিলেন, "ওকে মাটিতে ফেলে বাঁশ-বাজি দেখাও!" সঙ্গে সঙ্গে দুই যমদূত মোড়লকে মাটিতে ফেলে, তার বুকের ওপর বাঁশ চেপে

ধরল। ব্যথার চোটে মোড়ল আর্তনাদ করে উঠল, "ও বাবা গো! মা গো! আমার প্রাণটা বেরিয়ে গেল গো! বাঁচাও, বাঁচাও!"

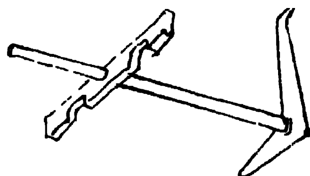
মারে এই দৃশ্য ভারি উপভোগ করছিলেন। এবার ব্যঙ্গ করে বললেন, "কই, দেখি তো তোমার কোন বাপ আসে তোমাকে রক্ষা করতে! এবার বল তখন যে বড় বলেছিলে 'মারি সায়েবকে মারো', সে কথা রাখলে না কেন? সরকি-ওয়ালা, জোরসে লাগাও!"

যন্ত্রণার চোটে মোড়ল আরো চ্যাচাতে লাগল, "ও বাবা! ও মা! প্রাণ গেল' প্রাণ গেল! দাও সায়েব, দাদন দাও।" সরকি-ওয়ালারা বাঁশ তুলে নিয়ে মোড়লকে ধরে বসিয়ে দিয়ে, এক গেলাস জল খেতে দিল।

মারে বলল, "এত তাড়াতাড়ি তোমার সুবুদ্ধি হল দেখে বড় খুসি হলাম। আশা করি এ শিক্ষা কখনো ভুলবে না।" এদিকে বাকি দশজন স্বচক্ষে মোড়লের এই নিপীড়ন দেখে আর কোনো আপত্তি না তুলে, দাদন নিতে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। তাদের তখুনি 'শ্বশুরবাড়ি' থেকে দপ্তরখানায় নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কাগজপত্র তৈরি করা হল। মোড়ল লিখতে পড়তে জানত, সে নাম সই দিল; বাকিরা একটা করে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। তখনি তাদের দাদন দেওয়া হল। তারপর নীলকর তাদের বিদায় দিলেন। যাবার আগে মারি সায়েব ওদের শাসিয়ে রাখলেন যে যদি কেউ দারোগা কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়, তাহলে তিনি ওদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, ওদের প্রাণে মেরে শেষ করবেন। দুপুর বেলা ছাড়া পেয়ে, ওরা গ্রামে ফিরল।

এদিকে মাধবকে তো 'শ্বশুরবাড়িতে' না নিয়ে, নদীর ধারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার কারণ হল যে মারে সাহেব একবার দেখেই বুঝেছিলেন যে মাধবের আঘাত গুরুতর, হয়তো প্রাণ সংশয় আছে। মাধব যদি পুলিসের হাতে পড়ে, তাহলে এই ব্যাপারটার গুরুতর ফল হতে পারে। কাজেই ওকে কোথাও সরিয়ে ফেলাই দরকার।

তার মানে নয় মারের ইচ্ছা ওকে সরাসরি মেরে ফেলা হক। তিনি যতই না নিষ্ঠুর আর অত্যাচারী হন, খুন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। বরং নাপিত ডেকে মাধবের ক্ষত-স্থান ওষুধ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সে কালে নাপিতরাই যে শল্য-চিকিৎসা করত, সে-কথা আগেও বলা হয়েছে। তারপর তাকে মারে সাহেবের নিজের একটা নৌকোয় তুলে অনেক দূরে আরেকটা নীল-কুঠিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। হাঙ্গামার খবর কিম্বা পুলিসের তদন্ত সেখানে পৌঁছবার ভয় ছিল না।



এদিকে হামলা শুরু হবার আগেই জমিদার নবকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যে সাগরপুর থানার দারোগাকে মারে সাহেবের শাসানির খবর দিয়ে, হাঙ্গামা বন্ধ করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কস্তু মারি তার আগেই এক চাল চেলেছিলেন। মাধবের সঙ্গে যে-দিন তাঁর কথা হয়েছিল. সে-দিনই তিনি দারোগাকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে দুর্গানগরের কয়েকজন অবাধ্য প্রজাকে বাগ মানাবার জন্য তাদের কিছু ভয় দেখানো দরকার হয়ে পড়েছে। জমিদারের অনুরোধে দারোগা যেন আবার বাধা দিয়ে না বসেন। মারের চিঠি পেয়ে দারোগা সায়েব কিছু লাভের গন্ধ পেয়ে, লাফিয়ে উঠলেন। নীল-ডাঙার নীলকুঠির সঙ্গে সাগরপুরের থানার সর্বদাই বেজায়-ভাব। সত্যি কথা বলতে কি, পুলিসের সহযোগিতা না থাকলে নীলকর ও-ভাবে চাষীদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যেতে পারতেন না। এই সহযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল—'কেনা হয়েছিল' বললে মিঃ মারের মতো একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে ঘুষের দায়ে ফেলা হয়;

ভদ্রলোকরা কখনো ঘুষ দেয়? বরং টাকা উপহার দেওয়া যেত: হয় হামলার আগে, নয় অব্যবহিত পরেই। এই অবস্থায় কোথাও হামলা হবে শুনলে দারোগা বেজায় খুসি হতেন। হামলা হলে দারোগারা সাধারণতঃ দুই পক্ষের কাছ থেকেই উপহার পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নবকৃষ্ণ বাঁড়ুযোর কাছ থেকে উপঢৌকন, কি উপহার, কি দান, কি ঘুষ, যাই বলা যাক না কেন—কিছুই পাবার আশা ছিল না।

গদীতে বসে অবধি নবকৃষ্ণ সব রকম ঘুষের বিরোধিতা করে এসেছিলেন। দুজনার কাছ থেকেই আবেদন পেয়ে, মন ঠিক করে ফেলতে দারোগার খুব অসুবিধা হয়নি। তিনি মনে মনে বললেন, "গোলোযোগটা মিটে যাবার আগে অবধি কিছু না করাই বুদ্ধির কাজ। তারপর হাঙ্গামা চুকলে তড়িঘড়ি অকুস্থলে হাজির হয়ে, যাতে ঘরে দু পয়সা আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নবকৃষ্ণ ছোকরা এখনো দুনিয়ার হাল-চাল শিখল না, ওর কাছ থেকে একটা পয়সাও পাব না, কাজেই মারের কাছ থেকে যতটা সম্ভব আদায় করতে হবে। হাঙ্গামাতে সে ব্যাটা নির্ঘাৎ জয়ী হবে আর অনেকগুলো প্রজাও জখম হবে। আমারি লাভ। এই রকম ফন্দী আটছিলেন দারোগা। তাঁর কথায় কোন ভুল ছিল না।

বন্দীদের ছেড়ে দিয়েই মারে সাহেব হাঙ্গামার ফলাফল দারোগাকে জানিয়ে দিলেন। দারোগা ঘোড়া তৈরি করতে বললেন। তারপর বক্সীকে নিলেন, জমাদার নিলেন, গোটা ছয়, বরকন্দাজ নিলেন, জনা কুড়ি চৌকিদার নিলেন। তারপর জাঁক-জমক করে তদন্তে চললেন। দক্ষিণপল্লী পথে পড়ে; সেখানে নবকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। নবকৃষ্ণ তাঁকে হাঙ্গামার বিস্তারিত বিবরণী দিলেন। কি রকম মারামারি হয়েছিল; কিভাবে প্রজারা বন্দী হয়েছিল; তাদের ওপর কি রকম অত্যাচার করা হয়েছিল; তারপর দাদন নিতে বাধ্য করে তাদের কি ভাবে ছেড়ে

দেওয়া হয়েছিল ; সব বললেন জমিদার। মাধবের অদৃশ্য হওয়ার কথাও জানালেন। বললেন যুদ্ধে সে বেচারা হয় তো মারাই গেছে। নীলকর সায়েবের এই উদ্ধত ও হিংসাত্মক ব্যবহারের যথেষ্ট নিন্দা করে, নবকৃষ্ণ বললেন যে এই ব্যাপারের একটা যথাযথ বিবৃতি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠানো দারোগার কর্তব্য।

দারোগা শান্ত ভাবে বললেন যে অকুস্থলে গিয়ে নিজে তদন্ত না করে তো আর কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় না। মারামারি হলেই দেখা যায় যে দুই পক্ষের-ই দোষ আছে ; তবে এক পক্ষের দোষ হয়তো বেশি। তারপর ইঙ্গিতে বোঝালেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমিদারের মনের মতো বিবৃতি পাঠানো হবে কি না, সেটা তো অনেকখানি জমিদারবাবুর ওপরেই নির্ভর করছে। ইঙ্গিতটা বুঝেও নবকৃষ্ণ সে দিকে কান দিলেন না। শুধু বললেন দারোগা যখন একজন পুলিসের কর্মচারি, ম্যাজিস্ট্রেটকে সত্য কথা জানানোই তাঁর কর্তব্য।

দারোগা নবকৃষ্ণের কাছে কিছু পাবেন বলে আশাই করেন নি, কাজেই একটুও ক্ষুণ্ণ হলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করলেন নীলকরের পক্ষে টেনে বলবেন। তাতে তাঁর বেশি লাভ হবে। জমিদারের কাছে একটা খবর পেয়ে দারোগা মহাখুসি। মাধবকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবলেন মাধব নিশ্চয় মারা গেছে আর নীলকর তার মৃতদেহটা হয় নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, নয় নীলকুঠিতে পুঁতে ফেলেছে। এতে ভারি সুবিধা হয়ে গেল। ঐ ব্যাটা নীলকরের কাছ থেকে মোটা ঘুস আদায় করা যাবে। এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা মনে করে আহ্লাদে গদগদ হয়ে—কে না জানে পুলিসের কর্মচারিরা চাষীদের সর্বনাশে ফুলে ফেঁপে উঠত—দারোগা সাহেব বিকেলের মধ্যে বাকি পথটুকু পার হয়ে দুর্গানগরে পৌঁছলেন।

গাঁয়ে দারোগা এলে বাঙালী চাষীরা ভয়ে তটস্থ হয়। পৌঁছবার

সঙ্গে সঙ্গে আদায়পত্র শুরু হয়ে গেল ; বরকন্দাজরা আর চৌকিদাররা রসদ সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ল। এক ঘটনার মধ্যেই রাশি রাশি খাবার জোগাড় হল। মুসলমান চাষীদের কাছ থেকে ডজন ডজন মুরগি অনেক কুড়ি ডিম। হিন্দুদের কাছ থেকে চাল ডাল তরকারি তেল ঘি। এত খাবার দিয়ে সাগরপুরের গোটা থানা-বাড়ির এক মাসের রসদ হয়ে যেত। আর শুধু খাবার-দাবার-ই সংগ্রহ হল না। ভীতু চাষীরা পুলিসের লোকদের খুসি করবার জন্য টাকা পয়সা যে যা পারল, সঙ্গে সঙ্গে সব দিয়ে দিল।

যেখানে মারামারি হয়েছিল, দারোগা ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে তদন্ত শুরু করলেন। জায়গাটা মাধবদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। দেখে বুঝবার জো ছিল না যে এখানে এত কাণ্ড হয়ে গেছে। কারণ সর্দার ক-ওয়ালারা এমন সাবধানে কাজ হাসিল করেছিল, যাতে কোনো চিহ্ন না পড়ে থাকে। দারোগা, দারোগার লোকজন আর প্রজারা ছাড়া, সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রভুদের প্রতিনিধি হয়ে নীলকরের আর জমিদারের গোমস্তা দুজন। জবানী লেখা হবার আগে নীলকরের গোমস্তা দারোগার ঠিক নিচের কর্মচারি বক্সিকে আলাদা ডেকে নিয়ে তার সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বললেন। বক্সীও দারোগার পাশে বসে তার কানে কানে কিছু বললেন। এদের কথা-বার্তার বিষয়-বস্তু জানা যায় নি, আন্দাজে কিছু বলা উচিত হবে না। পরে জমিদারের গোমস্তা বলেছিলেন যে বক্সী নাকি সায়েবের পক্ষ থেকে দারোগাকে মোটা ঘুস দেবার কথা বলেছিলেন। সে যাই হক, এর পর জবানী লেখা হতে লাগল।

পাঠক শুনে অবাক হবেন যে প্রজারা সবাই এক বাক্যে বলল যে কোনো হাঙ্গামা হুজ্জোৎ হয়নি ; কোনো প্রজাকে বন্দী করা হয়নি ; তারা নিজেদের ইচ্ছায় মারে সাহেবের দাদন নিয়েছে। এক বাক্যে সকলের এমন মিথ্যা বলার কারণ হল মারি সাহেবের ভীতি। তিনি যে জমিদারের চাইতে ক্ষমতাশালী, সে-কথা এবার প্রমাণ হয়ে গেল।

প্রজাদের ধারণা হল তাদের মঙ্গল করবার ইচ্ছা জমিদারবাবুর বাস্তবিক-ই থাকতে পারে, কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সাহেবের সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেন না। তাঁর ওপর নির্ভর করা আর পাট-কাঠির ওপর নির্ভর করা এক। কাজেই তারা অস্বীকার করল যে দুর্গানগরে মারামারি হয়েছিল। একটা বিশ্রী প্রশ্ন বাকি ছিল। সেটা হল, তাহলে মাধব কোথায় গেল? প্রজারা সবাই বলল এ বিষয়ে তারা কিছু জানে না; মাধবকে তারা কেউ দেখেনি।

যখন এই সব জবানী লেখা হচ্ছিল, দারোগা তখন ভারি উল্লাসের সঙ্গে জমিদারের গোমস্তার দিকে ফিরে বললেন, "হিন্দুগুলো কি মিথ্যাবাদী দেখেছেন!" দারোগা নিজে মুসলমান—"জমিদারের আবেদন তা হলে একেবারে মিথ্যা বলে প্রমাণ হল। সবটাই আগা গোড়া জমিদারের মন-গড়া। এখন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। মারে সায়েবকে বিপদে ফেলবার জন্য জমিদার সমস্তটাই বানিয়ে বলেছেন। স্পষ্টই বুঝতে পরছি জমিদার নিজেই মাধবকে লুকিয়ে রেখেছেন; যাতে মারে সায়েবের বিরুদ্ধে গুরুতর কেস্ তৈরি করা যায়।"

এই কথা শুনে, ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাবার জন্য বক্সী যে বিবৃতি তৈরি করলেন, তাতে বলা হল যে দারোগা নিজে অকুস্থলে তদন্ত করে, প্রত্যেকটি সাক্ষীর জবানী নিয়ে বুঝেছেন যে ওখানে আদৌ কোনো গণ্ডগোল হয়নি। মারেকে জব্দ করবার জন্য জমিদার সব কথা বানিয়ে বলেছেন এবং খুবই সম্ভব তিনি নিজে মাধবকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

দারোগা সে দিনিই সন্ধ্যায় থানায় ফিরে গেলেন। যাবার আগে একবার নীল কুঠি হয়ে গেলেন, সেখানে তাঁর যথেষ্ট লাভ হল।



মা-লক্ষ্মী

১৪

নীল চাষের অঞ্চলের প্রজারা বলে কোনো চাষী যদি নীলকরের বিপদের কারণ হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে 'সাত কুঠির জল খাওয়ানো হয়।' অর্থাৎ কোনো তেজী চাষী নীলকরের বিপক্ষে দাঁড়ালে, তাকে গুম্ করে এক কুঠি থেকে আরেক কুঠিতে ঘুরিয়ে বেড়ানো হয় এবং শেষে তাকে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে ফেলা হয়। মারে সাহেবের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হলে বলতে হয় মাধব সম্বন্ধে গোড়ায় তাঁর এমন কোনো ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সেদিনের মারামারিতে সে এমন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল যে তা না করেও উপায় ছিল না। তাকে দুর্গানগরে থাকতে দেওয়া অসম্ভব ছিল, কারণ তাহলে একটা মারামারি যে হয়েছিল সে-কথা প্রমাণ হয়ে যেত। আর শেষ পর্যন্ত ঐ আঘাতের কারণে যদি তার মৃত্যু হত, মারে পড়তেন মুশকিলে। কাজেই তাকে সরিয়ে না ফেলে উপায় ছিল না।

প্রথমে তাকে পাঁচ ছয় কোশ দূরের একটা কুঠিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেখানে ওকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি রাখা হয়নি। দারোগার বিবৃতি শুনে ম্যাজিস্ট্রেটের ধারণা হয়েছিল যে মার-পিট কিছুই হয়নি; মারে সাহেবকে জব্দ করবার ইচ্ছায় জমিদারই মাধবকে লুকিয়ে রেখেছেন। কাজেই তিনি জমিদারকে হুকুম দিলেন পত্রপাঠ মাধবকে বের করে দিতে, নইলে তাঁকে দণ্ড পেতে হবে। এদিকে

জমিদার বেচারির আদৌ কোনো দোষ ছিল না, তবু নিজের নিরাপত্তার জন্য তাঁকে নীলকরের বন্দীটি কোথায় গেল, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হল।

পুলিসের লোকরাও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল; যত না ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম পালনের আগ্রহে, তার চেয়ে বেশি যার কাছে মাধবকে খুঁজে বের করা যাবে, তার কাছ থেকে বেশ ভালো দাঁও মারা যাবে। কাজেই জমিদারের চররা আর থানার চৌকিদাররা সবাই কাজে লেগে গেল। তারা খবর আনল মাধবকে নিয়ে নীলকরের নৌকো কুলাদহের দিকে গেছে। নীলকরের সহকারী যেই শুনলেন এঁরা এই খবর টুকু পেয়েছেন, অমনি ভাগীরথীর ওপর শেরপুরের কুঠিতে মাধবকে নিয়ে যাওয়া হল। এ কুঠি মাত্র কয়েক মাইল দূরে হলেও, হুগলির জেলায় পড়ত। তাতে অনেক সুবিধা।

কিন্তু চররা আর চৌকিদাররা সেখানে গিয়েও উপস্থিত হল, অগত্যা মাধবকে বহুদূরে পূর্ব বঙ্গের এক কুঠিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। যাবার পথে কৃষ্ণধামের, রাধানগরের, চক্রদ্বীপের, সরিষা মুদ্রার কুঠি বাড়িতে নৌকো লাগিয়ে, মাধবকে কয়েক ঘণ্টার জন্য নামিয়ে, তারপর আবার নৌকোয় তুলে অবশেষে ইচ্ছামতী নদীর ধারে মৌলবী গঞ্জের নীলকুঠিতে পৌঁছনো গেল। এই খানেই মাধবকে বন্দী করে রাখার কথা। মাধব বেচারির কিন্তু জীবন শেষ হয়ে এসেছিল। বারে বারে জায়গা বদলের জন্য ক্ষত-স্থানে কোনো ওষুধ-পত্র দেওয়া হয়নি; ফলে ঘা বিষিয়ে উঠেছিল। মৌলবী ঘাটের কুঠিবাড়ির ঘাটে নৌকো থেকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে মাধবের প্রাণটা বেরিয়ে গেল। তার দেহ দাহ করাও হয়নি, কবর-ও দেওয়া হয়নি। রাতের অন্ধকারে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্রোতের সঙ্গে হয়তো মৃতদেহ একেবারে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছিল। নীলকরের লোভের কারণে, এই ভাবে নির্দোষ মাধবের জীবন শেষ হল।

এর অনেক দিন পরে মাধবের মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদ দুর্গানগরে

তাদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। হামলার পরে ওর মায়ের আর স্ত্রীর ধারণা হয়েছিল যে অন্যদের সঙ্গে ওকেও তাহলে নীলডাঙার কুঠিতে ধরে নিয়ে গেছে। তারপর যখন মাধব ছাড়া বাকি সবাই ফিরে এল ওদের শোকের আর অবধি রইল না। দুঃখে জর্জর হয়ে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করে রইল, যদি এক ভালোবাসার মানুষটির কোনো খবর আসে। কিন্তু সবই বৃথা। দিন রাত মালতী চোখের জল ফেলত। রূপোর গয়নাগুলো সে ভেঙে গা থেকে খুলে ফেলে দিল। গভীর হতাশায় অনেক সময় সে মাটিতে মাথা কুটত; খাওয়া-দাওয়া এক রকম বন্ধ করল; মাধবের মা প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠল।

আগের চেয়ে তার মেজাজ আরো দশগুণ খারাপ হল; শেষটা এমন দাঁড়াল যে ওর ধারে কাছে কেউ যেতে পারত না।

অবশেষে এক দিন দৈবাৎ একজন পথিক এসে মাধবের মৃত্যু সংবাদ দিয়ে গেল। সেই নিদারুণ সংবাদ পেয়ে এদের দুজনার যে অবস্থা হল তার বর্ণনা দেওয়া যায় না। সুধামুখী সত্যি সত্যি পাগল হয়ে এক দিন ঘরের-বাঁশের কড়িতে গলায় দড়ি দিল। কাদম্বিনী তার শ্বশুরবাড়ি গেল; তার ভার নিতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না।

মালতী ঘর বাড়ি, জমিজমা, জিনিস পত্র সব বিক্রি করে দিয়ে, যাদবকে নিয়ে, কাঞ্চনপুরে ভাইয়ের কাছে উঠল। গোবিন্দর এমন অবস্থা ছিল না যে দিদিকে ভাগ্নেকে খেতে পরতে দেয়। তার দরকারও হল না। স্বামীর সম্পত্তি বেচে মালতী শত-খানেক টাকা পেয়েছিল। তার কিছুটা দিয়ে সে ব্যবসা শুরু করে দিল, বাকিটা মোটা সুদে ধার খাটাত। ব্যবসাটি খুবই সহজ। ধান কিনে, ঘরে চাল করে, মালতী বিক্রি করত। তাতে যা লাভ হত আর টাকা খাটিয়ে যে সুদ পেত, তাই নিয়েই মা-ছেলের সব খরচ চলে যেত। তারপর অল্প দিন পরেই ছেলেটাও কিছু রোজগার করতে শুরু করল;

পড়শীদের গোরু চরাত ; গোবর কুড়োত ; মালতী তাই দিয়ে ঘুঁটে দিত ; ঘুঁটেগুলো বিক্রি করত।

এর পর জমিদার নবকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যে কথা আর উঠবে না, কাজেই এই খানে বলে রাখা ভালো যে প্রজাদের কল্যাণের কাজে নীলডাঙার সাহেব যতই না তাঁকে বাধা দিন, শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে তাঁর সব চেষ্টা সার্থক হয়েছিল। বাংলার জমিদারদের দীর্ঘ তালিকায় নবকৃষ্ণের মতো মানব প্রেম উদারতা, সততা আর জনসেবা খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। মারে সায়েবের কথাও আর বলা হবে না। ঐ 'জোর যার মুলুক তার' নীতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওঁর কোনো সুবিধা হয়নি। ওঁর অমানুষিক অত্যাচারে সমস্ত চাষীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, ওঁর বিরুদ্ধে সকলে মিলে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত ওঁর বে-বন্দোবস্তর ফলেই বেঙ্গল ইণ্ডিগো কন্‌সার্নকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল ; নীলকুঠি নিলাম হয়ে গেছিল।

এদিকে কাঞ্চনপুরে গোবিন্দের বড়-ঘর পুড়ে যাবার পর মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে, আবার ঘর তোলার ব্যবস্থা হচ্ছিল। চাষীর ঘর তৈরি করা কিম্বা নতুন করে ঘর ছাওয়া শুনতে যত সহজ, আসলে ততটা নয়। দেরি হবার একটা কারণ হল যে দরকারি জিনিসপত্র হাতের কাছে পাওয়া গেল না। জিনিস পেলেও চাষীর হাতে টাকাকড়ি থাকে না। বাঁশ অবিশ্যি কাঞ্চনপুরে পাওয়া যেত; কিন্তু পাঁচ ছয় কোশ দূরের কোনো কোনো গ্রামে বাঁশ আরও সস্তা, কারণ সেখানে এন্তার বাঁশ হত। কালামানিককে ঐ অত দূর গিয়ে বাঁশ বাছাই করে কেটে, কাঞ্চনপুরে নিয়ে আসতে হল। পথ বেজায় খারাপ, গাড়ি-টাড়ি চলে না ; কাজেই বলদের পিঠে চাপিয়ে আনতে হল। একটা বলদ একেক বারে গোটা চারেকের বেশি মজবুত লম্বা বাঁশ বইতে পারে না। বাঁশ আনলেও তখুনি ব্যবহার করা যায় না। জলে ভিজিয়ে পাকিয়ে নেওয়াই বুদ্ধির কাজ। বাঁশগুলো তাই গোবিন্দর ঘরের কাছে পুকুরে ফেলা

হল কয়েক দিন জলে ডুবিয়ে রেখে, বাঁশ তোলা হল। কয়েকটা বাঁশ কেটে খুঁটি তৈরি হল; বাকিগুলো চীরে সমান করে বাখারি হল। তারপর তাল-গাছ কাটা হল; করাত দিয়ে টুকরো করা হল; টুকরোগুলো সমান করা হল; এগুলো দিয়ে কড়ি বরগা হবে। সরু মোটা দু-রকম দড়ি দরকার। কাঞ্চনপুরে দড়ি পাওয়া না গেলেও, বর্ধমানে যথেষ্ট পাওয়া যেত। তবে গরীব চাষীর পক্ষে অত দাম দেওয়া মুশকিল। ক্ষেতে শাণ-গাছ ছিল; গোবিন্দ আর কালা-মানিক 'ঢেড়া' বলে একটা চাকার মতো জিনিস দিয়ে শনের আঁশ পাকিয়ে দড়ি বানাল। খড়ের গাদায় গাই-বলদ খাবে বলে যে খড় তোলা ছিল, সেগুলি দিয়ে ঘর ছাইতে হলে খানিকটা তৈরি করে নেওয়া দরকার।

অগত্যা খড়ের আঁটি খুলে উঠোনে বিছানো হলো তারপর গোরুগুলোকে সারি সারি উঠোনের মাধ্যখানে একটা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে, খড় মাড়ানো হল। যাতে যেটুকু ধান লেগেছিল সেগুলোও পড়ে যায়। তারপর খড় বাছাই করে, আবার লম্বা লম্বা আঁটি বাধা হল। একে বলে লোট। দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা, কালামানিক অবিরাম এই ছাদ তৈরির কাজে লেগে রইল। তারপর যখন শেষে ছাদের মটকা বসল, সকলের আনন্দ দেখে কে!

ভগবানের নাম না করে নতুন ঘরে কেউ বাস করতে পারে না। কালামানিক আর গোবিন্দ যতই না গরীব অশিক্ষিত হক, বাংলার সব চাষীদের মতো, ধর্মে তাদের ভারি ভক্তি। পুজো না দিয়ে কেউ নতুন ঘরে, কিম্বা মেরামত করা পুরনো ঘরে, ওঠে না। গৃহ-দেবতাদের পুজো দিয়ে, তাঁদের পুরনো স্থানে বসিয়ে, তবে অন্য কথা। তা ছাড়া এই ঘরটার একটা বিশেষত্বও ছিল। অগ্নিদেব ঘরটিকে পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন। যদিও ওরা সকলেই খুব ভালো করেই জানত যে জমিদারবাবুর হুকুমে অপকর্মটি হয়েছিল, তবু ওদের মনে কেমন একটা কুসংস্কার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে দেবতাদের বিচারেই এ রকম

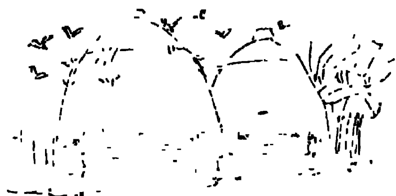
হয়েছিল। কাজেই সবার আগে ঘরটিকে দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করা দরকার। মটকায় শেষ খড়ের গুছা গোঁজা হয়ে গেলে, ওদের কুলপুরোহিত রামধন মিস্ত্রি ঘরের মধ্যে পূজোয় বসলেন। মন্ত্র পড়া হল; গণেশকে আর অগ্নিকে ডাকা হল। কিন্তু যাঁকে অজ বিশেষ করে পুজো করা হল, তিনি হচ্ছেন মা লক্ষ্মী, সমুদ্র মন্থন করে বিষ্ণু যাঁকে পেয়েছিলেন।

বাংলায় এমন কোনো হিন্দুবাড়ি নেই, তা সে যত গরীবই হক না কেন, যেখানে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি না পান; তিনিই হলেন হিন্দুগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জীবনের সব মঙ্গল হয় তাঁরই দয়ায়। তিনি তুষ্ট হলে গৃহস্থ ধনী হয়; তিনি চটলে গৃহস্থ দরিদ্র হয়। কোনো পরিবারের অবস্থা ফিরলে, লোকে বলে লক্ষ্মী ওদের বাড়িতে বাঁধা পড়েছেন। কেউ গরীব হয়ে গেলে, সবাই তাকে বলে লক্ষ্মী-ছাড়া। কাজেই সব বাড়িতে তাঁর পুজো হয়। লক্ষ্মীকে দেখানো হয় সুন্দরী যুবতী রূপে, সোনালী গায়ের রং, পদ্ম ফুলের উপর বসে আছেন। তবে এইরকম মূর্তি গড়ে ঘরে ঘরে তাঁর পুজো হয় না; চাষীর ঘরে তো নয়ই। তাঁর প্রতীক্ হল চাল মাপবার একটা 'কাঠা' বা ঘট; তার গায়ে সিঁদুর মাখানো হয়; ভেতরে ধান ভরা হয়; তারপর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে, সাদা কাপড় জড়িয়ে চারদিকে কড়ি সাজিয়ে রাখা হয়। বাঙালী চাষীদের কাছে যত রকম প্রতীক আছে, ইনিই হলেন তার মধ্যে সব চেয়ে পবিত্র; সৌভাগ্যের রক্ষা-কবচ লক্ষ্মীর এই ঘট।

পুজো হয়ে গেলে তিনজন বামুনকে খাওয়ানো হল। তার বেশি খাওয়ানো গোবিন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের কিছু দক্ষিণাও দেওয়া হল। কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুও খেল; এইভাবে ঘর উৎসর্গ করা হল। তারপর ঘরখানিকে সংসারের কাজে লাগানো হল। লোকে এ সবকে গোঁড়ামি বলতে পারে; কিন্তু হিন্দুদের, এমনকি হিন্দু চাষীদেরও, ধর্মের প্রতি এই গভীর ভক্তি দেখলে শ্রদ্ধা না হয়ে

যায় না। পুজোটুজো কুসংস্কার হতে পারে, কিন্তু একেবারে অর্থশূন্য নয়। পুজোর মানেই হিন্দুরা এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের জগতের ওপরে পবিত্র মহান কিছুতে বিশ্বাস করে।

এতে প্রমাণ হয় যে অশিক্ষিত চাষীদের মধ্যেও এমন কিছু আছে, যেটা তাদের বাঁদর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এই রকম ধর্মে মতি এই কথাই প্রকাশ করে যে হিন্দুরা বিশ্বাস করে সব পার্থিব সুখই এক অদৃশ্য শক্তির দয়ার ওপর নির্ভর করে, সব সৌভাগ্যের কারণ মঙ্গলময়ের দাক্ষিণ্য।



ভাদ্রমাসে কাঞ্চনপুরের কারিগরদের উৎসব। এই সময়ে বিশ্বকর্মার পুজো হয়। বিশ্বকর্মা হলেন পৃথিবীর অর্থাৎ ভারতের সব কারিগরদের দেবতা। এই উৎসবের খানিকটা ধর্মীয়, আবার খানিকটা লৌকিক: যারা হাত দিয়ে কাজ করে, এ তাদের-ই উৎসব। সেদিন গ্রামে কামারের হাতুড়ি-পেটা—যার শব্দ দিনে রাতে কখনো বন্ধ হত না—সে-ও চুপ। কুমোর, ছুতোর, তাঁতী, জেলে, চাষী সকলের সেদিন ছুটি। বিশ্বকর্মা হলেন দেবতাদের স্থপতি। তাঁর মূর্তিটি ভারি মজার। সাদা রঙের একটা মানুষ, তার তিনটে চোখ, মাথায় মুকুট, গলায় সোনার হার, হাতে সোনার বালা। কিন্তু ডান হাতে একটা মুগুর! তবে এ মূর্তি সচরাচর কেউ গড়ত না; যার যা জাত-ব্যবসা সে তার-ই যন্ত্রপাতি সাজিয়ে পুজো করত।

গোবিন্দ সেদিন ঘরের কোণে লাঙল, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি সাজিয়ে রাখল; নন্দ তাদের বাড়িতে রাখল হাতুড়ি, নেহাই,

হাপর; কপিল রাখল কুড়ুল, গোঁজ, র‍্যাঁদা; চতুর রাখল ক্ষুর, কাঁচি, নরুণ; বোকারাম তার তাঁত আর মাকু; জেলেরা তাদের জাল, ছিপ, বঁড়শী; তেলী রাখল তার ঘানি, কুমোর তার চাক রাজমিস্ত্রি তার কর্ণিক আর ওলনের দড়ি; মুচি রাখল তার মোটা ছুঁচ, ধোপা তার কাঠের মুগুর আর ইস্ত্রি। যে যার যন্ত্রপাতি ধুয়ে মুছে আলাদা করে রাখল; সে দিন কোনো কাজ হল না। ভক্তরা সকালে পুকুরে স্নান সেরে যে যার ভালো কাপড় পরল। পূজো করতে বেশি সময় লাগল না। বামুন পুরুতরা যে-সব মন্ত্র পড়লেন, তাতে শুধু আগেকার দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো হল না, ভবিষ্যতের জন্য আরো দয়া প্রার্থনা করা হল। বলা বাহুল্য যে সে দিন যে সব যন্ত্রপাতিকে আলাদা করে সাজিয়ে ফুল নৈবেদ্য দেওয়া হল, সেগুলোকে কেউ দেবতা বলে মনে করেনি, ওগুলো চিহ্নমাত্র।

পর দিন থেকে আবার যে কে সেই। বিশ্বকর্মা যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁর পূজো করতে বসে, চোখে দেখা যায় এমন কোনো মূর্তি না গড়ে, এই সব সরল গ্রামবাসীরা যে যার হাতিয়ারকে তাঁর চিহ্ন বলে মেনে নেয়। আমাদের মতে বর্তমান কালের ইউরোপের শ্রমিক-সমাজ যে নিজেদের ধর্মীয় শাসনের বাইরে মনে করে আর কাজের ক্ষেত্রে এক রকম নাস্তিকের মতোই ব্যবহার করে, তার চাইতে বাংলার শ্রমিকদের এই প্রকাশ্যে ভক্তি নিবেদন আর কৃতজ্ঞতা স্বীকার শত গুণে ভালো।

পূজোর পর খাওয়া-দাওয়া। সেদিন কামার, ছুতোর, তাঁতী, নাপিত, চাষী, সবাই অন্য দিনের চাইতে একটু ভালো খায়। যে যার ঘরে বসে একলা খায় না। যে কারিগরদের অবস্থা ভালো, তারা গরীব জাতভাইদের ডেকে এনে খাওয়ায়। বাংলায় জাতিভেদ থাকাতে, নানান্ জাতের লোকরা এক সঙ্গে খায় না বটে, কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা আর সহানুভূতি কিছু কম থাকে না।

আর তাই যদি বলা যায়, সব দেশেই এক দিক দিয়ে না এক দিক দিয়ে জাতিভেদের চিহ্ন দেখা যায়। ভারতে জাতি ভেদের মূলে ছিল নানা রকম পেশা, যারা এক পেশার লোক তারাই পরে একেকটা জাত হয়ে উঠল। ইংলণ্ডে জাতি-ভেদের মূলে আছে টাকা; বড় লোকরা হল ইংরেজ সমাজের বামুন, তাদের চেয়ে গরীবরা হল চণ্ডাল। নীতির দিক থেকে যাই হক, কার্যতঃ এদেশের জাতি-ভেদ ও-দেশের জাতি-ভেদের চেয়ে মন্দ হল কিসে? ইংলণ্ডে ধনী স্যাকরা ধনী তাঁতীর সঙ্গে খেতে বসে বটে, কিন্তু নিজের পেশার-ই একজন গরীব স্যাকরাকে কখনোই সেই টেবিলে বসায় না। ভারতে ধনী স্যাকরা ধনী তাঁতীর সঙ্গে খাবে না বটে, কিন্তু গরীব স্যাকরার সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে খাবে। আমাদের মতে আমাদের জাতি ভেদের চাইতে ও দেশেরটা শত-গুণে মন্দ।

ভোজের পর চাষীরা আর কারিগররা নানা রকম আমোদ-প্রমোদে মাতে। নবান্নের মতো, এই সময়-ও নানা রমক খেলা হয়; হা-ডু-ডু-ডু, মাছ-ধরা, ডাং-গুলি, তাস, গান-বাজনা। গ্রামের মধ্যে এখানে ওখানে ওরা জটলা করে; গাছতলায় বসে তামাক খায়, গাল-গল্প করে; নিজেদের পেশা নিয়ে নানা কথা বলে আবার কেউ বা গল্প বলে। সব দেশের সব সরল মানুষের মতো এরাও বড় গল্প শুনতে ভালোবাসে।

পাঠকের মনে থাকতে পারে জমিদারের সঙ্গে গোলমালের পর থেকেই, কালামানিক মনে মনে কোনো মৎলব আঁটছিল। সেই উদ্দেশ্যে সে কাঞ্চনপুরের আশে-পাশে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াত। কাউকে সে মনের কথা বলেনি বলে ওর মৎলবটা যে কি ছিল, সে-কথা বলা মুশ্‌কিল: জমিদারবাবুকে আক্রমণ করা, নাকি তাঁর বাড়িতে দুঃসাহসিক ভাবে ডাকাতি করা, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু সে যাই হক, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সে আর হয়ে ওঠেনি।

এক দিন সকালে জয়চাঁদ রায় চৌধুরী তাঁর কাছারিতে বসে

আছেন, এমন সময় লেঠেল-সরদার ভিমা কোটাল এসে নমস্কার করল। জয়চাঁদ বললেন, "তুমি কোনো কর্মের নও, ভীমে। ঐ ব্যাটা পাপিষ্ঠ উজবুক কালামানিকটার কিছুই করতে পারলে না। সে তো আমাকে তোয়াক্কাই করে না; দিব্যি আমার বিরুদ্ধে প্রজাদের উস্কে বেড়াচ্ছে, শুধু এই কাঞ্চনপুরেই নয়, চারদিকের অন্যান্য গাঁয়েও। ওকে ঘায়েল করতে পার না?"



ভীমা বলল, "ধর্মাবতার, এই যদি আপনার ইচ্ছা বলে জানতাম তাহলে তো কোন কালে মা-ধরণীর বুকের ভার হাল্কা করে দিতাম।

জয়চাঁদ বললেন, "সেই রকম-ই আমার ইচ্ছে, তা কি তুমি জানতে না? ও ব্যাটা যদ্দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার মনে কোনো সুখ নেই। ওর গতি বন্ধ না করলে ও অশেষ সর্বনাশ ঘটাবে।

ভীমা বলল, "আমি ভেবেছিলাম হুজুরের ইচ্ছা ব্যাটাকে শুধু কসে ধোলাই দেওয়া হয়। যদি জানতাম যে ধর্মাবতার চান ওকে একেবারে বেমালুম উপিয়ে দেওয়া হক, তাহলে কোন কালে তাই দিতাম। খোদাবন্দ বাঘের দুধ চাইলে, আমি তাই এনে দেব। সরদারের হুকুম পেলে আমি কি না করতে পারি। একবার মুখ ফুটে বলুন, আর আমি কালামানিকের মুণ্ডু এনে দেব।

জয়চাঁদ বললেন, "অবিশ্যি আমি ঠিক তা চাই না। তবে কাজটা যেন নিঃশব্দে হয়।"

ভীমা বলল, "আজই হবে, খোদাবন্দ।"

এই বলে ভীমা কাছারি থেকে বেরিয়ে গিয়ে জমিদারের চরদে

সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করল। আগেই বলা হয়েছে জমিদার দস্তুর মতো গোয়েন্দা রাখতেন। সন্ধ্যাবেলায় কালামনিকের গতিবিধি তাদের কাছে জেনে, ভীমা ব্যবস্থা নিল

কাঞ্চনপুরের উত্তর-পূবে চার মাইল দূবে কাদ্‌রা গ্রাম। যে কারণেই হক, দিনের বেলায় কালামানিক সেখানে গেছিল। সন্ধ্যায় সেখান থেকে রওনা হল। তখন সমস্ত ক্ষেতে-মাঠে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে, গোরুর পাল ঘরে ফিরে এসেছে। কাদ্‌রা আর কাঞ্চনপুরের মাঝখানে অনেকখানি খোলা সমান জমি বর্ধমান জেলার অনেক জায়গায় এরকম দেখা যায়।

সমস্ত জায়গাটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা ধান-ক্ষেত; কোথাও কোনো গ্রাম কিম্বা ঘর বাড়ি নেই। একটানা ধানক্ষেতের মধ্যে মধ্যে একেকটা পুকুর, তার উঁচু পাড়; পাড়ের ওপর একটা অশ্বত্থ-গাছ। কাদ্‌রার চাষারা কালামানিককে সেখানেই রাত কাটাতে বলেছিল। অন্ধকার হয়ে গেছে, মাঝপথে কোনো গ্রাম নেই। কিন্তু কালামানিক কারো কথায় কান দেয়নি। তার নিজের প্রচণ্ড গায়ের জোর সম্বন্ধে সে বরাবর-ই খুব সচেতন ছিল, তার ওপর বে পরোয়াও বটে। পথে ওকে লেঠেলরা আক্রমণ করতে পারে শুনে সে হো-হো করে হেসে উঠেছিল।

গামছাটা কোমরে জড়িয়ে, মস্ত বাঁশের লাঠি ডান হাতে ধরে অন্ধকারের মধ্যে সে রওনা দিল। রাস্তা বলে কিছু ছিল না; কিছু দিন আগে ধান কাটা হয়ে গেছে, সেই ন্যাড়া ক্ষেতের ওপর দিয়ে পথ। বড় বড় পা ফেলে কালামানিক এগিয়ে চলল। নির্জন মাঠে কোনো মানুষের সঙ্গে দেখা হল না, পাখিরাও গাঁয়ের চারধারের গাছে আশ্রয় নিয়েছিল। শুধু কোথাও ঝিঁঝি-পোকা, কোথাও বা রাতের পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল। অন্ধকার মাঠে প্রাণের সাড়া ছিল না।

মাইল-খানেক গেলে পর দিগন্তে চাঁদ দেখা গেল; বন্ধু যেন

আলো ধরল। কালামানিক আরো তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল। ভয়-ডর ছিল না তার, ভয় কাকে বলে সে জানত না। প্রায় আধা পথ এসে একটা বড় দীঘি, দামে ঢাকা; তার ধারে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-গাছ। দূর থেকে কালামানিক দেখতে পেল গাছ-তলায় একটা লোক দাঁড়িয়ে। সব চাইতে কাছের গাঁ-ও এক কোশ দূরে। কালামানিক ভাবল লোকটা তবে কে? কিন্তু ও ভাবত ছয় জোয়ান মিলেও ওর সঙ্গে পেরে উঠবে না, তাই নির্ভয়ে এগিয়ে চলল।

গাছটার কুড়ি গজের মধ্যে পৌঁছতেই, ভীমা কোটালের গলা শুনতে পেল। "এসো, ভাই কালামানিক, এসো। আমরা অনেক ক্ষণ তোমার জন্যেই বসে আছি!" কালামানিক এতটুকু ভয় না পেয়ে বলে উঠল, "তবে রে ভীমে, তোর শমনের সঙ্গে মিলতে এসেছিস্ বুঝি!" এই বলে বাঘের মতো এক লাফ দিল; ভীমের কাঁধে মোক্ষম এক লাঠির বাড়ি পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ভীমা পড়ে গিয়ে, হাত পা এলিয়ে শুয়ে থাকল। কিন্তু আরেকটা বাড়ি দেবার আগেই ছয়-সাতজন লেঠেল কালামানিককে ঘিরে ফেলল। এ লোকগুলো পুকুর পাড়ে বসে ছিল। ভয়ঙ্কর মারপিট হল। অমানুষিক বিক্রমে কালামানিক লড়তে লাগল; শত্রু পক্ষের অনেকগুলো লোক জখম হল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছিল না কে জিতে কে হারে। তারপর ভীমা উঠে স্যাঙাৎদের দলে যোগ দিল। ভীমার লাঠির এক বাড়িতে কালামানিক ধরাশায়ী হল। কাঠুরের কুড়ুলের ঘায়ে তালগাছ যেমন মাটি নেয়, তেমন করে কালামানিক পড়ল আর সাত লেঠেল মিলে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলল।

আগের থেকেই তারা দুটো কোদাল নিয়ে এসেছিল। পুকুরের ধারে একটা লম্বা গর্ত খুঁড়ে কালামানিকের মৃতদেহ তার মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দেওয়া হল। ওপরে ঘাসের চাবড়া বসানো হল। এর পর তিন দিন ধরে কাঞ্চনপুরের কেউ জানতে পারেনি কালামানিকের

কি হল। চতুর্থ দিন ঐ পথে যেতে কয়েকজন লোক দেখল কাদিরা আর কাঞ্চনপুরের মাঝ-পথে পুকুর পাড়ে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে। শেয়ালে মাটি খুঁড়ে তার খানিকটা খেয়েছে। কিন্তু কালামানিককে যারা চিনত, মৃতদেহ সনাক্ত করতে তাদের কোনো অসুবিধা হল না। জয়চাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। পুলিসের কর্মচারিদের হাতে কিছু পড়াতে, জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এ ঘটনার কোনো বিবৃতি পাঠানো হল না।



১৫

এক দিন দুপুরে, মাঠ থেকে ফিরে গোবিন্দ বাড়ির পাশের পুকুরে পা ধুচ্ছিল, এমন সময় জয়চাঁদ রায় চৌধুরীর এক পিওন এসে ওর হাতে একটা চিরকুট দিল। তাতে করে গোবিন্দ যে-সব জমিতে চাষ করত তার বাকি খাজনা দাবি করেছেন জমিদার। মোট নব্বুই টাকা কয় আনা। চিরকুটের সঙ্গে একটা জমা ওয়াসিল বাকি'-ও ছিল, তাতে কোন খাতে খাজনা দাবি করা হয়েছে, সে-সব কথা লেখা ছিল। গোবিন্দের মাথায় বাজ পড়ল। ভয়ের চোটে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল। গোবিন্দ মনে মনে বলল, "সে কি কথা! আমি জমিদারের খাজনা বাকি ফেলেছি!! আর একেবারে ৯০ টাকা! হায় ভগবান এর মানে কি? আমি কি জেগে আছি, নাকি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি? এ কাগজ নিশ্চয় আর কারো। কিন্তু আমার নাম লেখা রয়েছে যে। আমি কি খাজনার পাই-পয়সাটি পর্যন্ত গুণে দিইনি? হায় ভগবান। এমন অন্যায়-ও তুমি পৃথিবীতে ঘটতে দেবে?"

আসল ব্যাপার হল জমিদার যখন ভীমা কোটালকে গোবিন্দের বড়-ঘর পোড়াতে বলেছিলেন, তখন শুধু ঘর জ্বালিয়ে গোবিন্দের ক্ষতি করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, তাঁর আসল মৎলব ছিল খাজনার রসিদগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করা। এখন সেগুলো পুড়েছে; এবার গোবিন্দ একেবারে জয়চাঁদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। জয়চাঁদ

ঠিক করেছিলেন গোবিন্দের সর্বনাশ করবার জন্য আইনতঃ তাঁর যতখানি ক্ষমতা ছিল, সবটাই কাজে লাগাবেন।

১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন আর ১৮১২ সালের পঞ্চম আইনকে প্রজারা যমের মতো ভয় করত। হপ্তমের জোরে জমিদার খাজনা বাকি ফেলার দায়ে কিম্বা সেই রকম ঘটবার সম্ভাবনায় যে কোনো প্রজাকে গ্রেপ্তার করে, ফাটকে দিতে পারতেন। পঞ্চম আইনের জোরে ঐ রকম ঋণী প্রজার যথা সর্বস্ব দখল করে, নিলামে তুলে দিতে পারতেন। সরকারের ধারণা ছিল এ ক্ষমতা থাকলে জমিদাররা তাড়াতাড়ি খাজনা আদায় করে, যথা সময়ে সরকারের তহবিলে জমা দিতে পারবেন। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সরকার এক রকম বলতে গেলে বাংলার বেবাক চাষী সমাজকে একটা অতি লোভী, অতিশয় নিষ্ঠুর সম্প্রদায়ের হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। সুখের বিষয়, এর কিছু কাল পরেই নতুন আইন সম্পাদন করে, এই জঘন্য নিয়মগুলো বন্ধ করা হয়েছিল। এখানে মনে রাখা উচিত যে অর্ধ শতাব্দী ধরে যে-সরকার নিজেদের খৃশ্চান বলে পরিচয় দেন, তারা পৃথিবীর মধ্যে সম্ভবতঃ সবচাইতে শান্তিপ্রিয় মানুষদের গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার বীভৎস সব কল চালু করে রেখেছিলেন।

গোবিন্দ জমিদারের কাছে এক কড়িও ধারত না। মহাজন, গোলক পোদ্দারের কাছে তার অনেক ঋণ ছিল, কিন্তু জমিদারবাবুর কাছে কিছুই ছিল না। জমিদারের নিষ্ঠুর চরিত্র তার ভালো করেই জানা ছিল, কাজেই যাতে তার খর্পরে পড়তে না হয়, সে-বিষয়ে সে খব সাবধান হয়ে থাকত। কিন্তু গোবিন্দ শত্তুর চেনেনি। যার সর্বনাশ করবে বলে জয়চাঁদ মনস্থ করতেন, সে খাজনা দিল কি দিল না, তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র এসে যেত না। খাজনা দিলেও, সে হতভাগা যে খাজনা দেয়নি এ-কথা প্রমাণ করতে চালাকি, জোচ্চুরি, জালিয়াতি কিছুই বাকি রাখতেন না। এ-সব ব্যাপারে তিনি ওস্তাদ

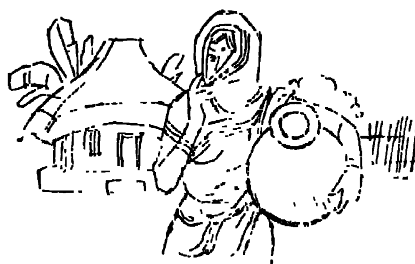
ছিলেন। আর গোবিন্দের বেলা কাজটা আরো সহজ হয়েছিল, কারণ রসিদগুলো সব পুড়ে গেছিল।

গোবিন্দের সম্পত্তি ক্রোক করা হল; মাঠে ধান পেকে তৈরি ছিল; উঠোনে ধানের মরাই ছিল; গাই-বলদ ছিল, ব্যবহারী জিনিসপত্র ছিল; এ-সমস্তই আইনের বলে আটক করা হল। তার ছয়দিন পরেই ফোড়স-আমিন এসে নিলামের দিনক্ষণ জানিয়ে নোটিস্ জারি করল। নিলাম থেকে যে টাকা উঠবে ফোড়স পাবে তার শতকরা দশভাগ। পঞ্চমের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা পথ ছিল; কিন্তু সেও গোবিন্দের ক্ষমতার বাইরে। এই নিয়মানুসারে নোটিস্ জারির পাঁচ দিনের মধ্যে অভিযুক্ত প্রজা যদি ফোড়সের কাছে জামিন দিয়ে আবেদন করে, তাহলে আবেদনের পনেরো দিনের মধ্যে দাবিটার যাথার্থ্য বিচার হতে পারে। সেই বিচারে বাকি খাজনার যে অঙ্ক স্থির হবে, প্রজাকে সুদ সহ সেই টাকা দিতে বাধ্য। কিন্তু জামিন কোথায় পাওয়া যাবে? সমস্ত কাঞ্চনপুরে গোবিন্দ জামিন দেবার মতো কাউকে পেল না।

অবশেষে সেই সর্বনাশা দিন ঘনিয়ে এল। গোবিন্দের ধান আর আখের ফসল; অন্যান্য জিনিস; ঘরে যে-ধান তোলা ছিল; গাই-বলদ; সব নির্মমভাবে নিলাম হয়ে গেল। তৈজসপত্র সব গেল। তবু জমিদারের দাবির টাকা আর ফোড়সের শতকরা দশ ভাগের টাকা উঠল না। কে যেন বলল নতুন বড়-ঘরের ভেতর গোবিন্দের বাড়ির মেয়েরা আর ছেলেপুলেরা দরজা বন্ধ করে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কাছে দামী দামী জিনিস আছে। পুলিস তৈরি ছিল; তার সাহায্যে দরজা ভেঙে, কাঁসা পেতলের বাসন পত্র ইত্যাদি টেনে বের করে নিলাম করা হল। মেয়েরা আর ছেলে-পুলেগুলো চিৎকার করে কান্নাকাটি জুড়ল। এতক্ষণে আইনের খিদে মিটল। গোবিন্দের সব গেল।

১৮৫৯ সালে বাংলায় চাষীদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হল।

ঐ বছরের দশম আইন মতে অনেক দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে, তাদের ন্যায্য অধিকার বিধিমতে দান করা হয়েছিল। যদিও চাষীদের নিজেদের মূর্খতা আর ভীরুতার কারণে ওদের যতখানি উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, ততখানি সম্ভব হয়নি, তবু আইনের শরণ নেবার পথটা ওদের সামনে খুলে দেওয়া হয়েছিল।



কেউ যদি বাংলার চাষীদের জমির ভোগ দখল ও মালিকানার অধিকার সম্পর্কে যেসব আইন আছে, সেগুলো মন দিয়ে পড়ে, তাহলে দেখবে যে মানুষ জমিতে চাষ করে তার অধিকার সব চাইতে বেশি। যে-লোক জঙ্গল সাফ করে জমিটাকে চাষের যোগ্য করে, সে-ই ঐ জমির মালিক। অবশ্য সরকারকে কিংবা জমিদারকে খাজনা হিসাবে তার লাভের একটা অংশ দিতে হবে। জমিদার হলেন সরকারি খাজনা আদায়ের কর্মচারী মাত্র। জমির স্বত্বাধিকারী তারা, যারা জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষ যোগ্য করে তুলেছে এবং যারা ঐ জমি অধিকার করে আছে। জমি সংক্রান্ত সমস্ত আইনের প্রবর্তনের পেছনে এই নীতি কাজ করে। এই নীতির জোরে বহিরাগত কেউ জমির দখল নিলে, সে সরকারের প্রশ্রয় পায়। নির্দিষ্ট কয়েক বছর ঐ জমির দখল ভোগ করলে এবং তার জন্য সরকারকে নিয়মতো খাজনা দিলে, সে-ই ঐ জমির মালিকানা পায়। অথচ জমিদাররা এমন ভাব দেখাতেন যেন, তাঁরাই সমস্ত জমির মালিক। এই জন্য বাংলায় 'পার্মানেন্ট সেট্‌লমেন্ট' নামক স্থায়ী ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়া

অবধি, চাষীর সঙ্গে জমিদারের বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। চাষী চাইত তার বার্ষিক খাজনার অঙ্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হক আর জমিদাররা চাইতেন যেমন করেই হক, নানান্ অছিলায় চাষীর কাছ থেকে যতটা বেশি সম্ভব খাজনা আদায় করেন।

খাজনা বাড়ানো ছাড়াও বাঙ্গালী চাষীদের আরো দুঃখ ছিল। থেকে থেকেই ওদের কাছ থেকে 'আবোয়াব' ইত্যাদি বে-আইনী কর আদায় করা হত। জমিদারের ছেলে-মেয়ের কিম্বা প্রজার ছেলে-মেয়ের বিয়ে ইত্যাদিতে কিম্বা জমিদার যখন পূজো বা হাজার রকম সামাজিক অনুষ্ঠান করতেন, তখনি প্রজার কাছ থেকে টাকা আদায় করবার সুযোগ নিতেন। এই সব অন্যায় আদায় পত্রগুলো এত বেশি হত যে অনেক সময়-ই ন্যায্য খাজনাকে ছাড়িয়ে যেত। নতুন আইন প্রবর্তন হবার পরেও মুখ্য প্রজাদের ওপর জমিদাররা কোথাও কোথাও এই রকম অত্যাচার করেছেন।

শুধু তাই নয়। সেকালের আইন এমনি ছিল যে জমিদার হয়ে পড়তেন প্রজার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কত সময় ইচ্ছা করে তিনি খাজনা আদায় করতেন না; শেষটা এত বেশি খাজনা বাকি পড়ে যেত যে প্রজার সেটা মিটিয়ে দেবার সাধ্য থাকত না। তখন তার সর্বনাশ করা খুব সহজ হত। আরেকটা আইনের জোরে জমিদার শুধু একবার বললেই হল যে অমুক প্রজা খাজনা না দিয়ে পালাবার চেষ্টায় আছে। অমনি তার যথা সর্বস্ব ক্রোক করার ক্ষমতা ছিল তাঁর। আরেকটা আইনমতে প্রজাকে কাছারিতে ধরে এনে বেত মেরে আধ-মরা করার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ঐ হপ্তমের আর পঞ্চমের কথা তো বলাই হয়েছে।

১৮৫৯ সালের নতুন আইনের ফলে প্রজারা এই সব জঘন্য অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেল। মিঃ এড্ওয়াড কারি এই আইন প্রবর্তন করার জন্য যথেষ্ট খেটেছিলেন। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে হপ্তম আর পঞ্চম উঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই নতুন আইন

অনুসারে প্রজা যদি কুড়ি বছরের বেশি সময় জমির দখল পেয়ে থাকে, তার খাজনা কখনো বাড়ানো যাবে না। যে-প্রজা বারো বছরের বেশি দখল পেয়েছে, সে ন্যায্য খাজনার পরিবর্তে জমির পাট্টা পাবে। তার পরেও খাজনা বাড়াতে হলে তার উপযুক্ত কারণ থাকা চাই। কিন্তু খাজনা বাড়াতে হলে এক বছরের নোটিশ দিতে হবে; যাতে দরকার হলে প্রজা প্রতিবাদ করতে পারে। খাজনা পেয়ে রসিদ দিতে জমিদার এখন থেকে বাধ্য হলেন। শেষ কথা হল যে কেউ আবোয়াব আদায় করলে আদালতে তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হত।

এই আইন যদি আর কয়েকটা মাস আগে প্রবর্তন করা হত, তাহলে গোবিন্দের এমন সর্বনাশ হতে পারত না। কিন্তু সে সময় হপ্তম পঞ্চম পুরো দমে চালু থাকাতে, ওর সম্পত্তি নিলাম হয়ে গেল। জমিদারের হুকুমে বড়-ঘর পোড়ানোর সময় থেকেও এখন বোধ হয় তার আরো বেশি দুরবস্থা। সেটা সবে সামলে উঠেছিল, তার ওপর এই নতুন বিপদ জুটল। বাড়ি খাড়া ছিল বটে, কিন্তু হাতে একটা কানা-কড়িও ছিল না। নিলামের পর দিন যখন ওর চোখের সামনে ওর বাড়ি থেকে সামান্য যে কটি শখের জিনিস ছিল শুধু সেগুলি নয়, নিত্যব্যবহারের তৈজসপত্রও ক্রেতারা টেনে বের করে নিয়ে গেল, গোবিন্দের তখন দুঃখের অবধি রহিল না। মাটিতে উবু হয়ে বসে হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে, তার ওপর মাথা রেখে, নীরবে গোবিন্দ চোখের জল ফেলতে লাগল। বাড়ির মেয়েরা অত নীরব রইল না। তারা চিৎকার করে কেঁদেকেটে, জমিদারের মাথায় দেবতাদের অভিশাপ ডেকে, তাঁর চোদ্দ, পুরুষ অবধি উদ্ধার করে দিল। ওদের মতো গরীবের সর্বনাশ করে আমোদ পাবার জন্য স্বয়ং দেবতাদের ওরা শাপ-মন্যি করতে লাগল। কপাল চাপড়ে, কেঁদে তারা বলতে লাগল, "হায় বিধাতা, এমন কথা কেন লিখেছিলে কপালে?"

গোবিন্দের বৃথা শোক করার সময় ছিল না। অনেকগুলো

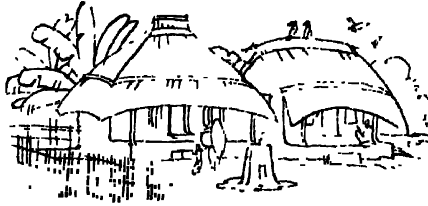
ক্ষুধার্ত মুখে তাকে ভাত যোগাতে হবে। চারদিকে শুধু 'দাও! দাও!' শব্দ। কিছু দিনের জন্যে মনটা অসাড় হয়ে গেছিল। তারপর স্ত্রী-পুত্রের নিদারুণ অভাবের কথা মনে করে, যে কোন ভাবে তাদের খাওয়া-পরার উপায় করতে সে লেগে গেল। নিজের কিছু ছিল না। একমাত্র গোলক পোদ্দারের দাক্ষিণ্য ছাড়া আর কোনো অবলম্বন ছিল না; গোলক সদাই প্রস্তুত। গোলক দয়া করে তার সাহায্যে এল। সুদখোর হতে পারে, কিন্তু গোবিন্দের দুরবস্থা দেখে সে সুদের হার কমিয়ে দিল। গোবিন্দের ঘাড়ে পঞ্চম হপ্তম চাপাবার আগে তার যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থায় ফিরে আসতে বহু বছর লেগেছিল। গোলকের কাছে যে ঋণ ছিল সেটা একটা ভারি বোঝার মতো মনে হত। শোধ করতে নয় দশ বছর লেগেছিল। সেই কটা বছরের ইতিহাস নীরব কষ্ট আর আত্মত্যাগে ভরা ছিল; সে আর বলে কাজ নেই। তবে সব ধার শোধ হয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে গোবিন্দ একটা ভোজ দিয়েছিল।



এই ভাবে, জমিদারের চক্রান্তে গোবিন্দের যে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তার মধ্যে থেকে সে ক্রমে ক্রমে মুক্তি পেল। এত দিনে মনে হতে লাগল মাথার ওপর থেকে একটা অমঙ্গলের মেঘ যেন কেটে গেছে আর গোবিন্দ তার শেষ জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাতে পারবে। কিন্তু সে আর ওর কপালে ছিল না।

১৮৭০ সালে কাঞ্চনপুরে ভয়াবহ মহামারি হল। এই মহামারির সূত্রপাত হয়েছিল কয়েক বছর আগে, যশোর জেলার জলা-ভূমিতে।

বছরে বছরে এর প্রকোপ ক্রমে পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল ; জনসংখ্যা ছার-খার হয়ে, গোটা গোটা গ্রাম জনশূন্য হয়ে, বাঘ হায়নার আবাসে পরিণত হচ্ছিল। তারপর সেই মহামারি ভাগীরথী নদী পার হয়ে শহর গ্রামের হাজার হাজার অধিবাসীদের অকাল মৃত্যু ঘটাতে লাগল। রোগের লক্ষণ হল জ্বর ; কোনো ওষুধে সে জ্বর সারত না ; ক্রমে শরীরের সব শক্তির ক্ষয় হত। গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলায়, এই মহামারি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যেখানেই যেত ওর ভয়াবহ রূপ দেখে হাহাকার উঠত। বিধাতার এই অভিশাপের আরম্ভ যে কোথায়, তা কেউ বলতে পারত না। কেউ কেউ বলত পাড়া গাঁয়ের ঘন ঝোপ-ঝাড় আগাছায় এর জন্ম। কেউ কেউ বলত রেলের লাইন পাতার ফলে জল নেমে যাবার পথ বন্ধ হওয়াতে এই মহামারির জন্ম কারণ যা-ই হক না কেন, লক্ষ লক্ষ লোক এব কবলে পড়েছিল।



সকলে বলত পূর্ব বর্ধমান হল এ-দেশেব সব চাইতে স্বাস্থ্যপূর্ণ জায়গার একটি। শুকনো মাটি, উঁচু জমি ; যে-সব লম্বা লম্বা পাহাড়ের সারি নানা নাম ধরে ভারতের এক ধার থেকে আরেক ধার পর্যন্ত বিস্তৃত, তার নৈকট্য ; বদ্ধ জলার অভাব ; কৃষিকর্মের প্রচুর বিস্তার ; এ-সবের প্রভাবে এ যেন মস্ত একটা বাগান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তা ছাড়া আবহাওয়া এত স্বাস্থ্যকর, জলের এত দ্রব্যগুণ যে কলকাতার আর পুবের লোকরা এখানে হাওয়া বদল করতে আসত।

এবার সে-সবই বদলে গেল। মহামারির বিষাক্ত নিশ্বাসে বাতাস দূষিত হল, জল বিষাক্ত হল ; বর্ধমানের হাসি-ভরা রাঙা মাটি রোগের যন্ত্রনার আর সর্বনাসের লীলাভূমি হল।

কাঞ্চনপুরে প্রথম যখন একজনের জ্বর হল, গাঁসুদ্ধ সকলের সে কি উদ্বেগ। সে লোকটি সেরে উঠলেও, দুর্ভাবনা গেল না। জ্বরটা গাঁয়ের এধার থেকে ওধারে ছড়িয়ে গেল, কেউ কেউ মল : কেউ কেউ হাড্ডিসার হয়ে বেঁচে উঠল। গোবিন্দ কখনো ওদের গাঁয়ে এত লোককে মরতে দেখেনি। রোজ-ই পথে হরি-বোল শব্দ শুনে টের পাওয়া যেত আরো কতজনে দুদিনের সংসার ছেড়ে মহা যাত্রা করল। গাঁয়ের লোকে ভয়ে আধ-মরা। শ্মশান-ঘাটের আগুন যেন আর নিবত না। একজনের শরীর পুড়ে ছাই হলেই, সেখানে আরেক জনের চিতা। গ্রামের সব চেয়ে যে বুড়ো, সে বলেছিল সারা জীবনেও সে এমন মহামারি দেখেনি : প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকে কান্নার শব্দ শোনা যেত। পথের লোকদের রক্ত মাংসের মানুষ মনে হত না ; দেখাত যেন প্রেত। গাঁয়ের বদ্যিরা সবাই সেকেলে চিকিৎসা করতেন ; তাঁদের ওষুধের কোনো ফল হত না। পরে সদয় সরকার বাহাদুর ইউরোপীয় নিয়মে শিক্ষিত বাঙালী ডাক্তার পাঠাতে আরম্ভ করলেন। সৌভাগ্যের বিষয় কাঞ্চনপুরে একজন এলেন।

গ্রামে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হল, সেখানে প্রচুর কুইনিন পাওয়া যেত। ডাক্তারটি খেটে খেটে হদ্দ হলেন : দিনে রাতে বিশ্রাম পেতেন না। এত পরিশ্রম করা সত্ত্বে তিনি মহামারি বন্ধ করতে পারলেন না।

অনেক দিন পর্যন্ত এই অবাঞ্ছিত অতিথিটি গোবিন্দের বাড়িতে পা দেয়নি। তারপর যখন মহামারির প্রকোপ কমে এসেছে বোঝা গেল, ওরা রেহাই পেল বলে গোবিন্দ ভারি খুসি। এত খুসি হওয়াটাকে ওর মা সুন্দরী বলত অপয়া, অলক্ষুণে। বলত, "আমরা রেহাই পেয়েছি এ-কথা বলিসনে রে গোবিন্দ। বললে নিশ্চয়ই আমাদের

কাউকে রোগে ধরবে।" হল-ও ঠিক তাই। প্রথমে গোবিন্দর জ্বর হল; অনেক দিন সে বিছানায় পড়ে রইল। বাড়ির আরো কারো কারো জ্বর হল, তারা অল্প দিনেই সেরে উঠল। তারপর সুন্দরীর পালা. সে-ও জ্বরে পড়ল কিন্তু আর উঠল না। এই দুর্ঘটনায় বাড়ি সুদ্ধ সকলে যে কি মর্মাহত ব্যাকুল হয়ে উঠল সে ভাবা যায় না; বিশেষ করে অসুখটা এমন সময়-ই হল, যখন গোবিন্দ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি।

ভাবনা চিন্তায় অধীর হয়ে গোবিন্দ বলে উঠল "হায় ভগবান! আমি কি এমন পাপ করেছি যার জন্য তুমি আমাকে ক্রমাগত এভাবে সাজা দিচ্ছ? আমাকে একেবারে মেরে ফেল না কেন? এভাবে কেন কষ্ট দাও? শরীরটাকে কুচি কুচি করে কেটে তাতে নুন ঢালছ কেন, ভগবান? বিধাতা কি এই সমস্ত আমার কপালে লিখে রেখেছিলেন? ও মা, মা গো! জীবনে কখনো বকনি আমাকে কখনো একটা রাগে কথা বলনি। এমন মা আর হয় না. কোথায় গেলে তুমি? তোমার গোবিন্দকে এই দুঃখের জ্বালায় ফেলে কোথায় গেলে।"

শোকে আকুল হয়ে গোবিন্দ এই ভাবে বিলাপ করতে লাগল। চোখের জলে গঙ্গা বয়ে গেল; কত মাথা কুটল গোবিন্দ। বিদেশীদের চোখে এ সবকে বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু এদেশে মা-বাপ আর সন্তানের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা যত প্রবল আর শীতের দেশে তেমন হয় না। এ-ও হয়তো একান্নবর্তী পরিবারের একটা বৈশিষ্ট্য।

গোবিন্দের শোক যতই তীব্র আর মর্মভেদী হক না কেন, অল্প দিনের মধ্যেই সে নিজেকে সামলে নিল। হিন্দুরা ভাবতব্যে বিশ্বাস করে; তাই জীবনের নানান্ দুঃখময় ঘটনাকেও মেনে নিতে পারে। বিধির এই বিধান, কাজেই এমন হতে বাধ্য এই বলে গোবিন্দ নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল। বাপের মৃত্যুর পরে যেমন করেছিল,

এক মাস ধরে অশৌচ পালন করল গোবিন্দ। তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি হল। গোঁড়া হিন্দু বাড়ির কর্তব্য পরায়ণ ছেলের মতো গোবিন্দও উপযুক্ত ভাবে ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করল। গাঁয়ের প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে চার আনা দক্ষিণা দিল। কাঞ্চনপুরে আর কাছাকাছি অন্য গ্রামে যত স্বজাতি ছিল, সবাইকে খাওয়াল। সবার শেষে যত গরীব দুঃখী ভিখারি আর সাধু শতে শতে বাড়িতে এসে ভিড করেছিল, সবাইকে এক মুঠো চাল আর একটা পয়সা দিল। এত সবে প্রচুর খরচ হল। গোবিন্দের কাছে প্রায় কখনোই টাকা-কড়ি পুঁজি থাকত না; কাজেই আবার গোলক পোদ্দারের দয়া ভিক্ষা করতে হল।

বিদেশীরা হয়তো বলবে এ-ভাবে টাকা খরচ করা নিছক বোকামি, বিশেতঃ টাকা যখন নেই। সে যাই হক, টাকা থাক বা না-ই থাক, খরচ ওকে করতেই হবে। দেশাচার, হিন্দুদের সামাজিক নিয়ম, হিন্দুদের ধর্ম, সবাই তাই বলে। গোবিন্দ যদি ঐ সব দান-ধ্যান খাওয়া-দাওয়া না করত, স্বজাতিদের কাছে তার মুখ ছোট হত। লোকে তাকে এক-ঘরে করত। ও-সব না করে গোবিন্দের উপায় ছিল না।

একটা মামুলী কথা আছে যে দুর্ভাগ্য কখনো একা আসে না; গোছা গোছা সর্বনাশ এক সঙ্গে উপস্থিত হয়। আমাদের গল্পের নায়ক গোবিন্দ সামন্তের জীবনেও তাই হয়েছিল। সর্বনাশের ঢেউয়ের পর ঢেউ তার মাথায় ভেঙেছিল; একটা সামলে উঠতে না উঠতে আরেকটা এসে উপস্থিত হয়েছিল। এত দিন পর্যন্ত অসীম সাহস দেখিয়ে, গোবিন্দ জলের ওপর কোনো রকমে মাথা তুলে রেখেছিল। অবিরাম ঢেউ এসেছিল, প্রত্যেকটার মাথায় চড়ে সে পৌরুষের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু বারে বারে লড়াই করবার ফলে তার শক্তি কমে গেছিল। শেষপর্যন্ত ১৮৭৩ সালের সর্বনাশের কাছে যে সে হার মানবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

সেই বছরের গোড়ার দিকে বেলভেডিয়ার বলে কলকাতার ছোট লাট সাহেবের বাড়িতে বসে, স্যার জর্জ ক্যাম্বেল টের পেলেন যে তাঁর এলাকার উত্তর-পশ্চিম কোণা থেকে এক সংঘাতিক শত্রু ক্রমে এগিয়ে আসছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, আকাশ যেন পিতলের তৈরি। মাটির দিকে তাকালেন, মাটি যেন চকমকি পাথর। স্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে তিনি সতর্ক-বাণী দিলেন। বড়-লাট লর্ড নর্থব্রুক বারো মাস অমানুষিক পরিশ্রমের পর বিশ্রামের জন্য সিমলায় গেছিলেন। তিনি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি ভারতের রাজধানী কলকাতায় চলে এলেন। অনেক পরামর্শ করা হল: দেশের প্রকৃত অবস্থার নির্ভুল বিবৃতি চেয়ে পাঠানো হল; আসন্ন দুর্ভিক্ষের পরিমাপ কতখানি হতে পারে বিশেষজ্ঞরা তার হিসেব কষতে বসলেন। সেই সঙ্গে আসন্ন বিপদ রোধ করতে না পারলেও, তার তীব্রতা কমাবার জন্য কি কি করা যেতে পারে তার পরিকল্পনা তৈরি হল। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, কোটি কোটি দেশবাসী আকাশের দিকে ব্যাকুল চোখে চেয়ে রইল, যদি এক বিঘৎ বড় একটা মেঘ-ও দেখা যায়। কিন্তু নীল আকাশে মেঘের কণাটুকুও দেখা গেল না। আকাশ যেন একেবারে বন্ধ হয়ে গেছিল। যখন আর কোন সন্দেহ রইল না যে বাংলার অন্ততঃ খানিকটা অংশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, তখন কেন্দ্রীয় আর স্থানীয় সরকার কোটি কোটি অনশন-ক্লিষ্ট মানুষের জন্য খাবার সঞ্চয় করে রাখার অমানুষিক চেষ্টা করতে লাগলেন।

বিপদের সম্মুখীন হয়ে লর্ড নর্থব্রুকের সরকারের মতো এত তৎপরতা, এত উপস্থিত বুদ্ধি, এত বলিষ্ঠতা, এত দয়া-দাক্ষিণ্য, পৃথিবীর অন্য কোনো সরকার কখনো দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এই বড় আশ্চর্য্যের কথা যে তা সত্ত্বেও ভারতে দেশী ও বিলিতী লোক এমনি অনেক ছিল যাদের ধারণা যে দুর্ভিক্ষটা ক্যাম্বেলের সম্পূর্ণ মন-গড়া ব্যাপার। তাঁর উত্তরাধিকারী স্যার রিচার্ড টেম্পল

ও নাকি চালাকিটা চালিয়ে গেছিলেন। এ-সব লোকরা যদি কোটি কোটি লোককে না খেয়ে মরতে দেখত, তবে তারা দুর্ভিক্ষটাকে সত্যি বলে মেনে নিত। এত কম লোক মরেছিল, তার কারণ নয় যে দুর্ভিক্ষটা সামান্য ছিল; তার কারণ হল সরকার এমন চমৎকার ত্রাণ-ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটাও শুধু স্যার রিচার্ড টেম্পল্-এর দক্ষতার জন্যেই সম্ভব হয়েছিল।

বর্ধমানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বিহারের মতো মারাত্মক হয়নি। তবু যথেষ্ট ফসল না হওয়াতে লোকে কম কষ্ট পায়নি। কাঞ্চনপুরে গোবিন্দের ক্ষেতে অন্যান্য বছরের সিকি ভাগশস্য হল। ক্ষেতের ফসল ছাড়া গোবিন্দের আর কোনো আয়ের উপায় ছিল না, কাজেই ওরা বড় কষ্টে পড়ল। তিন মাসের খাবার ছিল; বাকি নয়মাস কি ভাবে চলবে, সেই হল সমস্যা। গাঁয়ে দিন-মজুরি খাটার উপায় ছিল না; সেখানে প্রায় সকলেরই ওর-ই মতো দুরবস্থা। বর্ধমান যাওয়া ছাড়া গতি রইল না। বর্ধমানের মহারাজা মহাতপ চাঁদ বাহাদুর ছিলেন বাংলার সব চাইতে বড় জমিদার। মহারাজার মনে দয়া-মায়া ছিল; তিনি রোজ দুই হাজার মজুরকে কাজ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, শুধু তাদের অন্ন-সংস্থান করে দেবার আশায়। বিমর্ষ চিত্তে, চোখে জল নিয়ে, গোবিন্দ ঘর ছেড়ে বর্ধমানের দিকে রওনা হল। জীবনে কখনো সে দিন মজুরি করেনি। বাপ-ঠাকুরদার ক্ষেত চষে চিরকাল সে নিজের পরিবারের আর নিজের খাওয়া-পরা চালিয়ে এসেছে। এখন, বেশি বয়সে ওকে কুলির স্তরে নামতে হল। এ-কথা মনে করেও ওর বুকের রক্ত শুকিয়ে এল। অন্যান্য মজুরদের মতো গোবিন্দ-ও মহারাজার ত্রাণ-ব্যবস্থায় খাটত, রোজ মজুরি-ও পেত। তবু দিনরাত নিজের অধঃপতনের কথা ভেবে সে কষ্ট পেত। ওর মন ভেঙে গেছিল। নিজের শোচনীয় অবস্থার কথা ভেবে দিন রাত ও চোখের জল ফেলত। চোখের সামনে ওর স্বাস্থ্য নষ্ট হল, দিনে দিনে ও কঙ্কালসার হয়ে উঠল। ওর

হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছিল। একদিন সকালে দেখা গেল ওর দীনহীন কুঁড়েতে, নিজের বাড়ি থেকে, প্রিয়জনের কাছ থেকে বহু দূরে, গোবিন্দ মরে রয়েছে। সেই দুঃসংবাদ পেয়ে, ওর ছেলে বর্ধমানে ছুটে এসে, দুঃখী বাপের দেহ দাহ করল।

এতদিন পরে গোবিন্দের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়োল।